অদ্ভুতুড়ে
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

অদ্ভুতুড়ে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ADBHUTURE
A Bengali Juvenile Novel *by* SIRSHENDU MUKHOPADHYAY
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041
email : deyspublishing@hotmail.com
Rs. 100.00

ISBN 81-7079-779-9

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ১৯৯৬, মাঘ ১৪০২
পঞ্চম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১১, মাঘ ১৪১৭

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সুধীর মৈত্র

১০০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং : লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

" রাঃ স্বাঃ"

শ্রীমান সৌম্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীমান সৌরভ মুখোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু

লেখকের অন্যান্য বই

চারদিক

বড় সাহেব

গোলমাল

ফেরিঘাট

আক্রান্ত

জোড় বিজোড়

শ্রেষ্ঠ গল্প

গল্প সমগ্র ১ম/ ২য়

মাধুর জন্য

অদ্ভুতুড়ে

ভাইপো মানিক একটা পেল্লায় মোটরবাইক কিনেছে, আর সেইসঙ্গে একটা ঝাঁ-চকচকে নতুন হেলমেট। মোটরবাইকটায় দারুণ শব্দ হয়। ভটভট করে সারা শহর দাবড়ে বেড়ায় মানিক। নন্দবাবু এটা লক্ষ্য করেছেন। ভাইপো মানিককে তিনি বিশেষ পছন্দ করেন না। কারণ মানিক ভূত, ভগবান আর মাদুলিতে বিশ্বাস করে না। কোষ্ঠী বা কররেখা বিচার সম্পর্কে তার মতামত শুনলে যে-কোনও জ্ঞানী মানুষেরই মাথায় খুন চাপবার কথা। সাধু সন্ন্যাসী ফকির ইত্যাদির প্রতি মানিকের ব্যবহার মোটেই ভদ্র নয়। সেই কারণেই মানিকের ওপর নন্দবাবু খুশি নন। তবে তিনি নিজে সাতে-পাঁচে থাকেন না। কারও সঙ্গে তর্ক করতে ভালবাসেন না। মানুষকে ক্ষমা করতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু মুশকিল হল, ইদানীং মানুষ ক্ষমা-টমা বিশেষ চায় না।

যাই হোক, নন্দবাবু মানিকের মোটরবাইক এবং হেলমেটটা লক্ষ করছেন ক'দিন ধরেই। না, মোটরবাইকটাকে ততটা নয়, যতটা লাল-টুকটুকে চমৎকার হেলমেটটাকে। নন্দবাবু এমনিতে সাধুগোছের লোক। বিয়ে-থা করেননি। কায়কল্প প্র্যাকটিস করেন। তাঁর এক ভৌত ক্লাব আছে। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার সেখানে কয়েকজন মিলে ভূত-প্রেত নিয়ে গবেষণামূলক কাজকর্ম করেন। সপ্তাহে দু'দিন জ্যোতিষচর্চা আর দু'দিন ধর্মালোচনা। রবিবারটা নন্দবাবু মৌন থাকেন, উপবাসও করেন। জাগতিক মায়া-মোহ তাঁর বিশেষ নেই।

কিন্তু মানিকের লাল-টুকটুকে হেলমেটটা দেখার পর থেকেই নন্দবাবু ভারি উচাটন হয়ে পড়েছেন। হেলমেটটা নাকি আছাড় মারলেও ভাঙবে না, এমন শক্ত কাচতন্তু দিয়ে তৈরি। সামনে আবার প্লাস্টিকের ঢাকনা আছে। কানে ইয়ার-প্লাগ লাগানোর ব্যবস্থা আছে, যাতে ইচ্ছে করলেই বধির হয়ে থাকা যায়। এইসব শোনার পর থেকেই নন্দবাবুর কেমন যেন মনটা চঞ্চল হচ্ছে। ভারি ইচ্ছে হচ্ছে হেলমেটটা একবার চুরি করে হলেও মাথায় দেন।

অনেকভাবে মনকে সংযত করতে চেষ্টা করেছেন নন্দবাবু। কিন্তু কোনও কাজই

হয়নি।

মনকে বলেছেন, "ওরে মন! সবই তো ছেড়েছিস, পৃথিবীর যত মায়া-মোহ বিসর্জন দিয়ে অনেক ওপরে উঠে পড়েছিল গ্যাস-বেলুনের মতো। তা হলে কেন রে ওই তুচ্ছ হেলমেট তোকে টনছে?"

মন সঙ্গে-সঙ্গে কুপিত হয়ে জবাব দেয়, "দ্যাখো হে নন্দবাবু, তুমি ভীষণ ঘড়েল লোক। আমাকে গ্যাস-বেলুন বানিয়ে দিব্যি নিজে গ্যাঁট হয়ে বসে-বসে মজা দেখছ। আরে বাপু, ত্যাগ যে করবে, ত্যাগের আগে তো একটু চেখে দেখতে হবে যে, যে-জিনিসটা ত্যাগ করছি সেটা কীরকম।"

"তা তো বটে রে বাপু, কিন্তু ওরে মন, হেলমেট আর এমন কী-ই বা জিনিস!"

"আগে জিনিসটা পরো, দ্যাখো, ওটা দিয়ে কী কাজ হয়, তারপর না হয় একদিন ত্যাগ করে দিও।"

নন্দবাবু সুতরাং হার মানলেন।

শীতকাল। মানিক বাড়িতে নেই। তার মোটরবাইকটাও নেই। শুধু হেলমেটটা পড়ে আছে অবহেলায়। বাড়িতে আজ পিঠে-পায়েস তৈরি হচ্ছে হই-হই করে। এলাহি কাণ্ড। সন্ধের সময় নন্দবাবু তাঁর ভুতুড়ে ক্লাবে যাবেন বলে তৈরি হচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর হেলমেটটার দিকে নজর পড়ল। বারান্দার একটা হুকে সেটা ঝুলে আছে।

দরজার কাছ থেকে ঘরে ফিরে এলেন নন্দবাবু। লোভে বুকটা দুড়দুড় করছে।

"ওরে মন!"

"বলে ফ্যালো।"

"কী করব বল।"

"এ-সুযোগ ছেড়ো না হে। মানিক রাত দশটার আগে ফিরবে না।"

"কাজটা অন্যায় হবে না তো?"

"আরে না। কত লোক কত বড়-বড় অন্যায় করে হেসেখেলে বেড়াচ্ছে।"

"তা বটে। তা হলে পরি?"

"পরো। তবে তোমার ওই ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে তো হেলমেট মানাবে না হে। বাক্স খুলে স্যুট বের করো!"

নন্দবাবু আঁতকে উঠে বললেন, "স্যুট! বলিস কী রে মন? ওই ম্লেচ্ছ পোশাক যে আমি ছেড়ে দিয়েছি।"

"ছেড়েই যখন দিয়েছ, তখন আর পরতে দোষ কী? কথায় আছে না, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'; তার মানে হল, 'ত্যাগ করে ভোগ করো'। যাও, পোশাকটা পরে ফ্যালো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

নন্দবাবু হার মানলেন। বাক্স খুলে পুরনো স্যুট বের করে লজ্জিতভাবে পরলেন। সুবিধে হল যে, তাঁর ঘরটা একতলায় এবং বাড়ির পেছন দিকে। এদিকটায় কেউ থাকে না। একটু পুরনো অন্ধকার আর স্যাঁতসেঁতে কয়েকখানা ঘর বহুকাল ধরে পড়ে আছে তালাবন্ধ হয়ে। এই নির্জনতায় থাকার অনেক সুবিধে নন্দবাবুর। কেউ উঁকিঝুঁকি মারে না, ডিস্টার্ব করতে নামে না। সামনের বারান্দায় শুধু মোটরবাইকটা রাখতে মানিক আসে।

স্যুট পরে নন্দবাবু বেরোলেন। তারপর দেওয়াল থেকে হেলমটটা নামিয়ে মাথায় পরলেন। বেশ ভারী। ভিতরে গদি দেওয়া আছে। হেলমেটটার গায়ে কয়েকটা বোতাম-টোতামও আছে।

হেলমেটটা মাথায় দেওয়ার পরই নন্দবাবুর একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। মনে হল, তিনি যেন নন্দবাবু নন। অন্য কেউ।

বাড়ির পেছন দিকে আগাছার জঙ্গলে ছাওয়া একটা বাগান আছে। বেশ বড় বাগান। এখন আর এই বাগানের পরিচর্যা কেউ করে না। কেউ আসেও না এদিকে। সেই বাগানের ভিতরে একসময়ে বেশ চওড়া সুরকির রাস্তা ছিল। এখন সেই রাস্তা ঘাসে ঢেকে গেছে। সাপখোপের আস্তানা হয়েছে ঝোপজঙ্গলগুলো। এই পথ দিয়েই নন্দবাবু যাতায়াত করেন।

বাগান পেরিয়ে ফটক। ফটকের ওপাশে একটা গলি। খুবই নির্জন গলি। স্যুট-পরা নন্দবাবু হেলমেট-মাথায় গলিতে পা দিয়ে চারদিকটা ভাল করে দেখে নিলেন। না, কেউ কোথাও নেই।

স্যুটের সঙ্গে মানিয়ে আজ বুটজুতোও পরেছেন তিনি। বহুকাল পড়ে ছিল বুট দুটো, শক্ত দরকচা মেরে গেছে। পায়ে সাঙ্ঘাতিক লাগছে হাঁটতে গিয়ে। হেলমেটটাও যে এত ভারী, তা কে জানত!

গলিটা পার হয়ে নন্দবাবু রাস্তায় পড়লেন। শীতকাল। মফস্বলের শহরে খুব জেঁকে শীতও পড়েছে এবার। রাস্তায়-ঘাটে লোকজন বিশেষ নেই। থাকলেও ক্ষতি ছিল না, এ-রাস্তায় আলো নেই, এবং ঘন কুয়াশা পড়েছে আজ। সুতরাং নন্দবাবুকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

নন্দবাবু ধীর গম্ভীর মানুষ, তাঁর কোনও চপলতা দেখা যায় না কখনও। কিন্তু আজ এই কুয়াশামাখা সন্ধ্যায় স্যুট, বুট এবং হেলমেট পরে নির্জন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তাঁর শিস দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল। একটু ইংরেজি নাচ নাচতে ইচ্ছে করছিল।

নন্দবাবু বললেন, "ওরে মন, মন রে! এসব হচ্ছেটা কী?"

"খারাপটা কী হচ্ছে বাপু! শিস দিতে ইচ্ছে হলে দাও না।"

"খারাপ শোনাবে না?"

"কেন, শিস তো তুমি ভালই দাও। আগে তো শিস দিয়ে বেশ পায়রা ওড়াতে।"

"দূর পাগল! যখন সংসারী ছিলাম, তখন কত কী করেছি। এখন আর ওসব মানায়?"

"খুব মানায়। কেউ শুনছে না, দাও দেখি একটু শিস।"

নন্দবাবু আবার হার মানলেন। শিস দিতে গিয়ে দেখলেন, শব্দ হচ্ছে না তো!

একটু পরেই অবশ্য ভুল ভাঙল। হেলমেট-পরা বলে বাইরের শব্দ আদপেই তাঁর কানে আসছে না। হেলমেটটা একটু তুলতেই তিনি শুনতে পেলেন, তাঁর ঠোঁটে চমৎকার সুরেলা শিস বাজছে।

বেলতলাটা বেশ অন্ধকার! চারদিকে ঝোপঝাড়ে জোনাকি জ্বলছে। বাঁ ধারে শাঁখচুন্নির জলা। তার ওপাশে একটা মস্ত পোড়ো-বাড়ি। না, একে পোড়ো-বাড়ি বলার চেয়ে ধ্বংসাবশেষ বলাই ভাল। এক সময়ে এক নীলকর-সাহেব মস্ত প্রাসাদ বানিয়েছিল আমোদ-ফুর্তির জন্য। সেই বাড়ির এখন ওই দশা। বিস্তর মানুষ ওখানে গুপ্তধন খুঁজতে গেছে। ভূতের বাড়ি বলেও একসময়ে অখ্যাতি ছিল। শীতকালে এক সাধু এসে প্রায়ই ওখানে আস্তানা গাড়ত। কিছুদিন চোর-ডাকাতদেরও ডেরা হয়েছিল বাড়িটা। এখন আর কেউই ওখানে যায় না। চারদিকে এক ধরনের কাঁটাগাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল হয়েছে। নন্দবাবু এবং তাঁর ভুতুড়ে ক্লাবের সদস্যরা ও-বাড়িতে অনেকবার ভূত খুঁজতে হানা দিয়েছেন। কিন্তু ও-বাড়ির ভূতেরা দেখা দেয়নি।

শ্যামবাবু বলেছিলেন, ভূত পুরনো হয়ে গেলে সেয়ানা হয়ে ওঠে। সহজে দেখা দেয় না।

রাধাগোবিন্দবাবু ভূতের ব্যাপারে খুবই বিশেষজ্ঞ লোক। থিওসফিক্যালি সোসাইটির সদস্য ছিলেন। ভূত দেখেছেন বহুবার। শ্যামবাবুর কথায় তিনিও সায় দিয়ে বললেন, "ওই হয়েছে মুশকিল, পুরনো ভূতরা সহজে দেখা দিতে চায় না। নতুন যারা ভূত হয়েছে, তারা পৃথিবীর মায়া কাটাতে পারে না কিনা, তাই হকে-নকে দেখা দেয়।"

ফটিকবাবু কখনও ভূত দ্যাখেননি, তবে ভূতের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। ভূত দেখার জন্য তিনি অনেক ঘুরে বেড়িয়েছেন। পোড়ো-বাড়ির সন্ধান পেলেই গিয়ে হাজির হন। শ্মশানে-কবরখানায় নিশুত রাতে গিয়ে বসে থাকেন। এমন-কী, ভূতের দেখা পেলে মা-কালীকে জোড়া পাঁঠা দেবেন বলে মানতও করে রেখেছেন। তিনি একটু রেগে গিয়ে বললেন, "নতুন-পুরনো জানি না মশাই, আজ অবধি আপনারা একটা ভূতেরও ব্যবস্থা করতে পারলেন না। এমন চলতে থাকলে শেষ অবধি আমাকে আমার সেজো শালার কাছে একশো টাকা বাজি

হারতে হবে। শুধু তা-ই নয়, নিজের কান মলে স্বীকার করতে হবে যে, তার কথাই ঠিক, ভূত বলে কিছু নেই।”

এ-কথায় সাত্যকিবাবু হাঁ-হাঁ করে উঠে বললেন, “দেখা পাননি বলেই যে নেই, এটা তো যুক্তি হল না মশাই। আপনি দ্যাখেন না, কিন্তু আমি তো দিব্যি দেখি। এই পরশু দিন একটা মশার-আকৃতি ভূত মশারির মধ্যে ওড়াওড়ি করছিল। যতবার তালি দিয়ে মারতে যাই, ততবার ফশকায়। শেষ অবধি সেটা নাকের ডগায় এসে খুব যখন নাচানাচি করতে লাগল, তখন ভাল করে দেখলুম, মশা নয় একরত্তি একটা ভূত।”

ফটিকবাবু খ্যাঁক করে উঠে বললেন, “মানুষ মরে যদি ভূত হতে পারে, তো মশা মরেই বা হবে না কেন? আমি তো গোরুর ভূত, গণ্ডারের ভূত, গাছের ভূতও দেখেছি।”

ফটিকবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, “আমার মেজো শালাকে এসব কথা বললে হ্যা হ্যা করে হেসে উঠবে যে।”

নন্দবাবু বেলতলায় দাঁড়িয়ে হেলমেটের কাচের স্বচ্ছ ঢাকনার ভিতর দিয়ে অন্ধকার ধ্বংস্তূপের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইলেন। নিজের কাছে স্বীকার করতে তাঁর লজ্জা নেই যে, আজ অবধি তিনি জলজ্যান্ত ভূত দেখতে পাননি। ভূতের আভাস অবশ্য পেয়েছেন। ভূত-ভূত অনুভূতিও হয়েছে, কিন্তু চোখের সামনে একেবারে স্পষ্ট দেখা আর হল কই?

ভাবতে ভাবতে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে যেই পা বাড়িয়েছেন, অমনি ধড়াম্ করে মাথার ওপর কী যেন একটা এসে পড়ল।

নন্দবাবু ভীষণ চমকে গিয়েছিলেন। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। আর তাজ্জবের কথা, নন্দবাবু ভারি চমৎকার সুরেলা একটা গান শুনতে পেলেন।

হতভম্বের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নন্দবাবু নিচু হয়ে দেখলেন, একটা পাকা বেল পায়ের কাছে পড়ে আছে। গাছ থেকে সদ্য ছেঁড়া। মাথায় হেলমেট না থাকলে এই বেল তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিতে পারত।

বেলটা কুড়িয়ে নিয়ে নন্দবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন। গানটা কোথা থেকে আসছে? হেলমেটের মধ্যে তো বাইরের শব্দ ঢোকে না। তবে এটা ঢুকছে কী করে?

সন্দিহান হয়ে নন্দবাবু হেলমেটটা খুললেন। এবং অবাক হয়ে বুঝতে পারলেন বা বুঝতে পেরে অবাক হলেন যে, দুনিয়ার প্রযুক্তিবিদ্যা অনেক এগিয়ে গেছে। এই হেলমেটটায় টেপরেকর্ডার লাগানো আছে। মাথায় বেল পড়ায় ঝড়াক করে টেপরেকর্ডার চালু হয়ে গান বেরিয়ে আসছে।

নন্দবাবু গানটা বন্ধ করার চাবি খুঁজে পেলেন না। গানসুদ্ধ হেলমেটটা ফের পরে নিয়ে ভুতুড়ে ক্লাবের দিকে হাঁটতে লাগলেন। কানে গান বাজতেই লাগল।

ভৌত ক্লাবটা একটা ভারি জব্বর জায়গায়। মিত্তিরবাবুদের পোড়ো-বাড়ির একাংশে একখানা ঘর আছে। চারদিকে আগাছার জঙ্গল। দিনে-দুপুরেও মানুষ আসে না। সন্ধের পর শুধু শেয়ালেরা ঘোরাঘুরি করে। কৃষ্ণপক্ষে জায়গাটা এত ঘুরঘুট্টি অন্ধকার থাকে যে, নিজের হাতখানা অবধি ঠাহর হয় না।

নোনাধরা দেওয়াল, আধভাঙা দরজা-জানলা, সোঁদা গন্ধ মিলে-মিশে বেশ একটা ভূত-ভূত ভাব। ঘরে একখানা কাঠের টেবিলের ওপর মড়ার খুলি আর পাশে একখানা মোমবাতি জ্বলছে। কয়েকখানা কাঠের চেয়ারে ভৌত ক্লাবের সদস্যরা বসে আছেন। তাঁদের বয়স ত্রিশ থেকে শুরু করে আশি অবধি। শীতকাল বলে সকলেই একটু মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে আছেন। মুড়ি আর গরমাগরম বেগুনি এসে গেছে। দলের সবচেয়ে কমবয়সী সদস্য গিরিজা একটা কেরোসিন-স্টোভে চা তৈরি করছে। আড্ডা জমজমাট।

এমন সময়ে মাথায় হেলমেট আর হাতে পাকা বেল নিয়ে নন্দবাবু ঘরে ঢুকতেই একটা হই-চই গেল।

ফটিকবাবুর ভূত-তৃষ্ণা বা ভূত-ক্ষুধা আজকাল এত বেড়েছে যে, তিনি আজকাল সর্ষের মধ্যেও ভূত দেখার চেষ্টা করেন। নন্দবাবুকে দেখে তিনিই প্রথম সোৎসাহে চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই তো, এতদিনে বুঝি মা-কালী মুখ তুলে চাইলেন..."

রাধাগোবিন্দবাবুর ভয় অন্যরকম। কিছুদিন আগে তিনি সাইকেলে চেপে যাওয়ার সময় রাস্তায় একটা গোরুকে ধাক্কা দেন। তাতে একজন পুলিশম্যান এসে তাঁকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছিল। রাধাগোবিন্দবাবুর প্রতিশোধস্পৃহা সাঙ্ঘাতিক। দু'একদিন বাদেই এক দুপুরবেলা বটগাছের বাঁধানো চাতালে সেই পুলিশম্যানটাকে বসে-বসে ঘুমোতে দেখে রাধাগোবিন্দবাবু তার টুপিটা তুলে নিয়ে চম্পট দিয়েছিলেন। অবিমৃষ্যকারিতা আর কাকে বলে! পুলিশ হল স্বয়ং সরকারবাহাদুরের জবরদস্ত প্রতিনিধি। পুলিশের টুপি চুরি করা যে সাঙ্ঘাতিক অপরাধ তা তিনি পরে ধীরে-ধীরে বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু টুপিটা গিয়ে ফেরত দিয়ে আসার সাহস আর তাঁর হয়নি। পুলিশকে তাঁর ভীষণ ভয় করে আজকাল। সর্বদাই তিনি আশঙ্কা করছেন, কখন এসে পুলিশ তাঁর ওপর চড়াও হবে।

নন্দবাবুকে দেখে রাধাগোবিন্দবাবু তাই তারস্বরে বলে উঠলেন, "আমি চোর না বাবা, আমি চোর না। মা-কালীর দিব্যি, টুপিটা বাতাসে উড়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল, আমি ঝেড়েঝুড়ে তুলে রেখেছি যত্ন করে..."

সাত্যকিবাবু খুব ভাল করেই জানেন যে, ভিন গ্রহ থেকে অজানা সব জীব কিম্ভূত সব মহাকাশযানে করে প্রায়ই পৃথিবীতে চলে আসে। খবরের কাগজে

প্রায়ই উফো'র খবর থাকে। নন্দবাবুকে দেখে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না যে, এ হল সেই প্রাণীদেরই একজন। তিনি আঁ-আঁ করে দু'বার দুটো দুর্বোধ্য শব্দ করে উঠলেন। তাঁর মনে হল, ভিন গ্রহের জীব তো সাদামাঠা বাংলা ভাষা বুঝতে পারবে না, তবে সংস্কৃত দেবভাষা, সেটা বুঝলেও বুঝতে পারে। কিন্তু সংস্কৃতে তিনি বেজায় কাঁচা। সুতরাং যা মনে পড়ল, তাই চেঁচিয়ে বলে যেতে লাগলেন, "ভো ভো আগন্তুকঃ অহং সাত্যকি চট্টরাজ্য। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি মা শুচঃ। রক্ষ মাম। নরঃ নরৌ নরাঃ।"

শ্যামবাবু ভালমন্দ কিছু না বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি আলোয়ান, সোয়েটার, জামা আর গেঞ্জির ভিতর হাতড়ে পৈতে খুঁজে বারে করে কাঁপতে কাঁপতে গায়ত্রীমন্ত্র বেশ চেঁচিয়েই জপ করতে লাগলেন।

হারানবাবুর বয়স আশির ওপর। চোখে ভাল ঠাহর পান না। কিন্তু একটা বিটকেল কিছু যে ঘরে ঢুকেছে, তা আঁচ করে সে-ই যে চোখ বুজে ফেলেছেন, আর চোখ খোলার নাম নেই। চোখ বুজে হুঁহুঁ করে মৃদু-মৃদু আওয়াজ ছাড়তে ছাড়তে বলতে লাগলেন, "হুঁহুঁ, এর মতো ওষুধ নেই হে বাছাধন। ভূত হও, প্রেত হও, রাক্ষস হও, যমদূত হও, চোখটি বুজে ফেললে আর ভয়টি দেখাতে পারবে না।"

কে একজন 'পুলিশ, পুলিশ' বলে চেঁচাচ্ছিল। আর-একজন রামনাম করতে গিয়ে কাশতে লাগল। একজন চেয়ার উলটে পড়ে গেল।

গিরিজা প্রথমটায় একটু থতমত খেয়ে গেলেও ততটা ঘাবড়ে যায়নি। সে বলে উঠল, "আচ্ছা, সবাই মিলে যে কী পাগলের কাণ্ড বাধালেন? লোকটা কে আগে দেখুন।"

নন্দবাবু এতটা প্রতিক্রিয়া আশা করেননি। তবে তিনি এতে খুশিই হলেন। বহুকাল ভারি সাদামাঠা জীবনযাপন করেছেন। তাঁকে কেউ ভয় খায় না, সমীহ করে না, বাড়ির চাকর-বাকরেরা পর্যন্ত তেমন খাতির দেখায় না তাঁকে। আজ তাঁকে দেখে যে সকলে একেবারে চমকে উঠে ভিরমি খাওয়ার জোগাড়, এতে নিজের ওপর তাঁর একটা বিশ্বাস এসে গেল।

নন্দবাবু গম্ভীর মুখে মড়ার খুলিটার পাশে পাকা বেলটা রেখে হেলমেট খুললেন। একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে ফটিকবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি নাকি এখনও ভূত দ্যাখেননি?"

ফটিকবাবু নন্দবাবুর দিকে কটমট করে চেয়ে বললেন, "না, দেখিনি। আপনার মতো বেরসিকও জীবনে দেখিনি। ভাবলাম মা-কালী বুঝি আজ মুখ তুলে চাইলেন। তা নয়, ভূতের বদলে নন্দবাবু। ছ্যাঃ ছ্যাঃ, জীবনটায় ঘেন্না ধরে গেল।"

“তা হলে আমার চেয়ে ভূতের গুরুত্বই আপনার কাছে বেশি?”

“আলবাৎ বেশি। খুঁজলে কয়েক লাখ কয়েক নন্দবাবু পাওয়া যাবে, কিন্তু ভূত পাওয়া যাবে কি?”

নন্দবাবু বিজ্ঞের মতো একটু হাসলেন। তারপর বললেন, “যাবে। এইমাত্র ভূতের হাত থেকে কোনওক্রমে প্রাণ হাতে করে চলে আসতে পেরেছি।”

ফটিকবাবু সোৎসাহে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, “কোথায়?”

“বেলতলায়। ওই পাকা বেলটা আমার মাথা তাক করে ছুঁড়ে মেরেছিল। ভাগ্যিস মাথায় হেলমেট ছিল। নইলে...”

ফটিকবাবু আবার নিরুৎসাহ হয়ে বসে পড়ে বললেন, “তার মানে, ভূত দ্যাখেননি, ভূতের ঢেলা খেয়েছেন।”

“ওই হল।”

“ফটিকবাবু মাথা নেড়ে বললেন, “মোটেই দুটো জিনিস এক হল না।”

একটা তর্ক বা ঝগড়া বেধে উঠছিল, কিন্তু সকলে মাঝখানে পড়ে ব্যাপারটা আর এগোতে দিল না। সকলেরই কৌতূহল হেলমেট, স্যুট ইত্যাদি নিয়ে।

নন্দবাবু মুড়ি আর বেগুনির সঙ্গে চায়ে চুমুক দিয়ে একটু লাজুক মুখে ঘটনাটা বিস্তারিত বলতে লাগলেন।

কথার মাঝখানে গিরিজা হঠাৎ বলে উঠল, “কিন্তু নন্দখুড়ো, আপনি হেলমেটটা পেলেন কোথায়?

“কেন বাপু, আমার ঘরের দরজায় দরদালানের পেরেকে ঝোলানো থাকে। সেখানেই পেয়েছি।”

“কটার সময়?”

“ওই তো সাড়ে পাঁচটা হবে।”

“হতেই পারে না।”

“তার মানে?”

“ঠিক পাঁচটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে মানিকের সঙ্গে জামতলার মোড়ে আমার দেখা হয়েছে। মাথায় লাল হেলমেট পরে মোটরবাইকে চড়ে সে কালীতলায় থিয়েটার দেখতে যাচ্ছে।”

নন্দবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, “গিরিজা, বড়দের সঙ্গে ইয়ার্কি করতে নেই।”

গিরিজাও গম্ভীর হয়ে বললে, “নন্দখুড়ো, নেহাত মানিকের কাকা বলেই আপনাকে খুড়ো বলে ডাকি, নইলে স্কুলে-কলেজে আপনি আমার মাত্র তিন ক্লাস ওপরে পড়তেন। ইয়ার্কির বাধা নেই। তবে আমি এখন মোটেই ইয়ার্কি করছি না।”

নন্দবাবু আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, “তা হলে ভুল দেখেছ।”

গিরিজাও গম্ভীরতর হওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, "আমার চোখ দারুণ ভাল। ভুল দেখার প্রশ্নই ওঠে না।"

"তা হলে বানিয়ে বলছ।"

"আপনি ঘুরিয়ে আমাকে মিথ্যেবাদী বলছেন?"

আবার সবাই হাঁ-হাঁ করে মাঝখানে পড়ে বিবাদটা আর গড়াতে দিল না।

ফটিকবাবু বললেন, "এসব নিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ কী? ভূত নামানোর চেষ্টা করুন সবাই। শালার কাছে আমার আর মুখ দেখানোর জো নেই।"

শ্যামবাবু বেজার মুখ করে বললেন, "আজ কি ভূত নামানো সহজ হবে? আমার গায়ত্রীমন্ত্র জপ আর যোগেশবাবুর রামনামের চোটে ভূতেরা কয়েকশো মাইল তফাতে চলে গেছে।"

ফটিকবাবু লাঠিগাছ হাতে করে উঠে পড়লেন। বললেন, "তা হলে আর এখানে মিছে সময় নষ্ট করে লাভ কী! আজ বাড়িতে কড়াইশুঁটির কচুরি হচ্ছে, দেখে এসেছি।"

রাধাগোবিন্দবাবু বলে উঠলেন, "দাঁড়ান ফটিকবাবু, আমিও আপনার সঙ্গেই বেরোব, আজ আমার বেয়াই-বেয়ান এসেছেন। বাজারটা একটু ঘুরে যেতে হবে, যদি টাটকা মাছ-টাছ পাওয়া যায়।"

এমনি করে প্রায় সকলেই একে-একে উঠে পড়তে লাগলেন। ঘরটা ফাঁকা হয়ে গেল একসময়।

একা নন্দবাবু মড়ার খুলির সামনে মোমবাতির আলোয় আনমনা হয়ে বসে রইলেন। মনটায় একটা ধন্দ-ভাব। একটা সন্দেহ। একটু রহস্য।

গিরিজা যদি মিথ্যে কথা না বলে থাকে, তা হলে এই হেলমেটটা এল কোথা থেকে?

তিনি হাত বাড়িয়ে হেলমেটটা তুলে নিলেন। মোমবাতির আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। দেখতে অনেকটা তো মানিকের হেলমেটের মতোই।

রাত বাড়ছে। বাইরে একঝাঁক শিয়াল ডাকল। হু হু করে উত্তুরে একটা হাওয়া ভূতের নিশ্বাসের মতো বয়ে গেল। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। টিকটিকি রহস্যময় ভাবে টিকটিক করে উঠল। মোমবাতির শিখা কেঁপে-কেঁপে উঠল হঠাৎ।

নন্দবাবুর হঠাৎ কেমন যেন গা'টা ছমছম করে উঠল। তিনি হেলমেটটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বেরোতে যাবেন বলে পা বাড়িয়েছেন, হঠাৎ শুনতে পেলেন, কে যেন জুতোর আওয়াজ তুলে এদিকে আসছে।

দরজাটা ভেজানো। নন্দবাবু দরজার দিকে তাকিয়ে চিন্তা করে দেখলেন, আজ ভৌত ক্লাবের দু'জন সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। নরেনবাবু আর সনাতনবাবু। রাত

এখন বেশি হয়নি। হয়তো তাঁদেরই কেউ আসছেন।

নন্দবাবু আবার বসে পড়লেন। এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গিয়ে তাঁর কোনও লাভ নেই। এই সময়টা বাড়িতে ছেলেপুলেগুলো ভারি চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করে। সেজদা যদুলাল কানে কম শোনেন বলে খুব জোরে রেডিও ছেড়ে বসে থাকেন। নন্দবাবুর ঠাকুমা'র সঙ্গে বুড়ি দাসী মোক্ষদার বচসাও হয় ঠিক এই সময়ে। নন্দবাবুর বাবা ডাকসাইটে ভুবন রায় ঠিক এই সময়েই ছেলেদের ডেকে বকাঝকা করেন। বাড়িটায় শান্তি নেই।

নন্দবাবু পায়ের শব্দটার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন, "আসুন নরেনবাবু, আসুন সনাতনবাবু।"

পায়ের শব্দটা এগিয়ে এল বটে, কিন্তু দরজা খুলে কেউ ঘরে ঢুকল না। নন্দবাবু স্পষ্ট শুনতে পেলেন, ঘরের পাশ দিয়ে পায়ের শব্দটা ভিতরের সিঁড়িঘরের দিকে চলে যাচ্ছে।

এই ভাঙা বাড়িতে বলতে গেলে বাইরের দিকের এই একখানা ঘরই আস্ত আছে। ভিতর-বাড়িটা একেবারেই ভাঙাচোরা এবং রাজ্যের ডাঁই করা আবর্জনায় অতিশয় দুর্গম।

"কে? কে যায়?"

নন্দবাবুর চেঁচানির কেউ জবাব দিল না। পায়ের শব্দটা ধীরে-ধীরে ধ্বংসস্তূপে ঢাকা বাড়িটার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

নন্দবাবু আর এক সেকেন্ডও দেরি করলেন না। এক লাফে গিয়ে দরজা খুলে ছুটতে লাগলেন। শক্ত জুতোয় পা ছিঁড়ে যেতে লাগল, তবু থামলেন না। একেবারে নিজের ঘরটিতে পৌঁছে হ্যা-হ্যা করে হাঁফাতে লাগলেন।

খানিকক্ষণ জিরোবার পর হঠাৎ খেয়াল হল, হেলমেটটা তিনি ভৌত ক্লাবের ঘরেই ফেলে এসেছেন।

ভুবন রায়ের বয়স পঁচাশি বটে, কিন্তু তাঁকে বুড়োমানুষ বললে অপমানই করা হবে। ভুবন রায় ওলিম্পিকে দেশের হয়ে ওয়েটলিফটিং করে এসেছেন যৌবন-কালে। একটা মেডেল পেলেও পেয়ে যেতে পারতেন। পারলেন না কেবল

খাওয়ার প্রতি তাঁর সাঙ্ঘাতিক লোভের জন্য। প্রতিযোগিতার দিন সকালবেলায় তিনি একরাশ মাংস আর ডিম খেয়ে অ্যায়সা ওজন বাড়িয়ে ফেলেছিলেন যে, তাঁকে লাইট-হেভি গ্রুপের প্রতিযোগিতায় নামতে দেওয়া হল না। কর্মকর্তারা বললেন, ‘‘তোমাকে হেভিওয়েটে কমপিট করতে হবে।’’ তবে ভুবন রায় দমবার পাত্র নন। কোমর বেঁধে হেভিওয়েট গ্রুপের দৈত্য-দানবদের সঙ্গেই প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লেন। আশ্চর্যের বিষয়, তিনি ষষ্ঠ স্থান দখল করেছিলেন। লাইট-হেভি গ্রুপে হলে যে সোনার মেডেল জয় করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন হত না, এ-কথা সবাই স্বীকার করেছিল। তা ভুবন রায়ের জীবনটাই এমনি। মিলিটারিতে বেশ উঁচু পর্যায়ের অফিসার ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভালরকম লড়াই করেছেন। কিন্তু যুদ্ধ যেই থামল, অমনি তাঁর জীবনটা আলুনি হয়ে গেল। মিলিটারিতে চাকরি করবেন, অথচ যুদ্ধ করবেন না, এটা তাঁর কাছে এক অসহ্য ব্যাপার। দেশের জন্য যুদ্ধ করতে-করতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেবেন, এটা তাঁর অনেক দিনের সাধ। কিন্তু যুদ্ধ থামবার পর দেশ স্বাধীন হয়ে গেল এবং সবাই শান্তির বাণী কপচাতে লাগল দেখে তিনি ভারি চটে গেলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন, ‘‘ভারতবাসীরা যুদ্ধ করেনি বলেই মানুষ হয়ে উঠতে পারছে না। যুদ্ধ না বাধালে দেশের যুবশক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে, জাতীয় চরিত্র গঠিত হবে না। যুদ্ধই জাতীয় সংহতি সৃষ্টি করে। অতএব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি একটা যুদ্ধ ঘোষণা করুন।’’ বলাই বাহুল্য, এ চিঠির প্রতি প্রধানমন্ত্রী তেমন গুরুত্ব দেননি, তবে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কাছে চিঠিটা পাঠিয়ে দেন। আর প্রধানমন্ত্রীকে ওই চিঠি লেখার দরুন ভুবন রায়ের কোর্ট মার্শাল হওয়ার জোগাড়। ভুবন রায় তাতেই কী খুশি। কোর্ট মার্শাল হয়ে যদি গুলি খেয়ে মরতে হয়, তা হলেও একরকম দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার শামিল হবে ব্যাপারটা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তা হল না। নতুন সরকার দয়ার অবতার, শান্তির বাণী ছাড়া মুখে কথা নেই। তাই তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়া হল। ভুবন রায় ঘেন্নায় নাক সিঁটকে মিলিটারির চাকরি ছেড়ে দিলেন। তারপর এই গঞ্জে এসে গ্যাঁট হয়ে বসে দুধের ব্যবসা শুরু করলেন। মেলা গোরু কিনে ফেললেন এবং দুধ, মাখন, ঘি তৈরি করে বাড়ি-বাড়ি ফিরি করে বেড়াতে লাগলেন। খাঁটি ঘি-দুধের অভাবেই যে বাঙালির স্বাস্থ্যের এত অবনতি, তাতে সন্দেহ কী? কিন্তু গঞ্জের মানুষের তেমন পয়সা নেই। সবাই ধার-বাকিতে ঘি-দুধ কেনে, কিন্তু পরে আর ধার শোধ করতে পারে না। ভুবন রায়ের ব্যবসা লাটে উঠল। এরপর তিনি জুতোর দোকান খুললেন। তাতেও বিশেষ সুবিধে হল না। অবশেষে চাষবাস শুরু করার পর তাঁর কপাল খুলে গেল।

ভুবন রায়কে ভয় পায় না, এমন লোক গোটা পরগনায় নেই। ছেলেরা কেউ তাঁর চোখের দিকে চেয়ে কথা বলতে সাহস পায় না। শুধু তাই নয়, এখনও

প্রত্যেকদিন রাত্রিবেলা তিনি তাঁর চার ছেলেকে ডেকে সামনে দাঁড় করিয়ে প্রায়ই বকাঝকা করেন। বড় ছেলেন বয়স পঞ্চাশের ওপর। সবচেয়ে ছোটটির বয়স পঁচিশ। সবাই প্রাপ্তবয়স্ক কিন্তু ভুবন রায় তাঁদের নাবালক ছাড়া কিছুই মনে করেন না।

ইদানীং ভুবন রায়ের মাথায় বিজ্ঞান ভর করেছে। একদিন ছাদে বেড়াতে বেড়াতে তিনি হঠাৎ দেখতে পেলেন, গোটা দুনিয়াটাই জ্যামিতিতে ভরা। ছাদটা একটা আয়তক্ষেত্র, চাঁদটা একটা বৃত্ত, সুপুরি গাছগুলো সরলরেখা এবং চারদিকে আর যা-যা আছে, সব কিছুই জটিল জ্যামিতিক নকশা ছাড়া আর কিছুই নয়। জ্যামিতি ও
ঘন জ্যামিতি।

আর একদিন তিনি দুধ, কলা আর খই মেখে ফলার খেতে গিয়ে হঠাৎ বোধ করলেন, এ তো রসায়ন। দুধ, কলা আর খই মেশানো এই যে পদার্থটি একে রাসায়নিক সংমিশ্রণ বলা যায় না কি? এই যে জল খাচ্ছেন, এও তো এইচ-টু-ও! চারদিকেই ভুবন রায় তখন রাসায়নিক বিক্রিয়া দেখতে লাগলেন।

একদিন তাঁর নাতনি বাবলি ফিজিক্স পড়ছিল। পাশের ঘর থেকে ভুবন রায় আলোর প্রতিসরণের অত্যাশ্চর্য ব্যাপারটা শুনে খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তাই তো! পদার্থবিদ্যাই তো আসল বিদ্যা।

আবার আড়াই টাকা করে সের সাতাশ পো দুধের দাম কত, এটা একদিন গয়লাকে বোঝাতে গিয়ে যখন হিমশিম খাচ্ছেন, তখন গয়লা অনায়াসে দামটা বলে দেওয়ায় ভুবন রায় নিজের অঙ্কবোধের অভাবে ভীষণ মুষড়ে পড়লেন। তারপর থেকেই দুপুরবেলা নাতি-নাতনিদের অঙ্কের বই নিয়ে চুপিচুপি আঁক কষা শুরু করেন।

ভুবন রায়ের বড় ছেলে রামলাল কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। অতিশয় নিরীহ মানুষ। ভুবন রায় একদিন সন্ধেবেলা তাঁকে ডেকে পাঠালেন।

রামলাল কাঁচুমাচু মুখে সামনে এসে বিনীতভাবে দাঁড়াতেই ভুবন রায় হঠাৎ একটু তাচ্ছিল্যে 'হুঁ' শব্দ করে বললেন, "ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার।"

"আজ্ঞে?"

"তুমি তো একজন বিজ্ঞানী, না কি?"

রামলাল মাথা চুলকে বললেন, "আজ্ঞে, বিজ্ঞানী বললে বাড়াবাড়ি হবে। তবে বিজ্ঞানের অধ্যাপক বটে।"

"ওই হল। নিজেকে ছোট ভাবতে নেই হে, বিনয়বশেও না। তুমি তো বি এস-সি আর এম এস-সি'তে সোনার মেডেলও পেয়েছিলে।"

"যে আজ্ঞে।"

"আর তারপরেই তোমার দম গেল ফুরিয়ে। সোনার মেডেল পাওয়া ছেলেদের যদি এই হাল হয়, তবে দেশের বিজ্ঞান কোথায় পড়ে আছে! ওদিকে জাপানিরা, মার্কিনিরা বিজ্ঞানে ধড়াধ্বড় এগিয়ে যাচ্ছে, আকাশে মানুষ পাঠাচ্ছে, যন্ত্রকে দিয়ে কথা কওয়াচ্ছে, আর তুমি মুখের ফেকো তুলো বিজ্ঞানের বক্তৃতা দিয়ে মাসে মাসে দু'-পাঁচশো টাকা রোজগার করেই আহ্লাদে আটখানা! ছ্যা ছ্যা।"

রামলাল লজ্জায় দীনতায় মাথা নামিয়ে রইলেন।

ভুবন রায় অতিশয় কঠোর দৃষ্টিতে ছেলে দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, "আমি লক্ষ্য করেছি, তোমার কোন নিজস্ব ল্যাবরেটরি নেই। কলেজের ল্যাবরেটরিতেও তুমি কদাচিৎ যাও। অর্থাৎ হাতে-কলমে বিজ্ঞানচর্চার পাট তোমার উঠেই গেছে।"

"আজ্ঞে, তা-ই বটে।"

"সেই জন্যই তো বলছিলাম, ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার। যে বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগার নেই, সে আবার কিসের বিজ্ঞানী?"

"যে আজ্ঞে।"

ভুবন রায় আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন, "তোমার বয়স অল্প, সুতরাং এগুলো নতুন করে সবই শুরু করা যায়। আমি ঠিক করেছি, আমাদের পুরনো গোয়ালঘরটা একটু সারিয়ে নিয়ে একটা পুরোদস্তুর ল্যাবরেটরি বানিয়ে ফেলব। গোয়ালটা বেশ লম্বা আর বড়। কাজের পক্ষে চমৎকার হবে।"

রামলাল ভারি অবাক হলেন। কিন্তু প্রতিবাদ করার মতো বুকের বল খুঁজে না পেয়ে মিনমিন করে বললেন, তার যে অনেক খরচ!"

ভুবন রায় অবিকল বন্দুকের আওয়াজ বের করলেন গলা দিয়ে, "খরচ! ভুবন রায় কবে খরচকে ভয় পেয়েছে শুনি! বিজ্ঞান-চেতনার অভাবে দেশটা উৎসন্নে যাচ্ছে। তুমি একটা গোল্ড মেডালিস্ট হয়েও দিন-দিন হাবাগোবা হয়ে যাচ্ছ, আর আমি খরচের ভয়ে হাত গুটিয়ে থাকব?"

"আজ্ঞে, তা বটে।"

"বিজ্ঞান শিখেছিলে কি মুখস্থবিদ্যা জাহির করে মাসের শেষে দু'চারশো টাকা আয় করে উঞ্ছবৃত্তিতে জীবন কাটাবে বলে? আবিষ্কারকই যদি না হলে, তা হলে শিখে লাভটা হল কী?"

"যে আজ্ঞে।"

"তুমি কাল থেকেই লেগে পড়ো। কলকাতায় চলে যাও, যা-যা যন্ত্রপাতি লাগে, সব কিনে নিয়ে এসো। কাজে লেগে পড়ো। আমারও খানিকটা বিজ্ঞান

পড়া আছে। তোমার অ্যাডভাইসার হিসেবে আমিও থাকব, হাতে-কলমে কাজ করব। এখনও কত কী আবিষ্কার করার আছে। এই ধরো না কেন, তোমার মায়ের তো খুব পান খাওয়ার নেশা, রোজ রাশি-রাশি সুপুরি কুচোতে হয়। সুপুরি কুচোনোর একটা যন্ত্র যদি বানিয়ে ফেলতে পারো তো কত উপকার হয়। আমাদের হারু নাপ্তের চোখে ছানি আসছে, সেদিন ও আমার কানের ডগাটা প্রায় ছেঁটে ফেলেছিল কাঁচি দিয়ে। ভাবছিলাম যদি চুল ছাঁটার একটা যন্ত্র তৈরি করা যায় তো মন্দ হয় না। জিনিসটা হবে অনেকটা হেলমেটের মতো, মাথায় পরে কিছুক্ষণ বসে থাকলেই চুল চমৎকার কাটা হয়ে যাবে। তারপর এরকম আরও কত কী বের করে ফেলা যায়। নিত্যি নতুন জিনিস আবিষ্কার করার আনন্দই আলাদা।''

''যে আজ্ঞে।''

''যাও, কাল থেকেই কাজে লেগে পড়ো। আর শোনো, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি সব রকম এক্সপেরিমেন্টের জন্যই যন্ত্রপাতি চাই। বুঝলে?''

''যে আজ্ঞে।''

সুতরাং রামলালকে কলকাতায় যেতে হল। কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতা থেকে মেলা যন্ত্রপাতি এসে পড়ল। রামলাল মাসখানেক ভূতের মতো খেটে ল্যাবরেটরি সাজিয়ে ফেললেন।

ভুবন রায় ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা দেখে খুশি হয়ে বললেন, ''শোনো হে রামলাল, প্রতি সপ্তাহে একটা করে নতুন জিনিস আবিষ্কার করতে হবে, এইরকম একটা প্রতিজ্ঞা করে কাজে লেগে পড়ো। পিছনে আমিও আছি।''

রামলাল বেজার মুখ করে বললেন, ''যে আজ্ঞে।''

কিন্তু কী আবিষ্কার করবেন তা ভেবে ভেবে কূল পেলেন না।

ভুবন রায় কিন্তু মহা উৎসাহে যন্ত্রপাতি নিয়ে তুমুল কাজে লেগে গেলেন।

একদিন হাতে একটা কাচের বাটি নিয়ে 'ইউরেকা! ইউরেকা!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এলেন ভুবন রায়। সবাইকে বাটির মধ্যে একটা কাদার মতো থকথকে জিনিস দেখাতে লাগলেন।

সবাই জিজ্ঞেস করল, ''জিনিসটা কী?''

ভুবন রায় মাথা নেড়ে বললেন, ''এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে আর দুটো এক্সপেরিমেন্টের পরেই বোঝা যাবে।''

সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

পরদিনই ভুবন রায় ফের 'ইউরেকা! ইউরেকা!' করে বেরিয়ে এলেন। হাতে একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে সবুজ তরল পদার্থ।

সবাই জানতে চাইল, জিনিসটা কী?

ভুবন রায় মৃদু হেসে বললেন, "বুঝতে পারবে হে, কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারবে।"

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, ভুবন রায় অনেকগুলো জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছেন। একটা কাচের গোলকের মধ্যে তিনটে কাচের গুলি, একটা দেশলাইয়ের বাক্সের মতো দেখতে যন্ত্র, বেশ কয়েকটা কেমিক্যাল। কিন্তু এগুলো দিয়ে কী হবে, তা আর কেউ জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল না।

বিজ্ঞানীরা অনেক সময়ে এমন সব জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেন, যা বস্তুত মানুষের কোন কাজেই লাগে না। এরকম একটা অর্থহীন বিখ্যাত আবিষ্কার হল জলিপাট্টি। জলিপাট্টি একটা পুডিং এর মতো জিনিস। কিন্তু মেঝেয় ফেলে দিলে কাচের মতোই ভেঙে যায়। আবার কোনও পাত্রে রেখে দিলে কিছুক্ষণ পর তা তরল হয়ে গড়িয়ে যেতে থাকে। বিজ্ঞানীরা আজ অবধি একে কোনও কাজে লাগাতে পারেননি। আর একটা জটিল যন্ত্রও আবিষ্কার করা হয়েছিল, যার মধ্যে চালিত সমস্ত বিদ্যুৎ-প্রবাহই শূন্যে পর্যবসিত হয়। যন্ত্রটা আজও কোন কাজে লাগানো যায়নি। কিন্তু এইসব আবিষ্কার বিজ্ঞানচর্চার অবশ্যম্ভাবী কিছু লেজুড়।

আবিষ্কারগুলো কেমন হল, তা ভুবন রায় একদিন রামলালের কাছে জানতে চাওয়ায় রামলাল বিজ্ঞানের এইসব নিষ্ফল আবিষ্কারের কিছু ঘটনার কথা মনের ভুলে বলে ফেলেছিলেন। ভুবন রায় ছেলের ওপর এমন খাপ্পা হয়ে গেলেন যে, রাত্রে সেদিন জলস্পর্শ করলেন না, এবং সারারাত ল্যাবরেটরিতে জেগে কালজয়ী কিছু একটা আবিষ্কার করার জন্য উঠে-পড়ে লেগে রইলেন। তিন-চারদিন তাঁর নাওয়া-খাওয়ার হুঁশ রইল না।

তারপর একদিন একটা দূরবীনের মতো যন্ত্র নিয়ে বেরিয়ে এসে সগর্বে সবাইকে বললেন, "ইউরেকা! ভুত দেখার যন্ত্র আবিষ্কার করেছি।"

শুনে সবাই আঁতকে উঠল।

কিন্তু সমস্যা হল, যন্ত্রটা চোখে দিয়ে ভুবন রায় নানা আকৃতির অজস্র ভূত দেখতে পান বটে, এবং তার ধারাবিবরণীও দিতে থাকেন, "ওই যে একটা শুঁটকো ভুত পান্তা ভাত খাচ্ছে... ওই যে একটা পেত্নি আকাশে চুল ছড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছে... ওই তো শিবচন্দ্র কামারের ভূত হরিহর পালের ভূতকে ধরে ঠ্যাঙাচ্ছে..." ইত্যাদি, কিন্তু সেই যন্ত্র দিয়ে আর কেউ অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। কিন্তু সে-কথা ভুবন রায়কে বলে, এমন সাহস কার?

রামলালকেও স্বীকার করতে হল যে, যন্ত্রটা দিয়ে আবছা আবছা ভৌতিক কিছু দেখা যায় বটে।

ভুবন রায় চটে উঠে বললেন, "আবছা-আবছা মানে, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

ভাল করে দ্যাখো।"

রামলাল আমতা-আমতা করে বললেন, "আজ্ঞে স্পষ্টই।"

"কী দেখছ বলো।"

অগত্যা রামলাল বানিয়ে বলতে লাগলেন, "আজ্ঞে একটা রোগা আর একটা মোটা ভুত কুস্তি করছে... আর একটা পেত্নি ডালের বড়ি দিচ্ছে..."।

"তবে?" বলে খুব হাসলেন ভুবন রায়। তারপর ছেলেকে বললেন, "কিন্তু তুমি কী করছ? এখনও তো একটাও কিছু আবিষ্কার করতে পারলে না।"

"আজ্ঞে না।"

"সাত দিন সময় দিলাম। কিছু একটা করে দেখাও। দীর্ঘদিন মাস্টারি করে মাথার বারোটা বাজিয়েছে। মাথাটা এবার খাটাও।"

"যে আজ্ঞে।"

সুতরাং রামলালকে কাজে লাগতে হল। কী করবেন, তা তিনি ভেবেই পাচ্ছিলেন না।

একদিন তিনি বসে-বসে ভুবন রায়ের আবিষ্কৃত জিনিসগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, ল্যাবরেটরির মধ্যে একটা যেন কিছু ঘটছে।

ল্যাবরেটরিতে কী ঘটেছে তা রামলাল বুঝতে পারলেন না বটে, কিন্তু তাঁর মনে হল, বিশাল গোয়াল ঘরটার কোনও একটা প্রান্তে কেউ একজন নড়াচাড়া করছে।

রামলাল খুবই ভিতু মানুষ। তিনি সভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কে ওখানে?"

কেউ থাকার কথাও নয়। ল্যাবরেটরির একটামাত্র দরজা। রামলাল ঢুকেছেন এবং নিজের হাতে ছিটকিনি বন্ধ করেছেন। সুতরাং কে হতে পারে?

রামলালের প্রশ্নের জবাব অবশ্য কেউ দিল না। কিন্তু রামলাল সুস্পষ্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ পেলেন। তারপর শুনলেন, ক্যাবিনেট খুলে কে যেন একটা টেস্ট-টিউব বের করল। তারপর একটা টিউবের মধ্যে একটা তরল জিনিস পড়ার শব্দ হল।

রামলাল শিউরে উঠলেন। তারপরই তারস্বরে "রাম... রাম... রাম... বাবা রে—মা রে ....", বলে চেঁচাতে চেঁচাতে দড়াম করে এসে দরজায় ধাক্কা খেলেন। ছিটকিনিটা কোনওরকমে খুলে এক লাফে উঠোনে পড়ে দৌড়তে গিয়ে আছাড় খেলেন। গোড়ালি মচকে গেল। তা সত্ত্বেও উঠে ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে ছুটতে লাগলেন। মুখে "বাঁচাও... বাঁচাও... " চিৎকার।

কিন্তু মুশকিল হল, ল্যাবরেটরিটা বাড়ির পিছন দিকে এবং অনেকটা দূরে।

এদিকটায় অনেকটা ফাঁকা জমি, বাগান। কেউ তাঁর চেঁচানি শুনতে পেল না। বকুলগাছের তলায় রামলাল আবার বড় ঘাসে পা আটকে পড়ে গেলেন এবং সেখান থেকে সভয়ে ল্যাবরেটরির দিকে একবার চেয়ে দেখতে গিয়ে তিনি একেবারে হাঁ।

প্রকাণ্ড দরজাটা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, ল্যাবরেটরির মধ্যে কে যেন দিব্যি আলোগুলো নিভিয়ে দিয়েছে। অন্ধকারে একটা বুনসেন বার্নারের আগুন দেখতে পেলেন রামলাল।

এরপর মচকানো পা নিয়েই যে দৌড়টা দিলেন রামলাল, তেমন দৌড় বোধহয় কার্ল লিউসও ওলিম্পিকের একশো মিটারে দৌড়তে পারেনি।

ভুবন রায় ভ্রূ কুঁচকে রামলালের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, "দৌড়ে এলে মনে হচ্ছে! বাঃ, খুব ভাল। এতদিনে যে নিজের শরীরের দিকে নজর দিয়েছ, এতে আমি খুব খুশি। তবে এখন রাত ন'টা বাজে। এ-সময়টায় না দৌড়নোই ভাল।"

রামলাল হ্যা-হ্যা করে ফাঁফাচ্ছিলেন যে, কথার জবাব দেওয়ার মতো অবস্থা ছিল না!

ভুবন রায় তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন "সকালে উঠে দৌড়নোই ভাল। মাইলটাক দৌড়লেই দেখবে তোমার মতো নীরেট মাথাও কেমন চনমন করে উঠছে।"

হ্যা-হ্যা করতে-করতেই রামলাল মাথা নেড়ে জানালেন যে, যথা আজ্ঞে।

ভুবন রায় ছেলের দিকে চেয়ে হঠাৎ কিছু মনে পড়ায় বললেন, "ওঃ হো, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। আমি একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট পেয়েছি। বুড়ো মানুষ। তুমিও তাঁকে চিনবে। হাই-স্কুলের সায়েন্সের টিচার ছিলেন। নাম দুলাল সেন। তিন কুলে কেউ নেই, অভাবেও পড়েছিলেন খুব। তার ওপর আবার কানে একদম শুনতে পান না। আজ থেকে তিনি আমাদের ল্যাবরেটরিতেই রয়েছেন। একেবারে কোণের দিকে একটা চৌকি পেতে দিয়েছি, সেখানেই থাকছেন আর একটু-আধটু কাজকর্মও করছেন। ল্যাবরেটরিতে গেলেই তাঁকে দেখতে পাবে।"

এ-কথায় রামলাল ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন বটে, কিন্তু কিছু বলার জো নেই। হাঁফাতে-হাঁফাতে করুণ নয়নে চেয়ে রইলেন বাবার দিকে। তারপর ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে বেরিয়ে ঠাকুমার কাছে গিয়ে বসলেন।

রামলালের ঠাকুমা, অর্থাৎ ভুবন রায়ের মা হরমোহিনী দেবীর বয়স একশো এক বছর। তাঁর হাঁকেডাকে সবাই অস্থির। ডাকসাইটে ভুবন রায় এই দুনিয়ায় একমাত্র মাকেই ডরান। হরমোহিনীর বকাবকির চোটে এ-বাড়িতে ঝি-চাকর থাকতে চায় না, কাকপক্ষী আসতে চায় না, এমনকী কুকুর-বিড়াল অবধি এ-

বাড়িকে এড়িয়ে চলে। শুধু বুড়ি দাসী মোক্ষদাই হরমোহিনীকে ভয় খায় না। আর তার সঙ্গেই রোজ সন্ধেবেলা হরমোহিনীর তুলকালাম ঝগড়া হয়। আজও হচ্ছিল।

হরমোহিনীর পায়ে বাতের ব্যথা। তাতে গরম রসুনতেল মালিশ করতে বসেছে মোক্ষদা। কিছুক্ষণ মালিশ চলার পর হরমোহিনী হঠাৎ বললেন, "হ্যাঁ রে মোক্ষদা, ব্যথা আমার বাঁ হাঁটুতে, আর তুই কোন্ আক্কেলে আমার ডান হাঁটুতে মালিশ করতে লেগেছিস?"

মোক্ষদা সপাটে বলল, "হাঁটু তো তুমিই এগিয়ে দিল বাপু। আমি কি হাঁটু বেছে নিয়েছি? আমি তেমন বাপের মেয়ে নই যে, পরের হাঁটু নিয়ে বাছাবাছি করব। আর এও বলি বাপু, এটা তোমার বাঁ হাঁটুই।"

হরমোহিনী উঁচুতে গলা তুলে বললেন,, "বড্ড মুখ বেড়েছে তোর মোক্ষদা, এটা যদি আমার বাঁ হাঁটুই হবে তা হলে ব্যথাটা আমার ডান হাঁটুতে হচ্ছে কী করে?"

তা তোমার যদি ব্যাথা নিত্যি নিত্যি হাঁটু বদল করে তা হলে আমার আর কী করার আছে? তোমার খিটখিটে স্বভাব, কেবল ঝগড়া করবে বলে গলা চুলকোয়। নইলে ঠিকই বুঝতে পারতে যে, ব্যথা তোমার বাঁ হাটুতেই।"

'ওলো ভালমানুষের বেটি লো, আমাকে উনি হাঁটু চেনাতে এলেন। পাঁচ কুড়ি এক বয়সে কত হাঁটু দেখেছি তা জানিস? হাঁটুর তুই কী জানিস লা? আমার

হাঁটু, আমার ব্যথা, আর উনি এলেন আমাকে হাঁটু চেনাতে!''

''তা বেশ বাপু, ঘাট মানছি। স্বীকার করছি হাঁটুও তোমার, ব্যথাও তোমার। কিন্তু কোন্ আক্কেলে তুমি তোমার বাঁ হাটুকে ডান হাঁটু বলে চালানোর চেষ্টা করছ বলো তো! তুমি যে দেখছি দিনকে রাত করতে পারো।''

''কখন আবার বাঁ হাঁটুকে ডান হাঁটু বললুম বল তো! ও-ম্মা, কী মিথ্যেবাদী রে! আমি তোকে বলিনি, ব্যথা আমার বাঁ হাঁটুতে। আর তুই মালিশ করছিস ডান হাঁটুতে?''

''বলেছ। আমিও কানে কালা নই যে শুনিনি। তুমি হাঁটুটা লেপের তলা থেকে ঠেলে বের করে দিলে, আমিও মালিশ করতে লাগলুম। এটা তোমার বাঁ হাঁটু না ডান, তা নিয়ে আমার কোন্ মাথাব্যথাটা শুনি! তোমার হাঁটু তুমি বুঝবে, আমার মালিশ করার কাজ মালিশ করে যাব।''

''তাই যদি হবে তা হলে বড় গলা করে আমাকে আমার হাঁটু চেনাচ্ছিস কেন?''

''নিজের হাঁটু যদি নিজেই না চেনো তা হলে লোকে আর কী করবে? তাও বলি বাপু, ভীমরতি ধরেছে সে-কথা স্বীকার করলেই তো ল্যাটা চুকে যায়।''

''ভীমরতি আমাকে ধরবে কেন র‍্যা, ভীমরতি ধরেছে তোকে। নইলে কি আর ডান হাঁটুতে মালিশ করিস? আজ বেশ বুঝতে পারছি, কেন রসুন তেল নিত্যি মালিশ করেও আমার বাঁ হাঁটুর ব্যথাটা কমছে না। কী বুদ্ধিই না তোকে ভগবান দিয়েছেন! রোজ সন্ধেবেলা আমি একটু ঝিমোই, আর তুই মুখপুড়ি, এসে বাঁ হাঁটুর বদলে চুপিচুপি আমার ডান হাঁটুতে মালিশ করে যাস!''

''ভীমরতি নয় গো, তোমার মাথায় জিন-পরি কিছু ভর করেছে। তখন থেকে বলছি, এ-তোমার ডান হাঁটু নয়, এটা বাঁ হাঁটুই, তাও কেন যে টিকির-টিকির করে যাচ্ছ!''

''ওরে আবাগির বেটি, এটা বাঁ হলে, আমার অন্য হাঁটুটা তা হলে কী? সেটাও কি বাঁ হাঁটু? তুই কি তা হলে বলতে চাস, বিধাতা আমাকে দু-দুটো হাঁটু দিলেন আর দুটোই বাঁ হাঁটু? আর তাই যদি হবে তা হলে এতকাল আমি সেটা জানতে পারতুম না? তুই আমাকে বুঝিয়ে বল দেখি, এটা বাঁ হলে আমার অন্য হাঁটুটা কী হয়?''

''এ তো কানা মানুষও জানে গো, একটা বাঁ হলে অন্যটা ডান হবেই। কিন্তু তোমার মতো মানুষকে ভগবান যদি দুটো বাঁ হাঁটুই দিয়ে থাকেন তাহলে আশ্চর্যের কিছু নেই। তোমার সবই তো অশৈলী কাণ্ড।''

''কী এমন তোকে বললুম বল তো মোক্ষদা যে, আমার হাঁটু নিয়ে খুঁড়ছিস! তখন থেকে পইপই করে বোঝাচ্ছি, ওরে মোক্ষদা, ভালোমানুষের মেয়ে, যদি

এই হাঁটুটা আমার বাঁ হাঁটুই হবে তা হলে আমার অন্য হাঁটুটায় ব্যথা হচ্ছে কেন? তুই কি বলতে চাস ব্যথাটা আমার ডান হাঁটুতে? বাঁ হাঁটুতে নয়? এতকাল ধরে কি তবে আমি লোককে মিথ্যে করে বানিয়ে বলে আসছি যে, ব্যথাটা আমার বাঁ হাঁটুতে?''

''তাই তো বলছি গো, নিজের হাঁটু যে নিজে চেনে না তার কি মাথার ঠিক আছে? একশো বছর পার করলে তবু এতদিনে ডান-বাঁ চিনলে না, কেমন মানুষ তুমি বলে তো! পরের জিনিস তো আর নয়, একেবারে নিজের সহোদর দুটো হাঁটু। পাঁচটা-দশটাও নয়, মাত্র দু'খানা। একখানা ডান, একখানা বাঁ। তাও যদি চিনতে তোমার একশো বছরে না কুলোয়, তবে আর এ জন্মে তোমার হাঁটুজ্ঞান হবে না।''

''খুব যে গলা তুলে ঝগড়া করছিস, ডাক দেখি পাঁচজনকে। যা, গিয়ে মোড়ল-মাতব্বর-মুরুব্বিদের ধরে নিয়ে আয়। সালিশ করুক। তারাই ঠিক করুক কোন্‌টা আমার বাঁ হাঁটু, আর কোন্‌টা ডান। তারপর তোমার মুখের মতো জবাব দেব। ভুবনটাকে ডাক তো, যা....''

''আর সালিশ বসাতে হবে না। মোড়ল-মাতব্বরদের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তাঁরা আসবেন তোমার হাঁটুর বিচার করতে! সালিশ বসলে লজ্জার আর বাকি থাকবে না কিছু। সারা শহরে ঢিঢি পড়ে যাবে। সবাই বলে বেড়াবে, ভুবন রায়ের মা হরমোহিনী নিজের দু'খানা হাঁটু একশো বছরেও চিনে উঠতে পারেনি। ছিঃ ছিঃ।''

দু'জনের ঝগড়া চরমে উঠেছে। হরমোহিনী লেপটেপ সরিয়ে ফেলে রীতিমত টানটান হয়ে বসেছেন তাঁর প্রকাণ্ড খাটের বিছানার ওপর। মোক্ষদাও আংরা-জ্বালা মেটে হাঁড়িটা সরিয়ে সেঁক দেওয়ার ফ্লানেলের ভাঁজ করা কাপড়গুলো ফেলে তৈরি হয়ে বসেছে।

এমন সময় ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে রামলাল ঘরে ঢুকে পড়লেন।

''ঠাকুমা!''

নাতিপুতিদের কাছে হরমোহিনী ভারি নরম। দেখলেই মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। একগাল হেসে বললেন, ''আয় দাদা, আয়। হাঁফাচ্ছিস কেন ভাই?''

''সে অনেক কথা ঠাকুমা। শুধু হাঁফাচ্ছিই না গো, ল্যাংচাচ্ছিও। দেখছ না, পায়ের পাতায় কেমন রগ টানা দিয়েছে!''

''ও-স্মা গো, মচকালি কী করে? নিশ্চয়ই ইস্কুলে দুষ্টু ছেলেগুলোর সঙ্গে হুটোপাটি করতে গিয়েছিলি!''

রামলাল করুণ একটু হাসলেন। ঠাকুমার ভীমরতির কথা তাঁর অজানা নয়।

তবে রামলালকে ইস্কুলের ছেলে মনে করাটা বড্ড বাড়াবাড়ি।

রামলাল বললেন, "তাই গো ঠাকুমা। এবার দাও তো তোমার সেই চুনা-হলুদের পট্টি বেঁধে।"

হরমোহিনীর নিজের হাতের চুন-হলুদের গরম পট্টি বহুকাল ধরে এই বাড়ির ছেলেপুলেদের ব্যথা-বেদনার পরম ওষুধ। হরমোহিনী তাড়াতাড়ি উঠে বললেন, "ওরে ও মোক্ষদা, যা তো মা, একটু চুন-হলুদ মিশিয়ে নিয়ে আয়, আংরায় গরম করে লাগিয়ে দিই।"

মোক্ষদা গজগজ করতে লাগল, "ডান হাঁটু বাঁ হাঁটুর জ্ঞান নেই, ছেলে-বুড়োর জ্ঞান নেই, উনি আবার আমাকে হাঁটু চেনাতে লেগেছিলেন!"

এই কথাতে হরমোহিনী ফের জো পেয়ে নাতিকে সাক্ষী মেনে বললেন, "বল তো ভাই, এটা আমার কোন্ হাঁটু, ডান না বাঁ?"

রামলাল মাথাটাথা চুলকে বললেন, "ঠাকুমা, এ তো তোমার বাঁ হাঁটু বলেই সন্দেহ হচ্ছে।"

"তবেই বল ভাই, মোক্ষদা হারামজাদি কিছুতেই মানছে না যে, এটা আমার বাঁ হাঁটু। তখন থেকে বলেই যাচ্ছে, আমি নাকি আমার হাঁটু চিনি না! কলিকাল কি আর সাধে বলে রে ভাই, হাঁটুর বয়সী মেয়ে সে এল আমাকে হাঁটু চেনাতে!"

মোক্ষদা ফোঁস করে উঠে বলল, "দুনিয়াসুদ্ধু লোক জানে যে, ওটা তোমার বাঁ হাঁটু। শুধু তুমিই জানতে না। তখন থেকে বলে যাচ্ছ যে, ওটা তোমার ডান হাঁটু।"

হরমোহিনী কপালে হাত দিয়ে বললেন, "কোথায় যাব মা, আবাগির বেটি বলে কী? কখন তোকে বললাম রে যে, এটা আমার ডান হাঁটু?"

আবার একটা ঝগড়া পাকিয়ে উঠছিল। রামলাল বিপদ দেখে তাড়াতাড়ি ঠাকুমার পাশে বসে পড়ে বললেন, "আমার যে খিদে পেয়েছে গো ঠাকুমা, কিছু খেতেটেতে দেবে নাকি?"

খাওয়ার কথায় হরমোহিনীকে যত বশ করা যায়, তত আর কিছুতে নয়। তিনি মনে করেন, ছেলেপুলেরা যত খাবে তত তাদের বুদ্ধি খুলবে, তত উন্নতি হবে।"

"খাবি ভাই?" বলে একগাল হাসলেন হরমোহিনী। তারপর উঠে জালের আলমারি খুলে একবাটি সর বের করে তাতে মিছরির গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলেন।

"খা দেখি বসে-বসে। সবটা খা।"

রামলালের খিদে নেই। তবু খেতে লাগলেন। সেই দৃশ্য দেখে ফোকলা মুখে খুব আহ্লাদের হাসি হাসতে লাগলেন হরমোহিনী।

ঠিক এই সময়ে ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে নন্দবাবু ঘরে ঢুকলেন।

হরমোহিনী তাঁকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, "নন্দ না কি রে?"

"হ্যাঁ ঠাকুমা।"

"তা তুই কোত্থেকে এলি ভাই? সবাই যে বলে তুই সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে গেছিস!"

"এখনও যাইনি ঠাকুমা।"

"তা হলে তোর দেখা পাই না কেন? তুইও কি পা মচকেছিস? কে তোকে ল্যাং মারল?"

সবাই জানে, ভুতোর মাথায় যখন পরি ভর করে তখন একটা কিছু হবেই।

ভুতো এ-বাড়ির ছেলে নয়। এমনকী আত্মীয় পর্যন্ত নয়। তবু ভুতো এ-বাড়ির একজন হয়ে গেছে। আগে তাকে দিয়ে বাড়িতে চাকর-বাকরের কাজ করানো হত। তারপর তার খোলতাই মাথা আর নানা বাহাদুরি দেখে তাকে ইস্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে সেও পড়ে। বলতে গেলে সে-ই হল সর্দারি-পোড়ো।

তবে মুশকিল হল মাঝে-মাঝে তার মাথায় পরি ভর করে। কিন্তু পরি ভর করাটা কী?

তা ভুতো জানে না। তবে ভুতোর ভাষায়, সেই যে-বার দেশে খুব আকাল হল, তখন আমার বাবা একদিন আমাকে কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সংসারে শুধু আমি আর বাবা-ই তো ছিলাম। মা কোন্‌কালে মরে গিয়েছে। তা বাবার কাঁধে করে যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। চারদিকে পোড়া মাঠ, ঘাস নেই, পাতা নেই, গাঁ-গঞ্জ সব খরায় জ্বলে পুড়ে খাক। নদী, নালা, পুকুর, কুয়ো, টিপকল সব শুকনো। তেষ্টায় বাপ-ব্যাটার গলা কাঠ। তা সন্ধেবেলা আমরা একটা ভুতুড়ে বাড়িতে পৌঁছে গেলুম। বাবা বলল, "ওখানেই বাপ-ব্যাটায় রাত কাটাব।" বাবা গামছা পেতে আমাকে শুইয়ে দিয়ে বলল, "তুই একটু জিরো, আমি চিড়ে-মুড়ি কিছু একটু জোগাড় করে আনছি।" তা বাবা গেল, আর আমিও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ধকল তো বড় কম যায়নি। তারপর হল কি, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখি কি, কোথায় সেই ভাঙা পুরনো বাড়ি, আর কোথায় বা বাবা। আমি দেখলুম,

দিব্যি একটা ঘরের মধ্যে নরম বিছানায় আমি শুয়ে আছি। চারদিকে সব আমার বয়সী ছেলেমেয়ে। তবে সকলের পিঠেই একজোড়া করে ফিনফিনে পাখনা লাগানো। তারা বেশ উড়ছে, হাঁটছে, বসছে। কী সুন্দর সব চেহারা। আমি চোখ মেলতেই সবাই এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। আমি তো ভয় পেয়ে কেঁদে- কেটে একশা। তারা আমার চোখের জল মুছিয়ে দিল, অনেক খাবার দিল, শরবত দিল, খেলনা দিল। আমি যতবার বাবার কাছে যাওয়ার বায়না করি ততবারই তারা কেবল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, আর তাদের মুখগুলো ভারি করুণ হয়ে যায়। তারা তাড়াতাড়ি আমাকে আরও খেলনা দিল, মজার-মজার সব গল্প বলল, গান গাইল, নাচল। আমি বাবার দুঃখ ভুলেই গেলুম। তাদের ভারি সুন্দর বাগান ছিল। সেখানে বারোমাস রামধনু ফুটে থাকে আকাশে। সেখানে কখনও অন্ধকার হয় না। কারও কখনও অসুখ করে না, কেউ কখনও মরে না। সে ভারি মজার জায়গা।

"তারপর কী হল?"

"একদিন একটা কালোমতো রাগি পরি এসে বলল, 'এসব কী হচ্ছে? পৃথিবীর একটা ছেলেকে তোমরা কেন রেখেছ! যাও, ওকে রেখে এসো।' ব্যস, সেইদিন পরিরা আমার চোখে পলক বুলিয়ে ঘুম পাড়াল। ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখি, একটা গাছতলায় শুয়ে আছি। সেখান থেকেই তো রামলাল-জ্যাঠামশাই আমাকে নিয়ে এলেন এ-বাড়িতে। কিন্তু আমার মনে হয়, পরিরা এখনও আমাকে ভালবাসে। মাঝে-মাঝে আমি হঠাৎ শুনতে পাই, কারা যেন চুপিচুপি আড়াল থেকে আমাকে ডাকে, 'ভুতো! এই ভুতো! তোমার কি খিদে পেয়েছে? তোমার কি অসুখ করেছে? আমিও তখন তাদের কথার জবাব দিই। মাঝে মাঝে ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমার বালিশের পাশে একটা খেলনা পড়ে আছে হয়তো। কখনও হয়তো একবাক্স সন্দেশ। অসুখ করলে কে যেন আমাকে এসে হাওয়া করে, মাথায় জলপট্টি দেয়।"

ভুতোর পরির গল্প সবাই জানে। কিন্তু সবাই বিশ্বাস করে না।

ভুতোকে মোটেই পছন্দ করে না ছোট দাদু। ছোট দাদু হলেন ভুবন রায়ের সেজো ভাই ত্রিভুবন রায়। তিনি বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, অনেক মরা মানুষ বাঁচিয়েছেন বলে শোনা যায়।

সেবার ফটিকবাবুর মায়ের সন্ন্যাস-রোগ হল। ত্রিভুবনবাবু গিয়ে নাড়ী ধরে বললেন, "রাত কাটবে না। চারটে বেজে তেরো মিনিট উনিশ সেকেন্ডে মারা যাবেন।"

ভুতো কাছেই ছিল। ফশ করে বলে বসল, 'বললেই হল? অ্যাকেসিস ওয়ান এম দাও না। বুড়ি একশো বছর বাঁচবে।"

ত্রিভুবন ভুতোকে ছাতাপেটা করতে উঠেছিলেন।

কিন্তু ফটিকবাবু ভুতোর পরির গল্প বিশ্বাস করতেন। তিনি অ্যাকেসিস ওয়ান এম এনে খাওয়ালেন। আর ফটিকবাবুর মা সকালবেলায় গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে চান-টান করে ঠাকুরপুজোয় বসে গেলেন। কে বলবে যে, তাঁর শক্ত অসুখ হয়েছিল।

এই ঘটনায় ত্রিভুবনবাবুর কিছু অখ্যাতি হল।

এরপর নরেনবাবুর বাবার হল কলেরা। ত্রিভুবন ডাক পেয়ে দেখতে গেছেন, সঙ্গে ওষুধের বাক্স নিয়ে ভুতো। ত্রিভুবন যে ওষুধটা দিতে গেলেন সেটা দেখে ভুতো চোখ কপালে তুলে বলল, "ও কী দিচ্ছ? ও খেলেই রুগির চোখ উলটে যাবে।"

ভুতোকে পেল্লায় একটা ধমক দিয়ে ত্রিভুবন সেই ওষুধই দিলেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে নরেনবাবুর বাবা চোখ উলটে গোঁ-গোঁ করতে লাগলেন। যায়-যায় অবস্থা।

ভুতো তাড়াতাড়ি বাক্স থেকে আর একটা শিশি বের করে দু'ফোঁটা খাইয়ে দিল। আর রুগি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল। পরদিন থেকে একেবারে চাঙ্গা।

সেই থেকে ভুতোর ওপর ত্রিভুবন হাড়ে-হাড়ে চটা।

শুধু ত্রিভুবনই নন, ভুতোর ওপর চটা আরও অনেকেই, কিন্তু সে-কথা পরে হবে।

এ-বাড়ির ছেলেপুলেরা ভুতোকে পেয়ে দারুণ খুশি। ভুতো চমৎকার ঘুড়ি-লাটাই বানাতে পারে, পাখির খাঁচা বানাতে পারে, গাছের মগডালে উঠে ফলপাকুড় পাড়তে পারে। চমৎকার গল্প বলতে পারে, বাঁশি বাজাতে পারে, আরও অনেক কিছু পারে। কিন্তু তার যেটা সবচেয়ে বড় গুণ তা হল, পরিদের সঙ্গে তার যোগাযোগ।

মাঝে-মাঝে যখন তার মাথায় পরি ভর করে, তখন সে অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা বলে। তার চাউনিটা অন্যরকম হয়ে যায়। চেহারাটাও যেন পালটে যায় তখন।

রায়বাড়ির একতলায় কোণের দিকে পড়ার ঘর। সন্ধেবেলা সেখানে ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে পড়তে বসে। অনাদি-মাস্টার পড়াতে আসেন। দুর্দান্ত রাগি আর রাশভারী অনাদিবাবুকে শুধু ছাত্ররাই নয়, ছাত্রদের বাবারাও ভয় পান।

আজ অনাদিবাবু কোথায় শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন খেতে গেছেন। সুতরাং আজ ছুটি। পড়ার ঘরে বসে মন্টু, গদাই, লালু, হৈমন্তী, কাজু, টিকলি, নিমাই, সব কিছুক্ষণ গলা ছেড়ে পড়ার পরই ভুতোকে চেপে ধরল, "ভুতোদা, একটা গল্প বলো।"

ভুতো বই-খাতা সরিয়ে রেখে একগাল হেসে বলল, "গল্প শুনবে? কিন্তু দাঁড়াও, আমার মাথার মধ্যে কেমন একটা রিমঝিম হচ্ছে।"

সবাই চেঁচিয়ে উঠল, "পরি! পরি!"

ভুতো হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে ইঙ্গিত করল, তারপর চোখ বুজে বসে রইল।

হঠাৎ দেখা গেল ভুতোর মুখটা কেমন যেন স্বপ্ন-স্বপ্ন হয়ে যেতে লাগল। এমনিতে ভুতো দেখতে কালো আর রোগা! মুখখানা শুকনো আর লম্বামতো। কিন্তু এখন তার মুখ দিয়ে যেন একটা আলোর আভা বেরোতে লাগল।

সে বিড়বিড় করে বলল, "দাদামশাই ভূতের যন্তরটা তৈরি করে ভাল কাজ করেননি। অনেক ভোগাবে।"

লালু বলে উঠল, 'ভূতের যন্ত্র? আরে, সেটা তো আমি নিজে চোখ রেখে দেখেছি, কিছু দেখা যায় না।"

ভুতো মাথা নেড়ে বলল, "এখনও দেখা যায় না বটে, কিন্তু একদিন দেখা যাবে, তখন বিপদ হবে। আর দুলাল সেনকে নিয়েও বিপদ হবে।"

লালু ফের বলল, "কিন্তু দুলাল সেন-স্যার তো ভাল লোক।"

ভুতো মাথা নেড়ে বলল, "ভাল বলেই তো বিপদ।"

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

গদাই বলল, "কিন্তু দুলাল সেন-স্যার তো সেই কামারপাড়ায় থাকেন। তাঁকে নিয়ে আমাদের বিপদ কিসের?"

ভুতো ফের মাথা নেড়ে বলল, "মোটেই কামারপাড়ায় থাকেন না। তিনি দাদামশাইয়ের ল্যাবরেটরিতে থানা গেড়েছেন।"

ল্যাবরেটরিটা বাচ্চাদের কাছে একটা দারুণ কৌতূহলের জায়গা। যেখানে নানারকম মজার কাণ্ডকারখানা হয় বলে তারা শুনেছে। কিন্তু তালা দেওয়া থাকে বলে তারা ঢুকতে পারে না। ভুবন রায়ের কঠিন নিষেধাজ্ঞা আছে, বাচ্চারা যেন খবর্দার কেউ ওখানে না ঢোকে। সেখানে দুলাল সেন আছে শুনে বাচ্চারা ফের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

হঠাৎ লালু লাফিয়ে উঠে বলল, "চল তো দেখে আসি। দুলাল-স্যার ভীষণ ভালমানুষ। আমরা বললেই ঢুকতে দেবেন।"

এ-কথায় সবাই হই-হই করে উঠে পড়ল।

ধ্যান ভেঙে গেলে ভুতোও বাচ্চাদের মতোই হয়ে যায়। তখন আর সে অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা ভাবেও না, বলেও না। বাচ্চাদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে ভুতো চোখ চাইল। তার ধ্যানটা কেটে গেছে।

"ভুতোদা, তুমিও চলো।"

"চলো।"

টিকলি সাবধান করে দিয়ে বলল, "কিন্তু পা টিপেটিপে, দাদু টের পেলে

আস্ত রাখবে না।”

সামনে ভুতো, পিছনে সারবন্দী ছেলেমেয়েরা খুব সাবধানে চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকার বাগানে নেমে পড়ল। সামনে ঝোপঝাড়, ঘাসজমি, খানাখন্দ। ল্যাবরেটরিটা বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা তফাতে।

ল্যাবরেটরির কাছে এসে ভুতো বলল, “দাঁড়াও, আগে জানলা দিয়ে ভিতরে কী হচ্ছে দেখে নিই।”

বাচ্চারা ছড়িয়ে পড়ে এক-একটা জানলা দিয়ে ভিতরটা দেখার চেষ্টা করল।

কাজু টিকলিকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, “ওই দ্যাখ, দুলাল-স্যার বেলুন ফোলাচ্ছেন।”

“বেলুন?” বলে টিকলি বড়-বড় চোখে চেয়ে দেখল।

বাস্তবিকই দেখা গেল, দুলাল সেন নিবিষ্ট মনে একটা সিলিন্ডারের মুখে একটার-পর-একটা বেলুন লাগিয়ে ফুলিয়ে তুলছেন। তারপর সেগুলোর মুখে সুতো বেঁধে ছেড়ে দিচ্ছেন। বেলুনগুলো গিয়ে সিলিং-এ ঠেকে জমা হচ্ছে।

এই ল্যাবরেটরিতে কেন তাঁকে আনা হয়েছে এবং এখানে তাঁকে কী কাজ করতে হবে তা দুলাল সেন খুব ভাল বুঝতে পারেননি। ভুবন রায় তাঁকে অনেকক্ষণ ধরে বিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়েছেন। কিন্তু শোনালে কী হবে, কানের গুণে দুলাল সেন তাঁর বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারেননি।

ভুবন রায় বললেন, “নিত্য-নতুন আবিষ্কার করতে হবে।”

দুলাল সেন শুনলেন, “নিত্যানন্দকে ঘর পরিষ্কার করতে হবে।”

ভুবন রায় বললেন, “বিজ্ঞান নিয়েই পড়ে থাকুন, বিজ্ঞানের বান ডাকিয়ে দিন।”

দুলাল সেন শুনলেন, “শিকনি ঝেড়ে মরে থাকুন, শিকদারকে চাঁদে পাঠিয়ে দিন।”

কথাগুলোর অর্থ হয় না। তবে দুলাল সেন এটা টের পান যে, কানে তিনি কিছু খাটো। তাই যা শোনেন তাই তিনি বিশ্বাস করেন না। ভেবে ভেবে অর্থ বার করার চেষ্টা করেন। এই যেমন ‘ঘর পরিষ্কার করতে হবে’ কথাটা, এটাকে নিয়ে অনেক ভেবে বুঝলেন, এখানে নিশ্চয়ই ল্যাবরেটরি ঝাঁটপাট দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে না। বিশেষ করে নিত্যানন্দ নামে কাউকে তিনি চেনেনও না। ‘শিকনি ঝেড়ে মরে থাকুন, শিকদারকে চাঁদে পাঠিয়ে দিন’— এ-কথাটারও তেমন কোনও অর্থ দাঁড়াচ্ছে না। কিন্তু ভাবতে ভাবতে একটা অর্থ তিনি ঠিকই বের করে ফেলবেন।

তবে ভুবন রায়ের লোকজন গিয়ে যখন তাঁকে তাঁর বাসা থেকে একরকম

তুলে আনল, তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তবে তিনি এতে খুশিই হয়েছিলেন। বাড়িওয়ালা কিছুদিন যাবৎ তাঁর ওপর খুব হামলা করছিল।

কিন্তু যেখানে এনে তাঁকে ফেলা হল, সে জায়গাটা দেখে তিনি খুব অবাক। এ যে এক ল্যাবরেটরি! বিশাল ঘর। নানা যন্ত্রপাতি। তারই এক কোণে একটা চৌকি পাতা। একধারে উনুন আছে। দিব্যি থাকার জায়গা। দুলালবাবু খুশিই হলেন ব্যবস্থা দেখে। রাঁধেন বাড়েন খান ঘুমোন। কোনও চিন্তা নেই। তবে মাঝে-মাঝে তাঁর মনে হয়, নিত্যানন্দকে দিয়ে কি ঘর পরিষ্কার করানো দরকার? শিকনি ঝেড়ে মরে থাকা কি তাঁর পক্ষে সম্ভব? আর শিকদারকে চাঁদে পাঠানোর বন্দোবস্তও তো কিছু করা যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

সেদিন সকালে ভুবন রায় ল্যাবরেটরিতে এসে অনেকক্ষণ ধরে একটা কিছু আবিষ্কার করার চেষ্টা করলেন। দুলাল সেন মিটমিট করে চেয়ে দেখলেন। তারপর ভুবন রায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, বেগুনের মধ্যে হরমোন ইনজেকশন করলে কী হয়?"

দুলালবাবু শুনলেন, "বেলুনের মধ্যে গণ্ডগোল পাকিয়ে দিলে ঘি হয়?"

কথাটা দুলাল সেন স্বীকার করে নেবেন কি না তা মাথা চুলকে অনেকক্ষণ ভাবলেন। ভুবন রায় তাঁর আশ্রয়দাতা, কাজেই উনি কিছু জিজ্ঞেস করলে আন্দাজে একটা জবাব দিতেই হয়।

দুলাল সেন মিনমিন করে বললেন, "হতেও পারে।"

কিন্তু তারপর থেকে আকাশ-পাতাল ভেবেও তিনি বুঝতে পারছেন না বেলুন থেকে কী করে ঘি হবে, আর বেলুনের মধ্যে গণ্ডগোলই বা পাকানো যায় কী ভাবে?

দুলালবাবু তবু বাজার থেকে একগাদা বেলুন কিনে আনলেন এবং তাদের মধ্যে নানারকম গণ্ডগোল পাকানোর কথা ভেবে দেখলেন। অবশেষে তাঁর মনে পড়ল, ছেলেবেলায় তাঁর খুব গ্যাস-বেলুন ওড়ানোর শখ ছিল। কিন্তু বড্ড গরিব ছিলেন বলে তাঁর বাবা গ্যাস-বেলুন কিনে দিতে পারেননি। এতকাল পরে এতগুলো বেলুন একসঙ্গে পেয়ে তাঁর খুব ইচ্ছে হল, গ্যাস-বেলুন ওড়াতে।

গ্যাসের অভাব নেই। মস্ত একটা সিলিন্ডার মজুত রয়েছে।

দুলালবাবু রাত্রিবেলা মহানন্দে বেলুনে গ্যাস ভরে-ভরে মুখ বেঁধে ছেড়ে দিচ্ছিলেন আর সেগুলো গিয়ে সিলিঙে ঠেকে জমা হচ্ছিল।

"বাঃ, বাঃ, চমৎকার। বেলুনের মধ্যে দিব্যি গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠছে। এবার ঘি নিয়েই যা একটু মুশকিল....!"

হঠাৎ দুলালবাবুর চোখে পড়ল, কাচের শার্সির বাইরে সারি সারি মুখ। সবাই

তাঁর দিকেই চেয়ে আছে।

আচমকা এই দৃশ্য দেখে ভিতু মানুষ দুলাল সেন ভয় খেয়ে "বাপ রে" বলে এমন একটা লাফ মারলেন যে, তিনিও প্রায় গ্যাস-বেলুনের মতোই সিলিঙে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছিলেন। অল্পের জন্য মাথাটা বেঁচে গেল।

এই দৃশ্য দেখে বাইরে সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। শুধু মণ্টুই ভীষণ বেজার হয়ে পড়ল। কারণ স্কুলে সে হল হাই-জাম্পের চ্যাম্পিয়ান। এই তো মোটে দু'দিন আগে স্কুলের অ্যানুয়াল স্পোর্টসে সাড়ে পাঁচ ফুটের ওপর লাফিয়ে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে। কিন্তু দুলালবাবুর মতো বৃদ্ধ মানুষকে দাঁড়ানো অবস্থায় যতটা লাফিয়ে উঠতে দেখল, তাতে তার চোখ ট্যারা। তার হিসেবমতো দুলাল-স্যার কম করেও পৌনে ছ'ফুট লাফিয়েছেন। দুলাল-স্যার যদি চেষ্টা করেন তা হলে তো অনায়াসে সাড়ে ছয় থেকে সাত ফুট লাফাতে পারবেন।

লালু মণ্টুকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলল, "মণ্টু দুলাল-স্যারের কাছে তোর এখনও অনেক কিছু শেখার আছে।"

মণ্টু গম্ভীর হয়ে বলল, "হুঁ।"

দুলালবাবুও একটা লাফ দিয়েই বুঝতে পারলেন যে, তিনি বেশ ভালই লাফাতে পারেন। তাঁর হাঁটু ঝনঝন করল না, কোমর কনকন করল না, মাথা বনবন করল না। নিজের এই লাফ দেখে তিনি নিজেই বেশ খুশি হলেন। এবং আর একবার লাফাবেন কি না ভাবতে লাগলেন। আসলে লাফ দিতে গিয়ে তিনি কেন লাফিয়েছেন সেটাই বেবাক ভুলে গেছেন। তিনি যে ভয় পেয়েছেন সেটাও তাঁর মনে পড়ল না। তিনি মালকোঁচা মেরে দুটো বৈঠকি দিয়ে ফের লাফানোর তোড়জোড় করতে লাগলেন।

মণ্টু মুখ চুন করে বলল, "এবার যদি স্যার লাফান তা হলে খুব খারাপ হবে।"

লালু পালটা প্রশ্ন করল, "কী খারাপ হবে?"

মণ্টু বলল, "বুড়ো বয়তে এত লাফঝাঁপ কি ভাল? কোমরে চোট লাগতে পারে। আমাদের উচিত স্যারের লাফ বন্ধ করা।"

লালু মাথা নেড়ে বলল, "মোটেই সেটা উচিত হবে না। দুলাল-স্যারের যা এলেম দেখছি, তাতে ওঁকেই এখন এ-জেলার চ্যাম্পিয়ান বলতে হয়। তুই তো ওঁর কাছে নস্যি।"

ল্যাবরেটরির ভিতরে দুলাল-স্যার শেষ অবধি দ্বিতীয় লাফটা দিতে পারলেন না। সিলিন্ডারের মুখে একটা বেলুন পরানো ছিল। সেটা বেড়ে বেড়ে বিশাল আকৃতি ধারণ করে অবশেষে দুম করে ফাটল। আর ছেঁড়া রবার ছিটকে এসে লাগল দুলাল-স্যারের নাকে।

ঘটনাটা কী ঘটেছে তা দুলাল-স্যার বুঝতে পারলেন না। কিন্তু নাকে ভুতুড়ে ঘুসির মতো একটা ঘা খেয়েই তিনি ফের "বাবা গো" বলে চিৎকার করে মাটিতে বসে পড়লেন।

এই দৃশ্য দেখে ভুতো আর থাকতে পারল না। জানলার পাল্লা একটানে খুলে সে ভিতরে ঢুকল। তারপর দুলাল-স্যারকে তুলে একটা চেয়ারে বসিয়ে একটু তুলো ভিজিয়ে নাকে ধরল।

দুলাল-স্যার মিটমিট করে চেয়ে দেখলেন, একগাদা বাচ্চা তাঁকে ঘিরে ফেলেছে। মুখগুলো এবার তাঁর খুবই চেনা-চেনা ঠেকল।

মণ্টু খুবই গম্ভীর হয়ে বলল, "স্যার, আপনার কিন্তু লাফালাফি করা উচিত নয়।"

দুলাল-স্যার শুনলেন, 'হারাকিরি করা উচিত হয়।'

তিনি সবেগে মাথা নেড়ে বললেন, "খুব খারাপ। হারাকিরি করা খুব খারাপ।"

এতগুলো বাচ্চাকে পেয়ে দুলাল-স্যার খুবই খুশি হয়ে উঠে পড়লেন।

সবাই চেঁচাতে লাগল, "স্যার আমরা বেলুন নেব।"

"বেগুন খাবে? তা এই অসময়ে বেগুন কোথায় পাব? তার চেয়ে বরং একটা করে বেলুন নাও সবাই।"

বেলুন পেয়ে বাচ্চারা দারুণ খুশি হয়ে চেঁচামেচি করতে লাগল, 'এই, আমারটা সবচেয়ে বড়।' 'ইঃ, আমারটা বলে কত সুন্দর।' 'উঃ, তোরটা তো কেলেমার্কা,

আমারটা কেমন লাল টুকটুকে।' 'তোরটা তো লাউয়ের মতো, আমারটা কী সুন্দর একটা বলের মতো!'

বাচ্চাদের মধ্যে যারা একটু বড় তারা বেলুন নিয়ে মাতামাতি না করে ল্যাবরেটরির বিভিন্ন জিনিস ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। কেউ বকযন্ত্র নাড়াচাড়া করতে লাগল, কেউ বা বুনসেন বার্নার জ্বালানোর চেষ্টা করতে লাগল, কেউ বিভিন্ন শিশি থেকে নানারকম কেমিক্যাল একটা টেস্ট-টিউবে ঢেলে মেশাতে লাগল।

গদাই আর নিমাই বিজ্ঞানের ভাল ছাত্র। তারা নানারকম-এক্সপেরিমেন্ট করতে লেগে গেল।

মণ্টু তার টেস্ট-টিউবে রাজ্যের কেমিক্যাল ঢেলে বুনসেন বার্নারে চাপিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "এইবার আমি এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করব না যে, পৃথিবীতে হই-চই পড়ে যাবে।"

জিনিসটা বুনসেন বার্নারে চাপানোর পরই একটা কটু গন্ধ ছাড়তে শুরু করল। বাচ্চার সবাই নাকে চাপা দিয়ে "ইঃ, এঃ" করতে লাগল।

কিছুক্ষণ বাদে একটা নীলাভ ধোঁয়া গলগল করে বেরোতে লাগল টেস্ট-টিউব থেকে। সারা ঘর নীল ধোঁয়ায় ভরে যেতে লাগল।

ভুতো চেঁচিয়ে বলল, "পালাও! পালাও!"

বাচ্চারা দুদ্দাড় করে দৌড়ে পালাতে লাগল।

হঠাৎ দুম শব্দ করে টেস্ট টিউবটা ফেটে চারদিকে একটা নীল আলো চমকে উঠল।

দুলাল-স্যার অনেকদিন হল পৃথিবীর কোনও শব্দই ভাল শুনতে পান না। কিন্তু টেস্ট টিউব ফাটবার আওয়াজটা তিনি আজ পরিষ্কার শুনতে পেলেন। শব্দটা এত তীক্ষ্ণ যে, তাঁর কান তো খুলে গেলই, ফের শব্দের চোটে তালাও লেগে গেল।

চারদিকে নীল ধোঁয়া আর কটু গন্ধটা টের পেয়ে দুলাল-স্যার সচকিত হলেন। তাঁর আর একবার লাফ দেওয়ার ইচ্ছে হল। এবারও অবশ্য ভয়ে। কিন্তু দিতে পারলেন না।

কেমন যেন অবসন্ন ঘুম-ঘুম একটা ভাব ভর করল শরীরে। তিনি ধীরে ধীরে মেঝের ওপর বসে পড়লেন। তারপর হাই তুলতে লাগলেন। তারপর ধীরে-ধীরে শুয়ে পড়লেন মেঝের ওপর।

বাচ্চারা সবাই ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে দৌড়ে পালাল।

শুধু ভুতো, মণ্টু আর গদাই একটু দুরে দাঁড়িয়ে কাণ্ডটা দেখতে লাগল।

মণ্টু বলল, "কী হবে ভুতোদা?"

ভুতো মাথা নেড়ে বলল, "কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি কিসের সঙ্গে কী

মিশিয়েছিলে মনে আছে?"

"না তো! শিশির গায়ে লেখাগুলোও পড়িনি। আন্দাজে উলটোপালটা মিশিয়ে দিয়েছি।"

গদাই বলল, "দুলাল-স্যার যদি মরে যান, তা হলে কী হবে?"

মণ্টু ভয়ে-ভয়ে বলল, "যাঃ, মরবেন কেন?"

গদাই গম্ভীর হয়ে বলল, "দেখছিস না, এখনও কেমন গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে!"

মণ্টু খুব ভয় পেয়ে গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর ফিসফিস করে বলল, "আমাদের উচিত এখন পালিয়ে যাওয়া।"

গাদাই মাথা নেড়ে বলল, "পালিয়ে লাভ নেই। দাদু ঠিক ধরে ফেলবে। এই কুকীর্তি কার যখন জানতে চাইবে, তখন তোর নাম বলা ছাড়া উপায় নেই।"

মণ্টু কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "দাদু মেরে ফেলবে তা হলে।"

গদাই গম্ভীর হয়ে বলল, "তা হলে তোর টপ মার্বেলটা দিবি? আর তিনফলা ছুরিটা। আর লাটাইটা। আর....।"

মণ্টু ঘাড় নেড়ে বলল, "দেব।"

রামলালের ভারি রাগ হচ্ছিল। একে তো বাবা ভুবন রায়ের কাছে বকুনি খেয়েছেন, তার ওপর ল্যাবরেটরিতে ভূত দেখে দৌড়, পা মচকানো এবং অবশেষে জানতে পারা যে, ভূত নয়, লোকটা নিতান্তই দুলাল সেন। নিজের বাবার ওপর রাগ করার সাহস তাঁর নেই। কিন্তু রাগটা ভিতরে বেশ পাকিয়ে উঠছে। কারও ওপর যদি এখনই ঝাল না ঝাড়া যায় তাহলে এই রাগটাই রাত্তিরে পেটে অম্বলে পরিণত হয়ে কষ্ট দেবে। রামলালের ওই এক রোগ, রাগ হলেই অম্বল হয়ে পেটে ভীষণ ব্যথা হয়। অবশ্য রাগটা প্রকাশ করতে পারলে আর কোনও ভাবনা নেই।

ঠাকুমা চুন-হলুদ দিয়ে যখন তাঁর পায়ে পট্টি বেঁধে দিচ্ছিলেন, তখন রামলাল কটমট করে তাঁর ভাই নন্দলালের দিকে তাকালেন। নন্দলাল সাধু মানুষ, একাবোকা থাকেন, সাত চড়ে রা কাড়েন না। সুতরাং রাগ দেখানোর উপযুক্ত লোক।

রামলাল তাই হঠাৎ ধমক দিয়ে বললেন, "অ্যাই নন্দ, খুব তো সায়েন্স পড়েছিলি। বল তো এইচ-টু-এস-ও-ফোর কিসের ফর্মুলা?"

নন্দবাবুর অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়। ভুতুড়ে ক্লাবে হেলমেট ফেলে এসেছেন, পায়ে নতুন জুতোর ফোস্কা, খিদে পেয়েছে। তিনি দাদার দিকে চেয়ে উদাস গলায় বললেন, "সায়েন্স! আমি এখন সায়েন্সের অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছি। সায়েন্স-ফায়েন্স কিচ্ছু নয়! ওসব এলেবেলে জিনিস, বুজরুকি।"

রামলাল প্রকাণ্ড একটা ধমক দিয়ে উঠলেন, "যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! সায়েন্স কিছু নয়। যত কিছু তোমার ওই সব ভণ্ডামিতে! আস্পদ্দাটা তো বেশ

বেড়ে গেছে দেখছি।”

নন্দবাবু একটু থতমত খেয়ে গেলেন। এ-বাড়ির নিয়ম হল, জ্যেষ্ঠকে সবসময়ে সম্মান দিতে হবে, তা তিনি কোনও অন্যায় কাজ করলেও। দুর্বিনীত ব্যবহার করা চলবে না। নন্দবাবু তাঁর দাদার সঙ্গে ছেলেবেলায় বিস্তর ঝগড়া কাজিয়া, মারপিট করেছেন বটে কিন্তু বড় হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা কননি। তার ওপর তিনি এখন হাফ-সন্ন্যাসী। শরীরে রাগ বলে বস্তুটিই নেই।

নন্দবাবু নিমীলিত নয়নে সামনের দেওয়ালটার দিকে চেয়ে বললেন, “সায়েন্স-টায়েন্স আর আমার লাইন নয় দাদা। আমি তার চেয়ে ঢের মূল্যবান সম্পদ পেয়েছি।”

রামলাল তুবড়ির মতো জ্বলে উঠে বললেন, “কী! সায়েন্সের এত বড় অপমান! সায়েন্সের চেয়ে বড় সম্পদ পেয়েছিস! গবেট, গোমুখ্যু কোথাকার। পয়সা খরচ করে ওকে লেখাপড়া শেখানো হলো, তা সব ভস্মে ঘি ঢালা!”

“কিন্তু দাদা।”

“চোপ রও বেয়াদব! ফের মুখে মুখে কথা কওয়া হচ্ছে! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! সারাদিন তুই নীচের ঘরে বসে করিস কী? মারণ-উচাটন আর ভূত নামানো? নাকি জ্যোতিষী? বিজ্ঞানের চর্চা করে দুনিয়ার মানুষ যখন তাজ্জব-তাজ্জব জিনিস আবিষ্কার করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে তখন তুই ঘরের কোণে বসে ওসব আনসায়েন্টিফিক মারণ-উচাটন করছিস! তোর লজ্জা হয় না!”

বলতে বলতে রামলাল স্পষ্টই টের পাচ্ছিলেন, তাঁর পেটের অম্বল ভাবটা কেটে যাচ্ছে। বেশ চনমনে লাগছে তাঁর। আর দু-চার মিনিট চালাতে পারলেই কেল্লা ফতে।

নন্দবাবু কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, রামলাল গর্জন করে উঠলেন, “ফের মুখে-মুখে কথা বলা হচ্ছে! উনি ভৌত ক্লাবে ভর্তি হয়েছেন! এঃ, একেবারে গোল্লায় যাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার করা হচ্ছে। তার ওপর আবার জ্যোতিষী! আহাম্মক কোথাকার!”

নন্দবাবু আর রা কাড়লেন না, মাথাটি নিচু করে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। ওদিকে রামবাবুর রাগটা জল হয়ে গেছে ‘পেটটা হাল্কা লাগছে’ অম্বল হওয়ার ভয় আর নেই।

নন্দবাবু নিজের ঘরে চিতপাত হয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ উদাস নয়নে চেয়ে রইলেন। একটু আগে দোতলা থেকে নামবার সময় রান্নাঘর থেকে নানা সুখাদ্য রান্নার গন্ধ আসছিল। এ-বাড়ির পাচক ঠাকুরটি নতুন। লোকটা হরেকরকম রান্না জানে বলে শুনেছেন নন্দবাবু। কখনও খাননি। নিজের রান্না নন্দবাবু নিজেই রেঁধে নেন। ঘরের কোণে স্টোভ আছে। কিন্তু আজ একাদশী বলে নন্দবাবুর রান্নার ঝামেলাও নেই। এবেলা সাগু ভেজানো খাবেন। মুশকিল হল, ভাল রান্নার গন্ধ পাওয়ার পর থেকেই তাঁর আর সাগু গেলার ইচ্ছে হচ্ছে না। বাড়ির পুরনো

চাকর রাখাল এসে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল। পুরনো লোক বলে তার ভারি দাপট। কাউকে তেমন গ্রাহ্যিটাহ্যি করে না।

নন্দবাবুর দিক চেয়ে রাখাল বলল, "কী গো সন্নিসিঠাকুর, বলি আজও কি পেটে গামছা বেঁধে পড়ে থাকবে? আজ যে চমৎকার খাসির মাংস দিয়ে বিরিয়ানি রান্না হয়েছে। সঙ্গে ফুলকপির রোস্ট, আলুর চপ, চিংড়ির মালাইকারি আর কমলালেবুর পায়েস।"

নন্দবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেল, "তোমরা খাওগে। আমার খাওয়া ঘুচে গেছে।"

"মা-ঠাকরোন তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, বলেছেন নন্দটাকে ধরে-বেঁধে নিয়ে আয়। উপোস থেকে থেকে ছেলেটা আমার আধখানা হয়ে গেল।"

নন্দবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "আজ আমার একাদশী রাখালদা। বিরক্ত কোরো না।"

"আরে একাদশী তো সারা বছরই আছে। উপোস করতে চাইলে শুধু একাদশী কেন, অমাবস্যা, পূর্ণিমা অনেক পাবে। কিন্তু এমন খ্যাঁটখানা তো আর নিত্যি হবে না। আজ তিতলির জন্মদিন বলে কথা!"

নন্দবাবু শুকনো মুখে মাথা নাড়লেন, "ও হয় না, রাখালদা। লোভ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।"

রাখাল তার পাকা চুলে ভর্তি মাথাটা নেড়ে বলল, "নাঃ, তোমার মাথাটাই দেখছি গেছে। এই বয়েসেই যদি তুমি এত কিছু ত্যাগ করে বসে থাকো, তবে বুড়ো বয়সে ত্যাগ করার যে আর কিছুই থাকবে না। আমাদের দেশে এক হত্তুকিবাবা ছিল। সব ছাড়তে ছাড়তে শেষে হত্তুকিতে এসে ঠেকেছিল। দিনান্তে একখানা হত্তুকি চিবিয়ে জল খেত। সারা দিনমানে আর কিছু নয়। তারপর একদিন বিশ্বনাথ দর্শন করতে গিয়ে সেই হত্তুকিও ছেড়ে দিল। ধুঁকতে ধুঁকতে মরতে বসেছিল। তারপর এক ঘোড়েল লোক গিয়ে তার কানে কানে বলল, আরে, সব ছেড়েছ, কিন্তু কেক-বিস্কুট-পাউরুটি তো আর ছাড়োনি। ওগুলো খেয়ে প্রাণটা বাঁচাও। তা হত্তুকিবাবার তখন এতই খিদে যে, কথাটা লুফে নিল। কেক-বিস্কুট

খেয়ে প্রাণটা বাঁচল হর্তুকিবাবার। আমি তাই বলি, ওরকম দুর্দশা হওয়ার আগেই নিজেকে সামলাও।''

নন্দবাবু পাশ ফিরে শুয়ে বললেন, ''তুমি এখন যাও রাখালদা। আমার সাগু ভেজানো আছে।''

রাখাল কটমট করে নন্দবাবুর দিকে চেয়ে থেকে বলল, ''ভাল জিনিসকে অবহেলা করলে কী হয় জানো? মা লক্ষ্মীর শাপ লাগে আত্মাকে কষ্ট দিতে নেই।''

নন্দবাবু একটু হেসে বললেন, ''তুমি আত্মার তত্ত্বই জানো না। আত্মার কখনও খিদে পায় না আত্মার খাওয়া নেই, ঘুম নেই, তেষ্টা নেই।''

''বটে! তবে আত্মাটা আছে কী করে?''

''সেটাই তো রহস্য।''

''তবে থাকো তোমার রহস্য নিয়ে শুঁটকি মেরে।''

রাখাল রাগ করে চলে গেল।

রাখাল চলে যাওয়ার পর একা ঘরে নন্দবাবু চোখ বুজে প্রাণপণে মন থেকে বিরিয়ানি, চপ, রোস্ট ইত্যাদির চিন্তা তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

এমন সময় দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হল। নন্দবাবু চমকে উঠে চারদিকে চাইলেন। ঘরে কেউ নেই।

নন্দবাবু আবার চোখ বুজলেন।

কে যেন বলে উঠল, ''কাজটা খারাপ হল হে নন্দবাবু।''

নন্দবাবু ফের চমকে উঠে চারদিকে চাইলেন। কেউ নেই।

হঠাৎ নন্দবাবু বুঝতে পারলেন, কথা বলছে আর কেউ নয়। তাঁর মন।

মন বলে উঠল, ''কাজটা খুব বিবেচকের মতো করলে না হে নন্দলাল। আর একটু ভেবেচিন্তে দেখলে পারতে।''

নন্দবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, ''বলিস কী রে মন? একাদশীতে বিরিয়ানি?''

''নন্দবাবু, তোমার সাধন-ভজন সবই ভস্মে ঘি ঢালা হল।''

''তার মানে কী রে মন?''

''বলছিলাম, যে-সাধক সাধন-ভজন করতে করতে ওপরে উঠে গেছে, তার কাছে আর কি খাদ্যাখাদ্য ভেদ থাকে? তার কাছে মুরগিও যা, গঙ্গাজলও তাই।''

''ওসব বলিসনি রে মন। তোর লোভ তোকে ওসব বলাচ্ছে।''

''আমি বলি কি নন্দবাবু, শাস্ত্রে একটা কথা আছে, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। কথাটার মানে জানো?''

''খুব জানি। ত্যাগ করে ভোগ করো।''

''তবেই বোঝো, কেমন দামি কথা। যা ত্যাগ করবে, তা ভোগ করতে আর বাধা কিসে? ছেড়েই যখন দিয়েছ তখন আর খেতে বাধা কিসের?''

''ওরে লোভী মন, তুই আর আমাকে কুপথে নিস না, ত্যাগের জলে নিজেকে

ধুয়ে নে। পরিচ্ছন্ন হ।"

"মেলা ফ্যাচফ্যাচ কোরো না তো নন্দবাবু, ভাল রান্নাও একটা শিল্পকর্ম, বুঝলে? তাকে অবহেলা করলে শিল্পকেই অপমান করা হয়।"

"অনেক তো খেয়েছিস রে মন, আর কেন? এবার ওপরে ওঠ। ওপরে ওঠ।"

"তা উঠতে রাজি আছি। তবে দোতলা অবধি। তুমিও গা তোলো হে নন্দবাবু। রান্নাঘরটা একেবারে ম-ম করছে গন্ধে। ওই সাগুর গোলা যদি আজও তোমাকে গিলতে হয় তবে বরং ওর সঙ্গে একটু বিষ মিশিয়ে নাও। বৈরাগ্যের একেবারে চরম হয়ে যাবে।"

নন্দবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "মন, তুই হচ্ছিস বিষাক্ত সাপের মতো। তোকে ঝাঁপিতে বন্ধ না করলে আর উপায় নেই।"

"বটে! আমাকে ঝাঁপিতে ভরবে? অত সোজা নয় হে নন্দবাবু। তোমার চেয়ে ঢের বড় বড় লায়েককে দেখেছি।"

নন্দবাবু এবার বেশ রেগে গিয়ে ধমক দিলেন, "চুপ কর বলছি। নইলে কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে।"

"খারাপ আর এর চেয়ে কী হবে হে নন্দবাবু? ওপরে সবাই বসে কোমরের কষি খুলে ভালমন্দ খাচ্ছে, আর তুমি একতলার ঘরে বসে সাগুদানা আর পাকা কলা গিলছ, এর চেয়ে খারাপ আর কী হবে হে?"

নন্দবাবু বুঝলেন, আর দেরি করা ঠিক হবে না। খিদে বেশ চাগাড় দিচ্ছে। নন্দবাবু উঠে পড়লেন এবং সাগু মেখে খেতে বসে গেলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সাগু তাঁর গলা দিয়ে নামল না। দু-এক গ্রাস খাওয়ার পরই বিস্বাদে মন ভরে গেল। নন্দবাবু ঢকঢক করে পেট ভরে জল খেয়ে নিলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন।

কিন্তু মধ্যরাতে নন্দবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন, কে যেন কাঁদছে।

"কে কাঁদে?" বলে নন্দবাবু উঠে বসলেন।

কে যেন জবাব দিল, "তোমার পেট হে।"

নন্দবাবু অবাক হয়ে বললেন, "পেট! পেট কেন কাঁদবে?"

"গরিব-দুঃখীরা কাঁদে কেন নন্দবাবু? গরিব বলেই তো কাঁদে। তোমার পেটটাকে যে তুমি গরিব করে রেখেছ, বেচারার যে কিছুই করার নেই। তাই কাঁদছে।"

নন্দবাবু নিজেও টের পেলেন, সত্যিই তাঁর দারুণ খিদে পেয়েছে, খিদেটা রাগী একটা হুলো বেড়ালের মতো তার পেটটাকে আঁচড়ে-কামড়ে ফালাফালা করে ফেলেছে।

মন একটু হেসে বলল, "ওঠো হে নন্দবাবু।"

"উঠে কী করব?"

"দোতলায় যাও নন্দবাবু। এখনও কিছু আছে বোধহয়।"

"ছিঃ মন, ও-কথা বলতে নেই।"

"তোমার খিদে কিন্তু রেগে উঠছে নন্দবাবু। কাজটা ভাল হচ্ছে না। রাত এখন নিশুতি, কেউ টেরটিও পাবে না।"

নন্দবাবু বিরস মুখ করে বললেন, "তোর পেটে বড় জিলিপির প্যাঁচ রে মন।"

"নন্দবাবু, উপোস করে ধর্ম হয় না। খারাপই যদি হবে তবে বিরিয়ানি জিনিসটার সৃষ্টি হল কেন বলো? ওঠো নন্দবাবু, না উঠলে আমি তোমার সঙ্গে এমন ঝগড়া লাগাব যে, সাধন-ভজন চুলোয় যাবে।"

"উঠছি রে মন, উঠছি।"

নন্দবাবু উঠলেন, তারপর সিঁড়ি বেয়ে অনিচ্ছের সঙ্গে ওপরে উঠতে লাগলেন।

ওদিকে নিশুত রাতে ল্যাবরেটরির মধ্যে দুলালবাবুও চোখ মেলে চাইলেন।

চেয়ে তাঁর মনে হল, কী যেন একটা নেই।

কী নেই? দুলালবাবু উঠে বসে চারদিকে চাইলেন। কিন্তু কিছু বুঝতে পারলেন না।

দুলালবাবুর হঠাৎ খেয়াল হল, তাই তো! আমি লোকটা কে? আমার নাম কী? আমি কোথায় ছিলাম? এখানেই বা এলাম কী করে?

এসব প্রশ্নের কোনও সদুত্তর পাওয়া গেল না।

দুলালবাবু উঠে চারদিকটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। চারদিকে মেলা অকাজের জিনিস। শিলিং-এ গুচ্ছের গ্যাস-বেলুন।

দুলালবাবুর হঠাৎ নজরে পড়ল, একটা বেঁটেমতো লোক অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে আছে একটা টেবিলের তলায়।

দুলালবাবু গিয়ে লোকটাকে হঠাৎ জাপটে ধরলেন।

"এই, আমি কে?"

লোকটা ভড়কে গিয়ে ককিয়ে উঠল, "আজ্ঞে?"

"আমি কে, বল শিগগির।"

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "আজ্ঞে, সেটা বলা খুব শক্ত। আপনি যে কে তা আপনি ছাড়া আর কে জানবে বলুন। তবে আমি হচ্ছি গে পাঁচু মোদক।"

দুলালবাবু লোকটাকে আরও একটু কষে চেপে ধরে বললেন, "পাঁচু মোদক! নামটা চেনা-চেনা ঠেকছে!"

লোকটা ককিয়ে উঠে বলল, "আজ্ঞে, অত জোরে ধরবেন না। আমার হাড়গোড় তেমন পোক্ত নয়। ভাঙলে আর এ-বয়সে জোড়া লাগবে না।"

"নামটা চেনা-চেনা ঠেকছে কেন বলো তো হে।"

এই বলে দুলালবাবু লোকটাকে ছেড়ে দিলেন। লোকটা অমনি ধুপ করে মেঝের ওপর বসে পড়ে কিছুক্ষণ 'উঃ, আঃ' করে নিয়ে বলল, "হাড়গোড় একেবারে নড়িয়ে দিয়েছেন মশাই। আপনার মতো গুণ্ডা প্রকৃতির লোক আমি জীবনে দেখিনি। লোহার ভীমও চূর্ণ হয়ে যায়।

দুলালবাবু আত্মবিস্মৃত হয়েছেন। পুরনো কথা তাঁর মনে নেই। তিনি যে নিতান্তই রোগা, দুর্বল এবং ভীরু প্রকৃতির মানুষ এটাও তিনি ভুলে বসে আছেন। লোকটার দিকে খনিকক্ষণ চেয়ে থেকে তিনি বললেন, "তোমার নামটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। চমৎকার নাম। পাঁচু মোদক। আজ থেকে নামটা আমি নিলুম। তুমি অন্য নাম নাও।"

পাঁচু মোদক নিজের গায়ে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, "তা নিতে পারেন, তবে পয়সা লাগবে।"

"তুমি কি নাম বিক্রি করো নাকি?"

"আগে কখনও করিনি, কেউ চায়ওনি। আজই প্রথম। বউনি বলে কথা। কম করেই দেবেন না হয়। পাঁচ টাকা।"

দামটা খুব বেশি বলে মনে হল না দুলালবাবুর। কিন্তু দরাদরি করার মজ্জাগত অভ্যাস যাবে কোথায়? তিনি একটু চিন্তিতভাবে বললেন, "পাঁচ টাকা! দরটা একটু বেশি হয়ে গেল না!"

পাঁচু মাথা নেড়ে বলল, "নামের তো একটা রেট আছে মশাই। পাঁচ অক্ষরের নাম, অক্ষরপ্রতি একটা করে টাকা এমন কি বেশি?"

দুলালবাবু কর গুনে দেখলেন, পাঁচু মোদক পাঁচ অক্ষরের নাম বটে। একেবারে জলের মতো সোজা হিসেব। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "তা বটে!"

পাঁচু সোৎসাহে বলল, "তার ওপর ভেবে দেখুন, আপনাকে বেচে দিচ্ছি বলে

বাপের দেওয়া নামটা আমি তো আর ব্যবহারও করতে পারব না। সেই জ্ঞান-বয়স থেকেই লোকে পাঁচু-পাঁচু বলে ডেকে আসছে। এখন থেকে তো আর পাঁচু নামে সাড়াও দেওয়া চলবে না। দুঃখের কথাটা একটু ভেবে দেখবেন তো।''

দুলালবাবুর চোখ ছলছল করতে লাগল। বললেন, ''নামটা দিতে যদি তোমার কষ্ট হয় তা হলে বরং থাক আমি বরং অন্য কোনও নাম...''

পাঁচু জিভ কেটে তাড়াতাড়ি দুলালবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, ''কী যে বলেন আজ্ঞে, শুনলেও পাপ হয়। আমার নামটা যে আপনি নিলেন সেটাও আমার কম ভাগ্যি নাকি। আর দিয়ে যখন ফেলেছি তখন আর ফেরত নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।''

দুলালবাবু নিশ্চিন্ত হলেন। আসলে তাঁর এখন একটা নাম ভীষণ দরকার। নাম ছাড়া কি মানুষের চলে? তিনি গিয়ে তাঁর টিনের তোরঙ্গটি খুলে পাঁচটা টাকা বের করে পাঁচুর হাতে দিয়ে বললেন, ''তা তুমি করোটরো কী?''

পাঁচু মাথা চুলকে বলল, ''আজ্ঞে কথাটা বলা কি উচিত হবে? কী করি তা শুনলে আপনি হয়তো খুশি হবেন না।''

''কেন বলো তো?''

পাঁচু বুঝে গেছে, লোকটা পাগল, বোকা আবার হাবা। তাই সে খুব নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, ''কাজটা অবশ্য খুবই ভাল। লোকে ভাল চোখে না দেখলেও এ-কাজে মোটা লাভ।''

''কী বলো তো?''

পাঁচু খুব লজ্জার সঙ্গে মাথা চুলকে বলল, ''আজ্ঞে, ওই চুরি আর কি।''

দুলালবাবু চুরি কথাটা খুব চেনেন। কিন্তু কী করলে চুরি করা হয়, তা তাঁর মনে পড়ল না। তাই তিনি পাঁচুর দিকে চেয়ে বললেন, ''আমারও কিছু একটা করা দরকার। কাজ ছাড়া কি মানুষ থাকতে পারে? তা চুরি ব্যাপারটা কী আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও তো! আমিও লেগে পড়ি।''

পাঁচু জুলজুলে চোখে কিছুক্ষণ দুলালবাবুর দিকে চেয়ে থেকে ভাল করে লোকটাকে জরিপ করে নিল। বলল, ''কাজটা কিছু শক্ত নয়। রেতের বেলা যে-কোনও বাড়িতে ফাঁক বুঝে ঢুকে পড়বেন। তারপর সাড়াশব্দ না করে মালপত্র যা পাবেন সরাতে থাকবেন।''

দুলালবাবু সাগ্রহে বললেন, ''তারপর?''

''তারপর আমার হাতে এনে দেবেন। আমি সে-সব মালপত্র বেচে পয়সা এনে দেব আপনাকে। আর টাকা-পয়সা যদি সরাতে পারেন, তা হলে তো কথাই নেই। যা আসে তা-ই লক্ষ্মী।''

দুলালবাবুরও ব্যাপারটা বেশ পছন্দ হয়ে গেল। তিনি খুশি হয়ে হাতে হাত ঘষতে-ঘষতে বললেন, "বাঃ। এ তো খুব সোজা কাজ।"

"কাজ যেমন সোজা, তেমনি আমার মজাও আছে। গেরস্তর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে-খেলতে সময়টাও বেশ কেটে যায়। হাত-পায়ের দিবি ব্যায়াম হয়, বুদ্ধি খোলে, চোখ-কান সব সজাগ হয়ে ওঠে, ভয়ডর সব কেটে যায়। চুরি করতে নামলে মানুষের মেলা উপকার হয় মশাই।"

দুলালবাবুর দেহ-মন চনচন করছিল, তিনি একেবারে টগবগ করতে লাগলেন উৎসাহে। বললেন, "তা হলে কখন কাজে নামব?"

"শুভস্য শীঘ্রম। এখন তো মোটে রাত দেড়টা কি দুটো। এখনই নেমে পড়লে হয়।"

দুলালবাবু ল্যাবরেটরিটার চারদিক চেয়ে দেখে নিয়ে বললেন, "এখান থেকে কিছু সরানো যায় না?"

পাঁচু ঠোঁট উলটে বলল, "এরকম সব বিটকেল জিনিস জন্মে দেখিনি বাবা। এসব অকাজের জিনিস কে-ই বা কিনবে? এ-জিনিস আমাদের লাইনের জিনিস নয় পাঁচুবাবু।"

পাঁচুবাবু সম্বোধন শুনে দুলালবাবু ভারি খুশি হয়ে বললেন, "তা হলে কী করা যায়?"

পাঁচু একটু খাটো গলায় বলল, "এ-বাড়িতে মেলা জিনিস। যদি কৌশল করে একবার ঢুকতে পারেন তো একেবারে পাথরে পাঁচ কিল।"

দুলালবাবু পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো পায়চারি করতে-করতে বললেন, "নিশ্চয়ই পারব। পারব না মানে? পারতেই হবে। কিন্তু আমার এখন ভীষণ খিদে পেয়েছে।"

একগাল হেসে পাঁচু বলল, "আজ্ঞে আমাদের তো খিদে পেয়েই আছে। যখন তখন পায়। তো তার জন্যে চিন্তা নেই। বাবুদের বাড়িতে আজ ভাল রান্নাবান্না হয়েছে। তার কিছু এখনও আছে বোধহয়। গিয়ে ঢুকে পড়ুন না আজ্ঞে।"

দুলালবাবু রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, "তুমিও সঙ্গে চলো। তা ইয়ে তোমাকে এখন থেকে কী নামে ডাকব বলো তো! নাম কিনতে গেলে তো মুশকিল। মাঝরাতে তো আর কেউ নাম বেচবার জন্য বসে নেই। তবে আমার ঠাকুর্দার নাম ছিল নরহরি। আপনি আমাকে বরং নরহরি বলেই ডাকবেন।"

দুলালবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "তাই হবে। তা হলে এখন কাজ শুরু করা যাক।"

"যে আজ্ঞে।"

দুলালবাবু ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগলেন।

পেছনে একটু তফাতে পাঁচু। আনন্দে দুলালবাবু শিস দিতে লাগলেন।

পাঁচু পিছন থেকে সতর্ক গলায় বলল, "আজ্ঞে শব্দ-টব্দ করবেন না। চুরিতে শব্দ করা বারণ কিনা।"

"ঠিক আছে নরহরি। মনে থাকবে।"

দু'জনে মিলে প্রকাণ্ড বাড়িটার চারদিক ঘুরে দেখে নেওয়ার পর দুলালবাবু বললেন, "এবার ঢুকি?"

"কীভাবে ঢুকবেন?"

"কেন, দরজা ভেঙে।"

পাঁচু জিভ কেটে বলল, "ওরকম হুটোপাটি করবেন না। এসব কাজে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। আর বুদ্ধিও খাটাতে হয়।"

পাঁচু তার ঝোলা থেকে একটা যন্ত্র বের করে একটা জানালায় খুটখাট করে কী একটু করল। তারপর পাল্লাটা অনায়াসে খুলে গোটা দুই শিক কেটে ফেলল। বলল, "যান এবার ঢুকে পড়ুন।"

"আর তুমি?"

"আজ্ঞে আমি ওই আমগাছটার তলায় বসে বরং একটু জিরোই। বড্ড ধকল গেছে মশাই। আপনাকে দেখতে রোগাপাতলা বটে, কিন্তু গায়ে মশাই পাগলা হাতির জোর। যা জাপটে ধরেছিলেন, গা-গতরে ব্যথা হয়ে আছে।"

"বটে?"

পাঁচু মাথা নেড়ে বলল, "শুনেছি পাগলদের গায়ে খুব জোর হয়।"

"আমি কি পাগল নরহরি?"

"তা একটু পাগল তো সবাই। উনিশ-বিশ, ও নিয়ে ভাববেন না। দুনিয়ায় যত ভাল-ভাল কাজ তো পাগলেরাই করেছে কিনা।"

দুলালবাবু এ-কথাতেও খুশি হয়ে বললেন, "তা হলে পাগল হওয়াটা খারাপ নয়!"

"আজ্ঞে না। আপনার ভিতরে ঢোকার রাস্তা করে দিয়েছি। ঢুকে পড়ুন।"

দুলালবাবু বেড়ালের মতো লাফ মেরে জানালায় উঠে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। চুরির চেয়ে সোজা কাজ পৃথিবীতে কিছু আছে বলে তাঁর মনে হল না। তিনি ঢুকে চারদিকে চেয়ে দেখলেন। প্রথমেই চোখে পড়ল, দেওয়ালের সঙ্গে দাঁড় করানো একগাছ ঝাঁটা।

"পেয়েছি!" বলে দুলালবাবু গিয়ে বিজয়-গর্বে ঝাঁটাগাছ তুলে নিয়ে জানলার কাছে ছুটে এসে উত্তেজিত গলায় ডাকলেন, "নরহরি।"

নরহরি ছায়ার মতো এগিয়ে এসে বলল, "চেঁচাবেন না পাঁচুবাবু। একদম

স্পিকটি নট। কিছু পেলেন?"

"এই যে।" দুলালবাবু ঝাঁটাগাছটা এগিয়ে দিলেন।

পাঁচু চাপা গলায় বলল, "পেতল-কাঁসা দেখুন। ঝাঁটা দিয়ে কোন কচু হবে?"

দুলালবাবু মাথা নেড়ে ফের চারদিকে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু খিদের চোটে পেটে এমন চুঁই-চুঁই করছে যে, দুলালবাবু আর থাকতে পারলেন না। এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে খাবার খুঁজলেন খানিক। তারপর সামনে সিঁড়ি দেখে দোতলায় উঠলেন।

হঠাৎ তাঁর নাকে বেশ ভাল-ভাল খাবারের গন্ধ আসতে লাগল। গন্ধ অনুসরণ করে তিনি একটা ঘরে এসে ঢুকলেন। তারপর আলো জ্বাললেন। খুঁজতে খুঁজতে একটা জালের আলমারির মধ্যে বাটিতে ঢাকা মেলা খাবার দেখে তাঁর চোখ চকচক করতে লাগল। দুলালবাবু তিন-চারটে বাটি বের করে নিলেন। তারপর চেয়ার-টেবিলে বসে মহানন্দে খেতে শুরু করে দিলেন।

হঠাৎ দরজার কাছে একটা শব্দ হল। দুলালবাবু তাকিয়ে দেখলেন, একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

দুলালবাবু লোকটাকে গ্রাহ্য না করে খেয়ে যেতে লাগলেন।

নন্দবাবু রান্নাঘরে এত রাতে কাউকে দেখবেন বলে আশা করেননি। মনে তাঁরও ভয়। চুরি করে খেতে এসে ধরা পড়লে কেলেঙ্কারির একশেষ। কিন্তু উঁকি না দিয়েও পারেননি। এত রাতে চোরটোর কেউ যদি ঢুকে পড়ে থাকে তা হলে তো মুশকিল। নন্দবাবু চোরকেও কিছু কম ভয় পান না। চোরদের ধর্মবোধ নেই, মায়াদয়া নেই, বিপদে পড়লে তারা খুন-জখমও করে থাকে বলে তিনি শুনেছেন।

তাই খুব সাবধানে দেওয়ালের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখে নিলেন, ভিতরে লোকটা কে।

যা দেখলেন, তাতে তাঁর চক্ষুস্থির হয়ে গেল। ঝুলে পড়ল চোয়াল। হাঁ-মুখের মধ্যে একটা উড়ন্ত মশা ঢুকে চক্কর খেতে লাগল। স্বপ্ন দেখছেন নাকি? দুলাল-স্যার এত রাতে তাঁদের রান্নাঘরে ঢুকে খাচ্ছেন এ তো পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের ঘটনা!

এখানে বলে রাখা ভাল, দুলাল-স্যারকে যে ভুবন রায় ল্যাবরেটরির কাজে লাগিয়েছেন, এটা নন্দবাবুর জানা ছিল না। জানা অনেকেরই ছিল না। কারণ ভুবন রায় যখন যা খুশি করতে ভালবাসেন, কাউকে কিছু জানানোর দরকার আছে বলে মনে করেন না।

নন্দবাবু চোখ কচলালেন, নিজের গায়ে চিমটি দিলেন। তারপরও তাকিয়ে দেখলেন, সেই একই দৃশ্য। দুলালবাবু খাচ্ছেন। এবং পরিমাণটাও ফ্যালনা নয়। এরকম রোগা মানুষ অতটা বিরিয়ানি বা মাংস কী করে খাবেন, সেটাও একটা মস্ত প্রশ্ন।

এই প্রশ্নটা মাথায় উকুনের মতো কুটকুট করতে থাকায় নন্দবাবু ভারি ভাবিত হয়ে মাথা চুলকোতে গেলেন, ফলে কনুইয়ের ধাক্কায় দরজাটা খচাং করে নড়ে উঠল এবং দুলালবাবু তাঁর দিকে একবার চেয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে চোখটা সরিয়ে নিয়ে ফের খেয়ে যেতে লাগলেন।

ছাত্রবয়সে নন্দবাবু দুলালবাবুর কাছে পড়েছেন। নন্দবাবু ছাত্র হিসেবে তেমন সুবিধের ছিলেন না। তার ওপর বাঁদর ছেলে বলে নাম-ডাকও ছিল। দুলালবাবুর হাতে বিস্তর চড়-চাপড় আর বেত খেয়েছেন এককালে। ভারি রাগী লোক। এখনও দুলালবাবুর প্রতি সেই ভীতিটা তাঁর রয়ে গেছে।

কিন্তু দৃশ্যটা স্বপ্ন না বাস্তব? তার একটা ফয়সালা হওয়া দরকার। তাই নন্দবাবু খুব কষে গলাখাঁকারি দিয়ে মৃদু স্বরে অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "ইয়ে.....।"

দুলালবাবু বিরিয়ানির ভিতর থেকে একটা মোটা হাড় খুঁজে পেয়ে আরামে চিবোতে-চিবোতে একবার তাঁর দিকে চেয়ে দেখে নিলেন। কিন্তু কোনও কথা বললেন না। ইয়ে..... তো কোনও প্রশ্ন নয় যে, জবাব দিতেই হবে।

নন্দবাবু ফের মাথা চুলকোলেন এবং আর একটু সাহস সঞ্চয় করে বললেন, "স্যার, ভাল আছেন তো!"

দুলালবাবু এ-কথাটারও জবাব দিলেন না। ফুলকপির রোস্টটা আজ খুব উতরেছে। এক কামড় খেয়েই তাঁর চোখ বুজে এল আরামে।

নন্দবাবু এবার ঘরের মধ্যে সাহস করে ঢুকলেন। তারপর একগাল হেসে বললেন, "স্যারের দেখছি বেশ খিদে পেয়েছে!"

দুলালবাবু এবার লোকটার দিকে বিরক্তির সঙ্গে চেয়ে বললেন, "চুপ করে বোসো। খাওয়ার সময় কথাটথা বলতে নেই।"

নন্দবাবু মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে বললেন, "বটেই তো।"

বলে সামনেই খুব সাবধানে বসলেন। স্যারের সামনে জীবনে কখনও চেয়ারে বসেননি। তবে এখন বয়স-টয়স হয়েছে, তাই বসলেন। বসে চোখের পাতা

ফেলতে পারলেন না।

দুলাল-স্যার অন্তত আধসের মাংস আর সেরটাক বিরিয়ানি সাফ করে দিয়েছেন। অন্যান্য উপকরণও সেই পরিমাণে। সবশেষে উনি জমাটি এক জামবাটি-ভর্তি পায়েস খুবই স্নেহের সঙ্গে কাছে টেনে নিতেই নন্দবাবুর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "বাব্বাঃ"!

দুলালবাবু ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কে?"

নন্দবাবু একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। দুলালবাবুর তাঁকে না-চেনার কথা নয়। দিন-তিনেক আগেও বাজারে দেখা হয়েছে দুলালবাবু উবু হয়ে বসে মন দিয়ে বাছছিলেন। নন্দবাবুকে দেখে বলে উঠলেন, "কী রে হনুমান, আঁক-টাক ঠিকমতো করছিস তো!"

নন্দবাবুর আর আঁক কষার দরকার নেই। কিন্তু সে-কথা সেদিন আর বলতে সাহস হয়নি।

তা এই ক'দিনেই এমন কী হল যে, দুলাল-স্যার তাঁকে চিনতে পারছেন না?

নন্দবাবু ফের মাথা চুলকে বললেন, "আমি নন্দ, স্যার। আমাকে চিনতে পারছেন না?"

দুলালবাবু ভ্রূ কুঁচকে নন্দবাবুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "নন্দ?"

"হ্যাঁ স্যার। নন্দলাল রায়।"

দুলালবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "বাঃ, নামটা তো বেশ। তা কত দাম পড়ল?"

নন্দবাবু অবাক হয়ে বললেন, "কিসের দাম?"

"নামটা তো কিনতে হয়েছে বাপু। আমি পাঁচু নামটা কিনেছি পাঁচ টাকায়। লোকটা ভাল, ইচ্ছে করলে আরও বেশি চাইতে পারত।"

নন্দবাবু মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে না পেরে বললেন, "নাম কিনেছেন?"

"না কিনে করি কী বলো, নাম ছাড়া কি কাজ চলে?"

"কেন স্যার, আপনার নাম তো দুলাল সেন!"

"দুলাল সেন! আমার নাম আবার কবে দুলাল সেন ছিল?"

"ছিল কেন স্যার, এখনও আছে। আপনি তো জলজ্যান্ত দুলাল সেন।"

দুলালবাবু একটু ভাবলেন। তারপর পায়েসের বাটি থেকে এক খাবলা তুলে খেতে-খেতে বললেন, "তা সেটা আগে বলতে হয়। পাঁচ-পাঁচটা টাকা গচ্চা দিয়ে একটা নাম কিনে ফেলেছি, সেটা তো আর ফেলে দিতে পারি না। তুমি বরং দুলাল সেন নামটা কিনে নাও, ওই পাঁচ টাকাই দিও। প্রতি অক্ষরে এক টাকা করে, জলের মতো সোজা হিসেব।"

নন্দবাবুর সন্দেহ হল, দুলালবাবুর মাথার একটু গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে।

এরকম হতেই পারে। নন্দবাবু সারা জীবন কেবল আঁক কষে গেছেন আর ঝুড়ি-ঝুড়ি বিজ্ঞানের বই পড়ে গেছেন। অত বই পড়লে আর আঁক কষলে মাথা খারাপ হতেই পারে।

নন্দবাবু দুঃখিতভাবে জিব দিয়ে একটু চুকচুক শব্দ করে বললেন, "আহা।"

দুলালবাবু এবারও ভ্রূ কুঁচকে নন্দবাবুর দিকে চাইলেন। তারপর বললেন, "তা হলে কিনছ?"

নন্দবাবু মাথা চুলকে বললেন, "আমার তো নাম একটা আছে স্যার। একটা থাকতে আর একটা নাম কেনা কি উচিত?"

"তোমার নামটা যেন কী বললে!"

"আজ্ঞে নন্দদুলাল রায়।"

নাক কুঁচকে দুলালবাবু বললেন, "বাজে নাম। বিশ্রী নাম। পচা নাম। দুলাল সেন নামটা কত সুন্দর। তোমাকে বেশ মানাবেও হে। শস্তায় দিচ্ছি।"

নন্দবাবু সাধারণত কারও সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করেন না। তাতে মনটা লঘু হয়ে যায়। তবু এখন কেমন যেন একটু রসিকতা করার লোভ সামলাতে পারলেন না। বললেন, "আজ্ঞে শস্তা কোথায়? বেজায় আক্রা। প্রতি অক্ষর দশ পয়সা দরে পাওয়া যায়।"

দুলালবাবু হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন, "বলো কী? নরহরি যে বলল, অক্ষর একটাকা করে!"

"নরহরি কে স্যার?"

"সে আমার শাকরেদ। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।"

"কিসের শাকরেদ?"

"আমরা চুরি করতে বেরিয়েছি। খুব ভাল কাজ। সোজাও বটে।"

নন্দবাবু চোখ গোল করে বললেন, "চুরি!"

দুলালবাবু একগাল হেসে বললেন, "খুব সোজা কাজ। লোকের বাড়ি ঢুকে সব জিনিসপত্র চুপিচুপি সরিয়ে ফেলতে হয়। সেগুলো নরহরিই বেচে পয়সা এনে দেবে। তুমিও আমাদের সঙ্গে নেমে পড়ো কাজে। চুরি করলে বুদ্ধি বাড়ে, সাহস বাড়ে, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বাড়ে, চোখ-কান-নাক সব সজাগ হয়। চুরির মতো জিনিস নেই।"

"বলেন কী স্যার? এ যে ভূতের মুখে রাম নাম।"

"তার মানে কী?"

"আপনি যে খুবই সাধু লোক ছিলেন। পঁচিশ বছর আগে কার কাছ থেকে

যেন একটা পোস্টকার্ড ধার করে বাবাকে চিঠি লিখেছিলেন, পঁচিশ বছর ধরে সেই পোস্টকার্ডের জন্য আপনার মানসিক যন্ত্রণা হত। পরে সেই লোকটার ছেলেকে খুঁজে বের করে একটা পোস্টকার্ডের ধার শোধ করেছিলেন! এ গল্প আপনি নিজেই আমাদের বলেছিলেন।"

দুলালবাবু দ্রুতবেগে জমাট পায়েস খেতে-খেতে ভারি আরাম বোধ করতে করতে বললেন, "পোস্টকার্ড! সেটা কী জিনিস বলো তো!"

নন্দবাবু খুবই হতাশ হয়ে দুলালবাবুর দিকে চেয়ে রইলেন।

দুলালবাবু পায়েসের বাটি শেষ করে একটা ঢেকুর তুলে বললেন, "বাঃ, দিব্যি খাওয়া হল। এবার কাজ।"

"কী কাজ স্যার?"

"বাসনপত্রগুলো সব চুরি করতে হবে। আর গয়নাগাঁটিও। চলো তো ছোকরা, আমার সঙ্গে একটু হাত লাগাবে। নরহরি বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।"

নন্দবাবু হাসবেন কি কাঁদবেন তা বুঝতে পারলেন না। স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন। দুলাল সেন তাঁর চোখের সামনেই বাসনপত্রগুলো গুছিয়ে পাঁজা করে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বলে গেলেন, "এগুলো চালান করে দিয়েই ফের আসছি এ-বাড়িতে দেখছি মেলাই জিনিস।"

দুলালবাবু খোলা জানালাটার কাছে এসে আহ্লাদের গলায় ডাকলেন, "নরহরি।"

সঙ্গে সঙ্গে জানলায় পাঁচুর ছায়া উদয় হল।

"এই যে ধরো। আরও জিনিস আছে।"

পাঁচু বাসনগুলো নিয়ে খুশি হয়ে বলল, "বড্ড সময় নিচ্ছেন যে পাঁচুবাবু। আরও একটু তাড়াতাড়ি করলে হয় না?"

দুলালবাবু হেসে বললেন, "খাচ্ছিলুম তো। বেশ খাওয়া হল। তাও তাড়াতাড়িই হত, একটা লোক এসে খামোখা নানা কথা জুড়ে দিল।"

আঁতকে উঠে পাঁচু বলল, "লোক! বলেন কী! তা হলে তো ধরা পড়ে গেছেন।"

"আরে না। তাকেও দলে ভিড়িয়েছি। সে এখন গয়নাগাঁটি নিয়ে আসছে।"

পাঁচু অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে থেকে বলল, "কাজটা ঠিক করেননি পাঁচুবাবু। চুরির সময় অন্যদিকে মন দিতে নেই।"

দুলালবাবু একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, "আচ্ছা, এবার মন দিয়েই চুরি করছি।"

পাঁচু বাসনগুলো নিয়ে গামছায় পোঁটলা বেঁধে ফেলল। তার মনে হল, এবারে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। লোকটা পাগল। ধরা পড়তে আর দেরি নেই। যা বাসনপত্র পেয়েছে পাঁচু তা বেচলে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা হেসেখেলে হয়ে যাবে।

বেশি লোভ করা ভাল নয়।

পাঁচু বাসনের পোঁটলাটা পিঠে ফেলে রওনা দিল।

আর হঠাৎ দুটো লোহার মতো হাত এসে পিছন থেকে জাপটে ধরল তাকে।

আচমকা ধরা পড়ে পাঁচু আঁতকে উঠেছিল ঠিকই, তবে বহুদিনের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার ফলে ঘাবড়ে গেল না। চেঁচামেচিও করে উঠল না। শুধু বজ্র আঁটুনিতে 'কোঁক, কোঁক' করে কয়েকটা শব্দ বেরোল মুখ দিয়ে। পাঁচু খুব বেকায়দায় পড়ছে বুঝতে পেরে অমায়িক হেসে মোলায়েম গলায় বলল, "কে রে তুই দাদুভাই, অমন করে কি ধরতে আছে রে? বুড়ো হয়েছি না? তার ওপর এই দ্যাখ দাদুভাই, তোর ঠাকুমা একগাদা বাসন ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বলল, যাও, বেয়াইবাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো। তা মাইল তিনেক পথ হেঁটে এই একটু জিরেন নেব বলে ভাবছিলাম।"

পিছন থেকে যে সাপটে ধরে আছে সে এবার ক্রুদ্ধ গলায় বলল, "তুমি একটা জোচ্চর!"

পাঁচু জিভ কেটে বলল, "ওকথা বলবেন না বাবুমশাই। এই ভোরবেলায় দেবতারা সব বেড়াতে বেরোন কিনা। শুনে ফেলবেন। আর শুনলেই চিত্তির। সোজা স্বর্গে ফিরে গিয়ে আমার পুণ্যির খাতে যা জমা হয়েছিল সব ঢ্যাঁড়া মেরে দেবেন। এই ভোরবেলাটায় তাই পাপ কথা বলতে নেনই। পাপ কাজও করতে নেই।"

"কিন্তু তুমি যে জোচ্চোর!"

পাঁচু চাপের চোটে দমসম হয়ে পড়েছিল। আর কয়েকবার কোঁক-কোঁক শব্দ করে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "আজ্ঞে, আপনি যদি খুশি হন তা হলে বলি, আমি জোচ্চোরই বটে। এবারে ফাঁসটা একটু আলগা করুন, নইলে যে খুনের দায়ে ধরা পড়বেন বাবুমশাই।"

"নামের দাম অক্ষর-প্রতি কত ঠিক করে বলো তো এবার বাছাধন।"

ভয়ের চোটে এতক্ষণ গলাটা চিনতে পারছিল না পাঁচু, যদিও চেনা-চেনা লাগছিল। এবার চিনতে পেরে একগাল হেসে বলল, "ওঃ, পাঁচুবাবু নাকি? তা এই তো এক পাঁজা বাসন গস্ত করলেন, দিব্যি হাত হয়েছে, এর মধ্যে হঠাৎ আবার মেজাজ বিগড়োল কেন?"

দুলালবাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, "নন্দবাবু বলেছে, নামের দাম প্রতি অক্ষরে দশ পয়সা। আর তুমি জোচ্চুরি করে নিয়েছ এক টাকা করে।"

পাঁচু অত্যন্ত বিনয়ী গলায় বলল, "নামের বাজার এবেলা-ওবেলা ওঠানামা

করে। তবু বলি পাঁচুবাবু, উটকো লোকের কথায় না নাচাই ভাল। নন্দবাবু নামের জানেটা কী? আর নানান নামের নানান দর। পাঁচু নামটা কি যেমন-তেমন নাম? চন্দ্রবিন্দু থাকলে নামের দর একটু বেশি পড়েই যায়। দেখে আসুন না নামের বাজারটা। এবার যদি দয়া করে একটু ছাড়েন তো ভাল হয়। হাড়গোড় যে গুঁড়িয়ে গেল পাঁচুবাবু।"

দুলালবাবু ছাড়লেন। বললেন, "তা হলে জোচ্চুরি করোনি?"

জিভ কেটে পাঁচু বলল, "আপনার সঙ্গে! কী যে বলেন।"

"জোচ্চুরি না করলে পালাচ্ছিলে কেন?"

চোখ কপালে তুলে বলল, "পালাচ্ছিলুম? কখনো নয়। আমার চোদ্দপুরুষে কেউ কখনও পালায়নি। একটু আলগা দিচ্ছিলুম আর কি!"

"নন্দলাল যে বলল, ওই যে লোকটা পালাচ্ছে, গিয়ে ধরুন!"

"মহা মিথ্যেবাদী। যে নামের দাম নিয়ে জল ঘোলা করে তাকে কি বিশ্বাস করতে আছে?"

"আছে," বলে হঠাৎ নন্দবাবু হাতে একটা লাঠি নিয়ে এগিয়ে এলেন।

"বাবা গো!" বলে পাঁচু দৌড়তে লাগল। তার পিছু-পিছু নন্দবাবু।

দুলালবাবু ঘটনার আকস্মিকতায় একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। কী করা উচিত তা বুঝতে পারলেন না। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, মেলা কাজ বাকি। এখনও সোনাদানা গয়নাগাঁটি চুরি করা হয়নি। বাড়িটা ভর্তি কেবল জিনিস।

দুলালবাবু আবার জানলা গলে ভিতরে ঢুকে পড়লেন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তিনি ঘর থেকে নানা জিনিস বের করে আনতে লাগলেন। জলের কুঁজো, কুলো, কৌটো, ছেঁড়া জুতো থেকে শুরু করে মগ, বালতি কিছুই বাদ দিলেন না। দেখতে দেখতে জানলার বাইরে মেলা জিনিস স্তূপাকার হয়ে জমে উঠল। দুলালবাবু খুব খুশি হলেন। বাঃ, চুরিটা দিব্যি জমে উঠেছে।

দোতলায় উঠে তিনি যখন ভুবন রায়ের ঘরে হানা দিলেন, তখন তিনি চুরির নেশায় হন্যে হয়ে উঠেছেন।

ভুবন রায়ের ঘরে মেলাই জিনিস। তবে বেশির ভাগই বাজে জিনিস। দুলালবাবু অনেক জিনিস নীচে নামিয়ে আনলেন। তারপর তাঁর নজর পড়ল ভুবন রায়ের লোহার আলমারিটার দিকে। কিন্তু আলমারি চাবি দেওয়া।

দুলালবাবু গিয়ে ভুবন রায়কে ডাকাডাকি করতে লাগলেন, "এই যে মশাই, ও দাদু, আলমারির চাবিটা একটু দিন তো! দেরি হয়ে যাচ্ছে যে!"

ভুবন রায়ের ঘুম খুব গাঢ়। সহজে ভাঙে না। কিন্তু এত ডাকাডাকিতে মড়াও উঠে বসে।

দুলালবাবুকে দেখেই ভুবন রায় বললেন, "কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছেন নাকি?"

দুলালবাবু একগাল হেসে বললেন, "কত কী!"

"এর মধ্যেই?" বলে ভুবন রায় তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন, "তা কী আবিষ্কার করলেন শুনি?"

দুলালবাবু খুব গম্ভীর হয়ে আঙুলের কর গুনে-গুনে বলতে লাগলেন, "প্রথমেই আবিষ্কার করলাম একটা ঝাঁটা। তারপর বিরিয়ানি, ফুলকপি, পায়েস, তারপর জুতো, জামা, কৌটো..."

ভুবন রায় স্বপ্ন দেখছেন কি না বুঝতে না পেরে নিজের গায়ে চিমটি কেটে নিজেই 'উঃ' করে উঠলেন।

দুলালবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "এখন ওই আলমারির মধ্যে কী আছে সেইটি আবিষ্কার করতে হবে। চাবিটা দিন তো।"

ভুবন রায় ভ্রূকুটি করে বললেন, "আপনি কানে কম শোনেন জানতাম। কিন্তু এতটাই যে কম শোনেন, তা জানা ছিল না। আমি আপনাকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাজে লাগিয়েছি, আর আপনি রাতদুপুরে আমার বাড়িতে ঢুকে ঝাঁটা জুতো আবিষ্কার করছেন।"

দুলালবাবু মাথা চুলকোতে লাগলেন, তাঁর মাথাটা যেন কেমন ঝিমঝিম করছে। কানে কম শোনেন! অথচ তিনি তো দিব্যি শুনতে পাচ্ছেন! অথচ কথাটা তাঁর মিথ্যে বলেও মনে হচ্ছিল না। কী যেন তাঁর মনে পড়তে লাগল অল্প-অল্প করে।

ভুবন রায় আবার ধমকের সুরে বললেন, "ছিঃ দুলালবাবু, আপনার কাণ্ডজ্ঞান যে এতটাই কম তা আমার জানা ছিল না।"

দুলালবাবুর মাথাটা খুব রিমঝিম করতে লাগল। একটু আগেও আর একজন তাঁকে দুলালবাবু বলে ডেকেছিল বটে। নামটা তাঁর চেনা-চেনাও ঠেকছে যে!

আচমকাই দুলালবাবুর মাথাটা কেমন যেন বোঁ করে ঘুরে গেল। তিনি চোখে অন্ধকার দেখলেন। তারপর পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারালেন।

ওদিকে নন্দবাবু পাঁচুর পিছনে ছুটতে ছুটতে যেখানে এসে হাজির হলেন, সেটা তাঁদের ভৌত-ক্লাব। ক্লাবের পিছনে সেই ভাঙা বাড়ি। চারদিক ঝিমঝিম করছে, নির্জন।

বুড়ো হলেও লোকটা যে বেশ জোরে দৌড়তে পারে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর নন্দবাবু নিজে যে এখনও ভালরকমই দৌড়তে পারেন তা তাঁর জানা ছিল না।

ভৌত-ক্লাবের কাছে চোরটা গা-ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করছিল।

নন্দবাবু তাকে ডেকে বললেন, "ওহে নরহরি, তোমার ভয় নেই। পালিও না।"

পাঁচু ওরফে নরহরি একটা গাছের আড়াল থেকে বলল, "ভয় আছে কি নেই, সেটা বুঝব কী করে?"

নন্দবাবু খুশিয়াল গলায় বললেন, "তোমার দৌড় দেখে আমি খুশিই হয়েছি।"

পাঁচু চাপা গলায় বলল, "আজ্ঞে কর্তা, আপনিও কিছু কম যান না।"

নন্দবাবু বললেন, "হেঃ হেঃ, তা বলতে পারো বটে। দৌড়ঝাঁপে আমার কিছু এলেম ছিল এককালে।"

"এখনও আছে।" বলে বিগলিত মুখে পাঁচু শিশুগাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। সে বুঝে গেছে, আজ রাতে এ-শহরে পাগলের সংখ্যা বেজায় রকমের বেড়ে গেছে।

নন্দবাবু ভৌত-ক্লাবের ভেজানো দরজাটা ঠেলে খুলে ফেলে বললেন, "এসো, একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক। বড্ড জলতেষ্টা পেয়েছে।"

পাঁচুরও যথেষ্ট ধকল গেছে। এই বয়সে এত হুটোপাটি কি সয়? সেও নন্দবাবুর পিছু-পিছু ঘরে ঢুকে মেঝের ওপর বসে পড়ল, "যে আজ্ঞে"।

নন্দবাবু মোমবাতি জ্বাললেন, তারপর কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেলেন। তারপর পাঁচুর দিকে চেয়ে বললেন, "এটা কিসের ক্লাব জানো?"

পাঁচু একগাল হেসে বলল, "তা আর জানব না? এ হল ভুতুড়ে কেলাব।"

"ভৌত-ক্লাব।"

"ওই হল। আপনারা সব সাঁঝের বেলায় এখানে বসে ভূত-প্রেত নামানোর জন্য চেষ্টা করেন। তবে তাঁরা নামেন না।"

নন্দবাবু মাথা নেড়ে দুঃখের সঙ্গে বললেন, "ঠিকই বলেছ, আমাদের একজন তো ভূত দেখার জন্য কত চেষ্টাই করলেন। শালার কাছে তাঁর মুখ দেখানোই ভার হয়েছে।"

পাঁচু খুব হাসল। হাসতে হাসতেই বলল, "আজ্ঞে, ভূতের কোনও অভাব নেই। চারদিকে মেলা ভূত।"

নন্দবাবু সোজা হয়ে বসে বললেন, "বলো কী।"

পাঁচু গম্ভীর হয়ে বলল, "আমরা হলুম তো রাতচরা মানুষ। নিশুতি রাতেই আমাদের কাজ-কারবার শুরু হয় কি না, আমরা তো বিস্তর ভূত দেখতে পাই।"

নন্দবাবু সাগ্রহে বললেন, "কেমন?"

"এই তো পরশু দিনই নিস্তারিণী ঠাকুমাকে দেখলুম। কদমতলার বেলগাছ

থেকে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে আছেন। গতকালও বগলা দত্তের সঙ্গে দেখা, পুকুরে নেমে চান করছিলেন। তারপর ধরুন, কুমোরপাড়ার মোড়ে যদি যান, দেখবেন নাথু মুচি বসে বসে জুতো সেলাই করছে, তার একটু দূরেই হারা নাপতে চুল ছাঁটছে। তারপর ধরুন, এই ভৌত-ক্লাবের পিছনেই তো গত তিনশো বছর ধরে হরিহর মিত্রমশাই বসবাস করে যাচ্ছেন। সেই চুনোট ধুতি, গোঁফে সেই তুরতুরে আতর, গিলে-করা পাঞ্জাবি, পাঁচ আঙুলে পাঁচখানা আংটি, তেমনি দাপুটে মেজাজ। এখনও কথায় কথায় মোহর বখশিশ করেন, চটে গেলে চাবুক।"

"অ্যাঁ! তা দেখাতে পারো?"

"সে আর শক্ত কী? তবে কিনা...."

দুলালবাবুর যখন চেতনা ফিরল তখন সকাল হয়েছে। ঘরে পুবের জানালা দিয়ে বেশ খানিকটা রোদ এসে ঘরটা ঝলমল করছে আলোয়। আর সেই আলোয় ভুবন রায় ভূত-দেখা চোখে দুলালবাবুর মুখের দিকে চেয়ে কাঠ হয়ে বসে আছেন।

দুলালবাবু নিজের পরিস্থিতিটা বুঝতে একটু সময় নিলেন। তিনি প্রথম যে জিনিসটা বুঝতে পারলেন, সেটা অতিশয় বিস্ময়কর। বাইরে পাখি ডাকছে। বহুকাল পাখির ডাক শোনেননি। আরও অনেক কিছুই শোনেননি। হঠাৎ পাখির ডাক এত জোরে কানের পর্দায় এসে লাগছিল যে, তিনি দু'কানে আঙুল দিয়ে উঠে বসলেন।

তারপর ভুবনবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "বড্ড বেশি আওয়াজ করছে পাখিগুলো।"

ভুবন রায় এমন কাঠ হয়ে বসে আছেন যে, তাঁকে তাঁর স্ট্যাচু বলে মনে হচ্ছিল। দুলালবাবুর কথায় হ্যাঁ-না কিছুই করলেন না, তবে খানিকটা হাঁ করে যেমন চেয়েছিলেন তেমনিই চেয়ে রইলেন।

দুলালবাবু দুটো কান দুই আঙুলে কিছুক্ষণ খোঁচাখুঁচি করে নিয়ে বললেন, "বেশ খিদেও হচ্ছে মশাই। পেট রীতিমতো চোঁচোঁ করছে।"

কে যেন পিছন থেকে অত্যন্ত বিস্মিত গলায় বলে উঠল, "খিদে? আপনার আবার খিদে পাচ্ছে?"

দুলালবাবু ঘাড়টা ঘুরিয়ে দেখলেন, দরজার কাছে আরও দুটো প্রস্তরমূর্তি। একজন রামলাল, অন্যজন নন্দলাল। দুজনের মুখই একটু করে হাঁ।

দুলালবাবু খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "কেন বাপু, খিদে পাবে না-ই বা কেন? খিদে পেলে কি দোষ হয় কিছু? নাকি তোমাদের বাড়িতে খিদে পাওয়ার নিয়ম নেই? এমন ভাবখানা করছ যে, খিদে কথাটা জীবনে এই প্রথম শুনলে। বলি তোমাদের খিদে-টিদে পায় না?"

দুলালবাবুর এরকম কড়া ধমকানিতে নন্দবাবু বেশ ঘাবড়ে গিয়ে মাথা চুলকোতে-চুলকোতে আমতা-আমতা করে বললেন, "না, খিদের আর দোষ কী? খিদে পেতেই পারে। আমাদেরও পায়। তবে কিনা কাল রাত দুটোর সময় আপনি একাই এক পালোয়ানের ভোজ খেয়েছেন। এত তাড়াতাড়ি আবার খিদে পেয়ে থাকলে ভালই, স্বাস্থ্যের লক্ষণ! তার মানে হজমটজম ভালই হচ্ছে। আর ইয়ে...."

দুলালবাবু নিজের এই বেয়াদব ছাত্রটির দিকে কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থেকে বললেন, "কাল রাত দুটোয় কে আমাকে ভোজ খাওয়াল বলো তো? আমি তো নেমন্তন্নবাড়িতে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছি।"

নন্দবাবু সখেদে বললেন, "নেমন্তন্ন তো আপনাকে করাও হয়নি স্যার। আপনি নিজেই আমাদের রান্নাঘরে ঢুকে স্বহস্তে নিজেকে পরিবেশন করেছেন। তারপর বাসনগুলো বেঁধে নিয়ে আপনার শাকরেদদের হাতে চালান করে এলেন। সব স্বচক্ষে দেখা।"

দুলালবাবু আর সহ্য করতে পারলেন না। টপ করে দাঁড়িয়ে নন্দলালের গালে চটাস করে একখানা চড় বসিয়ে বললেন, "বাঁদর ছেলে, আবার মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে!"

চড় খেয়ে নন্দবাবু চোখে অন্ধকার দেখলেন। ক্রমে সেই অন্ধকারে অনেক সরষে ফুল ফুটে উঠতে দেখলেন। তাঁর পায়ের তলা থেকে মেঝেটাও কে যেন কার্পেটের মতো টেনে নিল। নন্দলাল কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেলেন।

রামলাল এই কাণ্ড দেখে তড়াক করে দরজার ওপাশে গিয়ে লাফ দিয়ে পড়লেন। একসময়ে তিনিও দুলালবাবুর ছাত্র ছিলেন। আর দুলালবাবুর মস্ত দোষ হল একজন ছাত্র দোষ করলে শুধু তাকে মেরেই ক্ষান্ত হতেন না, আরও দু-পাঁচজনকে ফাউ হিসাবে ঠেঙিয়ে নিতেন। সেই কথা রামবাবুর খুব মনে আছে।

ভুবনবাবু নীরবে দৃশ্যটা দেখলেন। কয়েক সেকেন্ড হাঁ-হুঁ কিছু করলেন না।

তরে হাঁ করে যেমন চেয়েছিলেন, তেমনিই চেয়ে রইলেন দুলালবাবুর দিকে।

দুলালবাবু তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, "বেয়াদবটার কথা শুনলেন? আমি নাকি রাতে দুটোয়....."

ভুবনবাবু একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাঁ বন্ধ করলেন। তারপর দুলালবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "বলবান লোক আমি পছন্দই করি দুলালবাবু। আপনার গায়ে যে যথেষ্ট জোর হয়েছে, এতে আমি খুবই খুশি। কিন্তু সত্যকে চাপা দেওয়ার জন্য গায়ের জোর খাটানোটা বোধহয় ভাল কাজ নয়।"

দুলালবাবু মাথা চুলকোতে লাগলেন। বললেন, "আপনার মতো মান্যগণ্য লোককে কী করে বলব। কিন্তু কথাটা ডাহা মিথ্যে।"

ভুবনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "মোটেই মিথ্যে নয়। কাল যে মাঝরাত্তিরে আপনি রান্নাঘরে ঢুকে খেয়েছেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আর বাসনকোসনও যে সরিয়েছিলেন তার সাক্ষী হিসেবে পাঁচু মোদক নামে একটা লোককেও নন্দলাল ধরে এনেছে। সে আমাদের নীচের তলার ঘরে বসে রয়েছে।"

দুলালবাবুর চোখ দু'খানা বিস্ফারিত হয়ে গেল, "পাঁচু মোদক? কস্মিনকালেও এরকম নাম শুনিনি।"

"শুধু তাই নয় দুলালবাবু, নন্দলালের কাছে ধরা পড়ে নিজেকে আপনি পাঁচু মোদক বলে চালানোর চেষ্টা করেছিলেন। আর আপনি যে চুরি করতেই বাড়িতে ঢুকেছেন, সে-কথাও কবুল করেছেন। ঘটনা অনেক ঘটে গেছে দুলালবাবু, কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা হচ্ছে, আপনি আমাদের আসল দুলালবাবু নন। আমাদের দুলালবাবু ছিলেন রোগা মানুষ, বুড়ো, কানে একেবারেই শোনেন না, নিরীহ। কিন্তু আপনি রীতিমতো স্বাস্থ্যবান, হিংস্র, সুপুরুষ। সুতরাং আমি জানতে চাই, আপনি লোকটা কে? আর আমাদের আসল দুলালবাবুই বা কোথায় গেলেন? আমার ঘোরতর সন্দেহ, আসল দুলালবাবুকে আপনি গুম করেছেন। খুনও করে থাকতে পারেন।"

দুলালবাবু এত অবাক হলেন যে, মুখ দিয়ে বাক্য সরল না। অনেকক্ষণ বাদে বললেন, "এ-সবের মানে কী? কী সব বলছেন ভুবনবাবু?"

ভুবনবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "অস্বীকার করছি না যে, আপনার সঙ্গে দুলালবাবুর চেহারার অনেক মিল আছে। কিন্তু মিল থাকলেই যে একজন অন্যজন হয়ে যা-খুশি করবেন, তা তো হয় না!"

দুলালবাবু এবার নিজের দিকে তাকানোর একটা অক্ষম চেষ্টা করলেন। তাঁর মনে হল, তিনি আগের মতো রোগা নেই। হাত-টাতগুলো বেশ সবল আর

শক্তিমান দেখাচ্ছে। ছাতিটাও চওড়া মনে হচ্ছে। গায়ে বেশ শক্তি অনুভব করছেন। না, তিনি তো বাস্তবিকই তা হলে দুলাল সেন নন।

দুলালবাবু হঠাৎ বললেন, "আপনার কাছে আয়না আছে!"

ভুবনবাবু পশ্চিমের দেওয়ালে টাঙানো আয়নাটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "ওই তো!" দুলালবাবু গিয়ে আয়নায় নিজের মুখখানা ভাল করে দেখলেন। সেই আগেকার রোগা ভাঙা বুড়োটে মুখ এ তো নয়। রীতিমতো অল্পবয়সী একটা মুখ। দুলালবাবু হঠাৎ বুঝতে পারলেন, কোথায় একটা বস্ত বড় গণ্ডগোল হয়ে গেছে।

ভুবনবাবু বললেন, "কী হল, আপনি কে তা বুঝতে পারলেন?"

দুলালবাবু দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "না। ঠিক চিনে উঠতে পারছি না। অথচ চেনা-চেনা ঠেকছে।"

"তা হলে?"

দুলালবাবু মাথা চুলকে বললেন, "তা হলে...."

ভুবনবাবু অত্যন্ত কঠিন চোখে দুলালবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "তা হলে আপনাকে পুলিশে দেওয়া উচিত কি না?"

নন্দবাবু থাপ্পড় খেয়ে ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। এবার গালটা হাতের তেলোয় ঘষতে-ঘষতে উঠে বসে বললেন, "খুব উচিত।"

দুলালবাবু আর একবার ভাল করে নিজের মুখখানা দেখলেন। প্রথমটায় ঘাবড়ে গেলেও বারবার দেখার পর নিজের মুখখানা তাঁর বেশ পছন্দই হল। এর আগে তাঁর যে রোগা, ভাঙা লম্বাটে, বুড়োটে মুখখানা ছিল, সেটা তাঁর বিশেষ পছন্দও ছিল না। তাই আয়নায় মুখ দেখা তিনি প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। মুখখানা দেখতে-দেখতে তিনি খুশি হয়ে একটু হেসেও ফেললেন। তারপর হঠাৎ বুদ্ধি খাটিয়ে বললেন, "কিন্তু পুলিশে দেবেন কাকে? আমি যে কে, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।"

ভুবনবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "পুলিশের ভয়ে ওরকম অনেকেই নিজের পরিচয় গোপন করে। গুঁতোর চোটে নামধাম সবই শেষে বেরিয়ে পড়ে।"

রামলাল একটু ভয়ে-ভয়ে ফের ঘরে ঢুকে বললেন, "তা ছাড়া কাল রাতে কে বা কারা আমাদের ল্যাবরেটরিতে একটা বিস্ফোরণও ঘটিয়েছে। আমার মনে হয়, তাতে আপনার হাত থাকা অসম্ভব নয়। আমার আরও মনে হয়, দুলালবাবু কোনও একটা অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। আর সেটা নষ্ট করার জন্যই আপনি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন।"

দুলালবাবু নিজের মুখ দেখতে-দেখতে বেশ নেশায় পড়ে গেছেন। বাঃ ভারি

ভাল দেখতে লাগছে তো মুখখানা। আর শরীরটাও যেন শক্তপোক্ত দেখাচ্ছে। গায়ে-গতরে যেন শক্তির একটা বন্যা বয়ে যাচ্ছে। হাত-পা নিশপিশ করছে কিছু একটা করে ফেলার জন্য। তিনি সুতরাং হাতের গুলি ফুলিয়ে রামলালের দিকে দু'পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, "কিন্তু আমাকে আটকে রাখবে কে? পুলিশের হাতেই বা তুলে দেবে কে? তুমি নাকি?"

রামলাল সভয়ে দু'পা পেছিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি নন্দবাবুর দিকে আঙুল তুলে বলে উঠলেন, "আমি না, ও।"

"বটে!" বলে দুলালবাবু নন্দলালের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন।

নন্দবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, "আমি মোটেই বলিনি যে, আপনাকে আটকে রাখব। কোন্ দুঃখে বলুন?"

দুলালবাবু একটা হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "পুলিসকে খবর দিয়েছে কে?"

রামলাল কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে উঠলেন, "কেউ দেয়নি। দেওয়ার কথা ভাবিনি পর্যন্ত আমরা।"

নিজের দুই কাপুরুষ সন্তানকে খুব সমালোচকের চোখে লক্ষ করছিলেন ভুবন রায়। তাঁর ছেলে হয়ে এরা যে কেন এত ভীরু আর দুর্বলচিত্ত হল, তা তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না।

কিন্তু ভুবন রায় নিজে কাপুরুষ নন। রীতিমতো সাহসী ও সক্ষম। সুতরাং তিনি বললেন, "দেখুন মশাই, আপনাকে আমিই পুলিশে দেব বলেছি।"

দুলাল সেন হোঃ-হোঃ করে হেসে উঠলেন। তারপর বুক ফুলিয়ে বললেন, "পুলিশ আসার আগেই আমি সরে পড়ছি। যদি পারেন তো আটকানোর চেষ্টা করুন।"

এই বলে দুলালবাবু দরজার দিকে এগোতেই ভুবনবাবু তাঁর মজবুত বেতের লাঠিটা বাগিয়ে পথ আটকালেন। দুলাল সেন অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ভুবন রায়ের হাত থেকে লাঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে স্রেফ দু'হাতের চাপে মটাত করে দুমড়ে ফেললেন। তারপর গটগট করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে হাওয়া হয়ে গেলেন।

নন্দলাল, রামলাল আর ভুবনবাবু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কী বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

ভুবনবাবু যে চটেছেন, তা তাঁর কান দেখলেই বোঝা যায়। ভুবন রায়ের কান তখন নড়ে। ভয়ঙ্কর রেগে গেলেই এটা হয়।

তিনি তাঁর দুই অপদার্থ ছেলের দিকে রোষকষায়িত-লোচনে চেয়ে কিছুক্ষণ

তাঁদের ভস্ম করে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। তারপর অতিশয় শীতল কঠিন গলায় বললেন, "তোমরা অপদার্থ, ভীরু এবং কাপুরুষ। তোমাদের মতো ছেলেকেই শাস্ত্রে কুলাঙ্গার বলা হয়ে থাকে রামলাল!"

"যে আজ্ঞে।"

"দুলালবাবুর লাশ যেভাবেই হোক খুঁজে বের করতে লেগে যাও। মনে রেখো, লাশ পাওয়া না গেলে তোমার অন্নজল বন্ধ, নন্দলাল!"

"আজ্ঞে বলুন।"

"তুমি অত্যন্ত অকর্মণ্য আর বায়ুগ্রস্ত হয়ে পড়ছ। তোমার ভিতরে একটা ভালরকম ওলটপালট দরকার। যাও, নীচে ভিতরের ঘেরা-মাঠে একনাগাড়ে দেড়শো ডিগবাজি খাও। গুনে-গুনে দেড়শো। আমি জানালা নিয়ে নজর রাখব।"

রামলাল আর নন্দলাল দু'জনেই মাথা চুলকোতে লাগলেন। কিন্তু জানেন, ভুবন রায়ের আদেশ অমান্য করলে ঘোরতর সমস্যা দেখা দেবে।

রামলাল কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "ইয়ে আমার মনে হচ্ছে দুলালবাবু মরেননি। কাজেই তাঁর লাশও পাওয়া যাবে না।"

"দুলালবাবু যদি না-ই মরে থাকেন, তবে গেলেন কোথায়?"

রামলাল এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারলেন না। তাই মাথা চুলকোতে-চুলকোতে লাশ খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন।

নন্দবাবু বিরস মুখে ভিতরের ঘেরা-মাঠে নেমে সভয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলেন। ভাইপো-ভাইঝিরা কাছাকাছি আছে কি না। তারপর নিতান্তই অনিচ্ছের সঙ্গে এবং রাগে গরগর করতে করতে ডিগবাজি খেতে শুরু করলেন।

দেখতে-না-দেখতে পিলপিল করে ভাইপো-ভাইঝি, ভাগ্নে-ভাগ্নিরা এসে জুটে গেল চারদিকে। এত বড় একটা মানুষকে প্রকাশ্যে ডিগবাজি খেতে তারা কখনও দ্যাখেনি।

"ও কাকু, তুমি ডিগবাজি খাচ্ছ কেন?"

"কাকু, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?"

"মামা গো, তুমি তো দিব্যি ডিগবাজি খেতে পারো দেখছি!"

নন্দবাবু হাসি-হাসি মুখে করে বললেন, "ডিগবাজি খাওয়া খুব ভাল। সাহেবরা বলে, ডিগবাজিতে স্মৃতিশক্তি বাড়ে, গায়ে জোর হয়, খিদে হয়।

"তা হলে আমরাও খাই?"

"যা-না, খা। যত খুশি খা।"

সঙ্গে-সঙ্গে মাঠময় ডিগবাজির হররা পড়ে গেল। এতে নন্দবাবুর মনের

জ্বালাটা একটু জুড়োল। বেশ ভালই লাগতে লাগল তাঁর। দেড়শোর জায়গায় তিনি ও শ'দুই ডিগবাজি খাবেন বলে মনে-মনে স্থির করে ফেললেন।

ওপরের জানালা দিয়ে দৃশ্যটা খুব মনোযোগ দিয়েই দেখলেন ভুবন রায়। দেখতে-দেখতে তাঁর শৈশবের স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। ডিগবাজি খাওয়া, আর্চ করা, ব্যাঙ-লাফ দেওয়া, কত কী করেছেন ছেলেবেলায়।

ভুবন রায় আর থাকতে পারলেন না। দোতলা থেকে তরতর করে নেমে নাতি-নাতনিদের সঙ্গে ডিগবাজি খেতে শুরু করলেন।

কাণ্ড দেখে নন্দবাবু ভয়ে জড়োসড় হয়ে বললেন, "বাবা, করছেন কি? এই বয়সে ডিগবাজি খাচ্ছেন, কোমর-টোমরে লেগে যাবে যে!"

ভুবন রায় ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "এ তো তোমাদের মতো পলকা কোমর নয়। ভুবন রায়ের কোমরের ওপর ইমারত তোলা যায় বুঝলে! দেখলুম তো, মাত্র দেড়শোটা ডিগবাজি খেতেই তোমার জিভ বেরিয়ে গেল। দেখবে, সত্যিকারের ডিগবাজি কাকে বলে? তবে দ্যাখো।" বলে ভুবনবাবু আবার টপাটপ ডিগবাজি খেতে লাগলেন।

এমন সময় ওপর থেকে একজন দাসী এসে বলল, "কর্তাবাবু আপনার মা আপনাকে আর ডিগবাজি খেতে মানা করে দিয়েছেন।"

ভুবনবাবু মাকে ভক্তিও করেন, ভয়ও খান। সুতরাং ক্ষান্ত দিলেন। নাতি-নাতনিরা ভুবনবাবুকে ভয়ঙ্কর ভয় পায়। তাঁর ডিগবাজি দেখে সবাই হকচকিয়ে

গিয়েছিল। ভুবনবাবু চলে যাওয়ার পর ফের সবাই হল্লা শুরু করে দিল।

একটা ঝোপের আড়াল থেকে রামলাল সন্তর্পণে ভুতোকে ডাকলেন, "ভুতো, ভুতো, শুনে যা বাবা।"

ভুতো একটু অবাক হয়ে এগিয়ে গেল, "কী বলছেন?"

"একটু এদিকে আয়। তোর সঙ্গে একটা গোপন কথা আছে।"

রামলাল ভুতোকে নিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে একগাল হাসলেন।

"তুই বেশ ভাল ছেলে।"

ভুতো এই প্রশংসাবাক্যে খুবই অবাক হল। কারণ, রামলাল বিজ্ঞানের লোক বলে ভুতোকে মোটেই পছন্দ করেন না। ভুতোকে যে পরি নিয়ে গিয়েছিল বা ভুতো যে অনেক সময় অনেক অশৈলী কথা বলে ফেলে, তাকে তিনি বুজরুকি বলেই মনে করেন। আর ভুতো এইসব কারণে রামলালের চক্ষুশূল। কাজেই আজ এই সমাদর দেখে ভুতো মনে-মনে প্রমাদ গুনল।

রামলাল ওপরের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ গলা চুলকোলেন। তারপর বললেন, "বুঝলি ভুতো, আমাদের দুলালবাবু এই ঘরেই রাতে কোনও এক সময়ে, মানে, কী যে হয়েছিল, তা আমি ঠিক জানি না। তবে সকাল থেকে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বুঝলি?"

ভুতো চোখ গোল করে বলল, "ভাল করে খুঁজে দেখেছেন?"

রামলাল মাথা নেড়ে বললেন, "না, খুঁজে এখনও দেখিনি অবশ্য। তবে দেখে লাভও নেই। বলছিলাম কি, ভুতো, তোর তো সব ইয়েটিয়ে আছে শুনতে পাই। ওই কী যেন বলে।"

ভুতো মাথাটা নীচু করে বলল, "আমার কী আছে?"

রামলাল খুব আমতা-আমতা করে বললেন, "আমি হলাম তো বিজ্ঞানের লোক, বুঝলি! আমি ওসব বিশ্বাস-টিশ্বাস করি না।"

ভুতো খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, "বিশ্বাস করার দরকার কী?"

রামলাল গলাটা কষে আবার চুলকে নিয়ে বললেন, "না, মানে, বিশ্বাস না করলেও, বলছিলাম কি, বিজ্ঞানের বাইরেও তো কত জিনিস আছে। আমরা আর কতটুকু খবর রাখি বল।"

ভুতো মাথা নেড়ে বলল, "বিজ্ঞানের বাইরে আবার কী থাকবে?"

রামলাল ভুতোর ঘাড়ে হাত রেখে মিষ্টি করে একটু হেসে বললেন, "বলছিলাম কি, যদি দুলালবাবুর একটা হদিস তোর ওই পরিরা দিতে পারে, তবে বড় ভাল হবে।"

ভুতো অবাক হয়ে বলল, "দুলালবাবুর জন্য পরিদের ডাকাডাকি করে কী হবে? আমরা সবাই মিলে খুঁজে ধরে নিয়ে আসছি।"

রামলাল কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন, "তাহলে খুব ভাল হয় বাবা। জ্যান্ত বা মরা যে-কোনও অবস্থাতেই তাকে খুঁজে পাওয়াটা খুব দরকার। নইলে আমাকে কাঠ-উপোস করে থাকতে হবে।"

ডিগবাজি খেয়ে ভুবন রায়ের মনটা বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠল। তিনি ভাবলেন, পাঁচু মোদক যদিও চোর এবং অনধিকার অনুপ্রবেশকারী তবু অতিথি তো! একটু খোঁজখবর নেওয়া দরকার।

তিনি যখন তালা খুলে নীচের তলার অন্ধকার ঘরখানায় গিয়ে ঢুকলেন, তখন হাতে লাঠিটা বাগিয়ে ধরা। ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করলে বা পালাতে চেষ্টা করলে কাজে লাগবে।

ঘরে ঢুকে দেখলেন, পাঁচু মোদক মেঝের ওপর শুয়ে ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। তবে সাড়া পেয়ে উঠে বসল। পালানোর কোনও চেষ্টাই করল না। প্রকাণ্ড হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "সারারাত বিস্তর ধকল গেছে মশাই, কাঁচা ঘুমটা কি না ভাঙালেই চলত না?"

ভুবন রায়ের সঙ্গে এরকমভাবে কেউ কথা বলে না। কাজেই তিনি একটু দমে গিয়ে বললেন, "তোমাকে তো ঘুমনোর জন্য ধরে রাখা হয়নি।"

পাঁচু মোদক 'ফুঃ' শব্দ করে গা থেকে ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল, "ধরে তো রেখেছেন কচু। জানালার তিনটে শিক নড়বড় করছে, পশ্চিমের দেওয়ালটা এক জায়গায় নোনা ধরে ঝুরঝুরে হয়ে আছে। পাঁচুকে ধরে রাখা অত সহজ নয় মশাই। ইচ্ছে করলেই পালাতে পারতুম। শুধু পাগলা-বাবুটির খবর না নিয়ে যেতে ইচ্ছে করল না বলেই এখনও আছি।"

"বটে!"

পাঁচু মাথা নেড়ে বলল, "তা বাবু, এটা কি ভিখিরির বাড়ি, নাকি হাড়-কেপ্পনের আড্ডা?"

"কেন বলো তো?"

"সকাল থেকে দাঁতে দানাটা কাটিনি, কেউ একটু খবরও নিল না মশাই। এটা কী রকম ব্যবহার আপনাদের?"

ভুবন রায় এবার লজ্জিত হলেন। চোর-ছ্যাঁচড় যাই হোক, একটু তদারক করা দরকার ছিল।

ভুবন রায় বললেন, "কিছু মনে করো না বাপু, ঝামেলায় একটু দেরিই হয়ে গেছে। বোসো, জলখাবারের ব্যবস্থা হচ্ছে।"

পাঁচু গম্ভীর গলায় বলল, "একটু মোটা ব্যবস্থাই করবেন। গরিবের খিদে একটু বেশি কিনা।"

ভুবন রায় কাজের লোকদের ডাকাডাকি করলেন। জলখাবারের হুকুম হল। এবং একটু বাদে ছ'খানা গরম রুটি আর আলু-কপির তরকারি সাজিয়ে দেওয়া হল পাঁচুর সামনে।

পাঁচু হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "ছ'খানা! ছ'খানা! উরে বাবা, হাসতে-হাসতে মরে যাব। এ যে আমার চেয়ে গরিব লোকের বাড়ি, অ্যাঁ!

ভুবন রায় উত্তেজিত হয়ে বললেন, "এটা কি মামার বাড়ি নাকি হে বেয়াদব? ওই ছ'খানার বেশি একখানাও আর নয়। বেশি খাওয়া আমি একদম পছন্দ করি না।"

পাঁচু আর দ্বিরুক্তি না করে খাওয়া শুরু করে দিল। বলল, "একটু চা পাব তো কর্তাবাবু? বেশ বড় এক গেলাস? চায়ে অভ্যেস অবশ্য আমার নেই। দুধই খাই, তা আপনাদের মতো কেপ্পনের বাড়িতে তো আর দুধের আশা নেই। চা দিয়েই চালাতে হবে। তবে একটু যেন বেশি করে দুধ দিয়ে করে, দেখবেন।"

খাওয়া শেষ করার পর চায়ের গেলাসটি হাতে নিয়ে পাঁচু খুব ভাবুকের মতো ভুবনবাবুর দিকে চাইল।

ভুবনবাবু আগাগোড়া তার হাবভাব তীক্ষ্ণ নজরে দেখে নিচ্ছিলেন। লোকটাকে তাঁর খুব উঁচুদরের ঘড়েল বলে মনে হচ্ছিল। অমায়িক, কিন্তু সাঙ্ঘাতিক ধূর্ত।

ভুবনবাবু গলাখাঁকারি দিয়ে তৈরি হলেন। বললেন, "দ্যাখো বাপু, তুমি অত্যন্ত পাজি লোক। তোমার ব্যবস্থা পরে হবে। কিন্তু তোমার শাগরেদটির পরিচয় আমাদের আগে দরকার।"

পাঁচু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "বললে প্রত্যয় হবে না, কিন্তু আমার শাগরেদ-টাগরেদ নেই। আগে দু-চারজনকে শাগরেদ করে খুব শিক্ষা হয়েছে কিনা, শিখিয়ে-পড়িয়ে যেই মানুষ করলাম অমনি যে-যার নিজের পথ দেখল। তারপর মশাই সেই শাগরেদদের সঙ্গেই পাল্লা টানতে হল। একবার তো গোপেশ্বর ঘটকের ঠাকুরদালানে সেঁদিয়েছি, অমনি যণ্ডা দারোয়ানটা মহা শোরগোল তুলল। তখন করি কী? তাড়াতাড়ি কুম্ভক করে একেবারে ব্যাঙের মতো চ্যাপটা হয়ে বিগ্রহের সিংহাসনের তলায়, মশাই কী বলব, বেড়ালেরও যেখানে সেঁধোবার জায়গা নেই সেখানে ঘাপটি মারতে গিয়ে দেখি আর- এক মক্কেলও সেখানে কুম্ভক করে পড়ে আছে। কার এত ক্ষমতা দেখতে গিয়ে কী দেখলুম জানেন? আমারই এক

শাগরেদ। বড় ঘেন্না হল মশাই জীবনটার ওপর। একবার তো ঠিক করেই ফেললুম যে, এ-ব্যবসা আর নয়। কিন্তু নেশাটা এমন যে....''

''তা হলে লোকটি কে?''

পাঁচু চা শেষ করে একটা ঢেকুর তুলে বলল, ''মিষ্টিটা বড্ড কম দিয়েছেন, আর দুধটাও বড্ড টানটান। এ চা কি ভদ্দরলোকে খেতে পারে? আমাদের চা হবে একেবারে গুড়ে গরগরে, দুধের সর ভাসবে আর চায়ের ক্বাথটিও হবে বেশ ঘন, তবে চা?''

ভুবনবাবু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলেন তারপর বললেন, ''এবার আসল কথায় এস বাপু। বাবুটি কে?''

''আজ্ঞে তা তো আপনাদেরই জানবার কথা। আপনাদের গোয়ালঘরে ভুল করে ঢুকে পড়ে ভারি কেলেঙ্কারিতে পড়ে গিয়েছিলুম। সেইখানে বাবুটিও পড়েছিলেন। ঘরে কেমন যেন বিদ্‌ঘুটে একটা গন্ধ, আর ধোঁয়াটে ভাব। হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে আমাকে এমন ধরলেন যে, প্রাণ যায় আর কি। দেখলুম, বাবুটি বোকাসোকা ভালমন্দ গোছের, গোবরগণেশই বলা যায়, ছিটিয়ালও বটেন। কিন্তু মানুষটি বেশ ভদ্র, নিজের নামই তাঁর মনে নেই। আমার বড় কম ধকল যায়নি মশাই বাবুটিকে নিয়ে। তার একটা নাম দিতে হল, কাজটাজও শেখাতে হল, তারপর তো সবই জানেন।''

''তা হলে বাবুটিকে তুমি চেনো না?''

পাঁচু মাথা চুলকে বলল, ''একেবারে চিনি না বলাটা কী ঠিক হবে। মুখখানা চেনাই বটে, তবে নামধাম জানি না। আমার আবার বড়লোকদের সঙ্গে কারবার। গরিব গুর্বোদের তত্ত্ব খুব বেশি জানা নেই। বাবুটি বোধহয় মাস্টারি-টাস্টারি কিছু করতেন।

ভুবনবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, ''ভিজে বেড়াল। যাকগে, প্রশ্ন হল, সেই মাস্টারমশাই গেলেন কোথায়? তাঁকে তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে আর একটা লোক কোথা থেকে এসে উদয় হয়েছিল, রীতিমত গুণ্ডা প্রকৃতির। লোকটা পালিয়ে গেছে। এই দু'নম্বর লোকটা কে?''

''আজ্ঞে, আমি দু'নম্বরদের কথা কিছু জানি না।''

''খুব জানো। না জানলে চলবে কী করে? এই গুণ্ডা লোকটা দুলালবাবুকে হয় গুম না হয় খুন করেছে।''

পাঁচু মাথা নেড়ে বলল, ''অঙ্কটা মিলছে না।''

''তার মানে?''

পাঁচু একগাল হেসে বলল, "আপনারা লেখাপড়া জানা লোক তো! তা লেখাপড়া জানা লোকদের একটা ভারি মুশকিল হয়। তারা নিজেদের বুদ্ধি তেমন খাটাতে পারে না। মাথাটা অন্য সব পণ্ডিতদের কাছে বাঁধা রাখা থাকে তো! আপনারা হলেন সব লেখাপড়া-জানা লোক! আমাদের মাথায় ওসব আজেবাজে আগডম-বাগডম জিনিস নেই। যা পাবেন তা খাঁটি জিনিস।"

"আচ্ছা বেয়াদব তো।"

পাঁচু গম্ভীর হয়ে বলল, "তা আজ্ঞে বেয়াদবি হয়তো একটু হচ্ছে। কিন্তু আপনাদের বুদ্ধিরও বলিহারি যাই। দুটো লোককে আপনারা পেলেন কোথায়? লোক তো একটাই। আপনাদের চোখের সামনেই লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। তারপর যখন পাশ ফিরল তখন সেই লোকটাই অন্য লোক হয়ে গেল কীভাবে?"

ভুবনবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "আমাদের দুলালবাবু মোটেই চোর ছিলেন না। গুণ্ডা তো হওয়ার উপায়ই তাঁর নেই। তা ছাড়া ওরকম হাবভাব আর হাতের গুলিও তার কস্মিনকালে ছিল না। সুতরাং আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয় হে। লোক দুটোই ছিল। একজন দুলালবাবু, অন্যজন তোমার শাগরেদ।"

পাঁচু মাথাটা নেড়ে-নেড়ে খানিকক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, "না মশাই, অঙ্কটা ঠিকঠাক মিলছে না। আমাকেই মেলাতে হবে। এসব আপনাদের কর্ম নয়। বাবুটিকে খুঁজে তো আগে বার করি।"

"তার মানে? তোমাকে কি আমি ছেড়ে দিচ্ছি নাকি? মোটেই ভেবো না যে, চালাকি করে পালাবে। পুলিশ আসছে।"

পাঁচু মিষ্টি করে হেসে বলল, "এজন্যই তো লেখাপড়া-জানা লোকদের কিচ্ছু হয় না। মাথাটা খেলে না কিনা। পাঁচু মোদক কি এতই সোজা লোক মশাই? পুলিশ ডেকে তাকে ধরাবেন! গত ষাট বছরে এই শর্মা একবারও পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি, তা জানেন?"

ভুবন রায় ভারি অবাক হলেন। ডাকসাইটে ভুবন রায়ের মুখের ওপর কথা বলার মতো বুকের পাটাওয়ালা লোক তা হলে এখনও এই শহরে আছে? তাও আবার একটা ছিঁচকে চোর! এত অবাক হলেন যে, তিনি কথাই বলতে পারলেন না।

পাঁচু মোদক যথেষ্ট অভিমান-ভরা গলায় বলল, "এইরকম ঘরে আটকে রেখে আপনারা আমাকে কী অপমানটাই না করলেন। পাঁচু মোদককে আটকাতে হলে লোহার ঘর লাগে মশাই। তাও পেরে উঠবেন না। লোহা কেটে পাঁচু ঠিক পালাবে। আমি তো লজ্জায় অধোবদন হয়ে আছি তখন থেকে। মনে-মনে ভাবছি, ওরে

পাঁচু, তোর হল কী? তোকে যে এরা কুকুর-বেড়ালের সমান জ্ঞান করছে!”

ভুবনবাবুর গলাখাঁকরি দিয়ে বললেন, “বেশি কথা বলার দরকার নেই। পুলিশ আসছে। যা বলার তাদের কাছে বোলো।”

“পুলিশের সঙ্গে কথা! ও-বাবা। পুলিশের সঙ্গে কথা বলা গুরুর বারণ। বললে আঠারোবার গঙ্গাস্নান করতে হবে। তা বাবু, পেন্নাম হই, আজকের মতো বিদেয় হচ্ছি।”

এই বলে পাঁচু উঠে দাঁড়াল।

ভুবনবাবু কিছু বুঝে উঠবার আগেই পাঁচু একটা বেড়ালের মতো লাফ দিয়ে জানালায় উঠে চোখের পলকে দু'খানা শিক সরিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ল।

ভুবনবাবু চেঁচাতে লাগলেন, “পালাল! পালাল! ধর রে তোরা, ধর!”

চেঁচানিতে লোকজন ছুটে এল। কিন্তু ঘটনাটা কী ঘটেছে; তা বুঝতে যে সময়টা গেল, তাতে পাঁচু মোদকের একেবারে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাওয়ার কথা। তবু লোকে লাঠিসোঁটা আর দড়িদড়া নিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে বেরিয়ে পড়ল।

রামলাল তাঁর বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, “ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন। ওইসব ডেনজারাস লোক যত দূরে থাকে ততই ভাল।”

ভুবনবাবু খ্যাঁক করে উঠলেন, “কাপুরুষের মতো কথা বোলো না। লোকটাকে আমাদের পুলিশের হাতে দেওয়া উচিত ছিল। তোমরা এতগুলো লোক থাকতেও দিনে-দুপুরে সকলের চোখের সামনে দিয়ে একটা জলজ্যান্ত লোক কী করে গায়েব হয়ে যায়, বলতে পারো?”

“লোকটা বোধহয় কোনও ম্যাজিক-ট্যাজিক জানে। কালাচাঁদ সাধু তো দিনে-দুপুরে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। সেইরকমই কিছু....”

ভুবনবাবু ছেলের দিকে কটমট করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, “এই তোমার বিজ্ঞানমনস্কতা? তুকতাক, মাদুলি-কবচ, ভূত-প্রেত এইসব যদি বিশ্বাস করতে শুরু করো, তাহলে কী হবে জানো? তোমার ল্যাবরেটরিতে ক'দিন পরে ঘাস গজাবে। হুঁ, উনি আবার বিজ্ঞানী! কুলাঙ্গার কোথাকার!”

রামলাল এই ভর্ৎসনায় খুবই লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করলেন।

কিন্তু কথাটা নন্দবাবুর খুব লাগল। তিনি যদিও বাবাকে খুবই ভয় পান, কিন্তু তুকতাক ভূত-প্রেত ইত্যাদির অপমান ঠিক হজম করতে পারলেন না খুবই বিনীতভাবে তিনি বললেন, “কিন্তু বাবা, ওসবই আছে।”

ভুবনবাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, “কী আছে বললে?”

নন্দবাবু আমতা-আমতা করে বললেন, “আজ্ঞে স্বচক্ষেই দেখেছি যে...”

নন্দবাবু ভুবনবাবুর ভাবসাব দেখে দু'পা পিছু হটে বললেন, "আমাদের ভৌত-ক্লাবের অনেকেই কিন্তু দেখেছে।"

ভুবনবাবু আর একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, "ভৌত-ক্লাব! কতগুলো পাগল আর ইডিয়ট মিলে একটা গাঁজাখুরি আড্ডা বসিয়েছে, আর তাদের সব গুল-গল্প আমাকে বিশ্বাস করতে হবে! তোমার অধঃপতন দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। ভূত-প্রেত নিয়ে মানুষ কখন মাথা ঘামায় জানো? যখন তার হাতে কোনও কাজ থাকে না। কাজের লোকেরা কখনও বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। বহুদিন নিষ্কর্মা বসে থেকে-থেকে তোমার মাথাটাই অকেজো হয়ে গেছে।"

নন্দবাবু এই অভিযোগের কোনও সদুত্তর খুঁজে পেলেন না। আসলে বলার মতো অনেক কথাই আছে, তবে সেগুলো এখন বললে ভুবন রায় তাঁকে ছিঁড়ে ফেলবেন।

ভুবন রায় তাঁর দুই অপদার্থ পুত্রের দিকে বাঘা চোখে নীরবে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, "পাঁচু মোদক, তার শাগরেদ আর আমাদের দুলালবাবু— এই তিনজন লোককে খুঁজে বের করা খুবই জরুরি। যদিও আমাদের তেমন কিছু চুরি যায়নি এবং খুনখারাবি বা মারদাঙ্গাও হয়নি, কিন্তু এসব ছোটখাটো ব্যাপারকে উপেক্ষা করলে ভবিষ্যতে বিপদে পড়তে হবে। আমার তো ঘোর সন্দেহ হচ্ছে, গত কিছুদিন যাবৎ আমি যেসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছি, সেগুলোর ফর্মুলা বাগানোর জন্যই দুষ্টু লোকের আনাগোনা শুরু হয়েছে।"

এই সময়ে ভুবন রায়ের তৃতীয় পুত্র শ্যামলাল এসে ঘরে ঢুকল।

শ্যামলালকে বাইরে থেকে বুঝে ওঠা খুবই শক্ত। কারণ শ্যামলাল কথাবার্তা খুবই কম বলে। তার বয়স পঁচিশের মধ্যেই। এই বয়সেই সে এমন গম্ভীর হয়ে থাকে যে, তাকে ছেলেমানুষ বলে মনে হয় না। সে মাঝে-মাঝে কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায় এবং কখনও-কখনও এক-দেড় মাস পর হঠাৎ আবার ফিরে আসে। ভুবন রায় প্রথম-প্রথম তাকে খুবই শাসন করতেন। কিন্তু শ্যামলাল নীরবে শাসন-মারধর বকাঝকা সহ্য করে যায়, কখনও প্রতিবাদ করে না, এবং সে কোথায় যায় তাও কাউকে বলে না। ভুবন রায় তাঁর এই রহস্যময় ছেলেটিকে বিশেষ পছন্দ করেন না বটে, কিন্তু ঘাঁটানও না। দিন-পনেরো আগে শ্যামলাল উধাও হয়ে গিয়েছিল।

ভুবন রায় শ্যামলালের দিকে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থেকে বললেন, "তুমি আবার কোথা থেকে উদয় হলে?"

শ্যামলাল জবাব দিল না, নীরবে চেয়ে রইল।

ভুবন রায় বললেন, "তোমরা এক-একজন এক -একরকম। বাড়িটা ক্রমেই চিড়িয়াখানা হয়ে উঠছে। যাকগে, তোমরা এখন যে যার কাজে যাও। আমি ল্যাবরেটরিতে গিয়ে এখন বিজ্ঞানচর্চা করব, বিজ্ঞান নিয়ে বসে থাকলে মাথায় বাজে জিনিস ঢুকতে পারে না।"

শ্যামলাল হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, "আমার একটা কথা ছিল।"

"কী কথা?"

" আপনি একটা ভুল করছেন।"

ভুবন রায় এমন অবাক বহুকাল হননি। চোখ গোল করে বললেন, "ভুল! আমি!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি বলছেন কাল রাতে আমাদের বাড়িতে দু'জন চোর ঢুকেছিল। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়।"

"তার মানে?"

"চোর একজনই ঢুকেছিল। সে পাঁচু মোদক। দ্বিতীয় লোকটা দুলালবাবু। আপনি দুলালবাবুকে চিনতেও পেরেছিলেন, কিন্তু তবু কেন কে জানে তাকে ফের অন্য একটা লোক বলে ধরে নিচ্ছেন।"

ভুবন রায় খুবই অবাক হয়ে বললেন, "রাতের বেলা তাঁকে আমি দুলালবাবু বলে ভুল করেছিলাম ঠিকই। কিন্তু সকালের আলোয় দেখলাম লোকটার বয়স অনেক কম, দিব্যি তাগড়া চেহারা আর হাবভাবও অন্যরকম।"

"ঠিকই দেখেছেন। আমাদের রোগাভোগা দুলালবাবুরই এটা অন্য চেহারা।"

"বলো কী? তুমি কি বলতে চাও যে, দুলালবাবু নিজের চেহারা পালটে ফেলতে পারেন? এই বিজ্ঞানের যুগে কি ওসব বুজরুকি চলে?"

শ্যামলাল মাথা নেড়ে বলল, "আমি বিজ্ঞানের বিষয়ে কিছুই জানি না। তবে বিজ্ঞানও নানারকম ভেলকি দেখাতে পারে। লোকটা যে দুলালবাবুই, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

"তুমি কী করে বুঝলে?"

"আমি নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখেছি।"

"কী দেখেছ?"

"আপনি তো জানেন যে, আমি পনেরো দিন আগে নিরুদ্দেশ হয়ে যাই। কাল অনেক রাতে আমি ফিরে এসেছি। কিন্তু এসে প্রথমে বাড়ির মধ্যে না ঢুকে ল্যাবরেটরির দিকে যাই। কারণ ল্যাবরেটরিতে একটা অদ্ভুত আলো দেখা যাচ্ছিল।"

"বটে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু আলোই নয়, ল্যাবরেটরি থেকে একটি রঙিন ধোঁয়াও বেরোচ্ছিল। আমি গিয়ে কাচের শার্শি দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, দুলালবাবু মেঝের ওপর পড়ে আছেন। আমি চট করে ঢুকতে ভরসা পাইনি। ভয় হয়েছিল, ওই গ্যাসটা বোধহয় বিষাক্ত। তাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি ল্যাবরেটরিতে ঢুকে দুলালবাবুকে পরীক্ষা করে দেখলাম, উনি মারা যাননি। তবে নাড়ির গতি বেশ বেশি ছিল। মাঝে-মাঝে কেমন যেন কেঁপে-কেঁপে উঠছিলেন।"

ভুবনবাবু এবার ব্যগ্র হয়ে বললেন, "তারপর?"

"তারপর এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখলাম। আমার চোখের সামনে দুলালবাবুর চেহারার মধ্যে একটা পরিবর্তন ফুটে উঠতে লাগল।"

"কী রকম পরিবর্তন?"

"প্রথমে দেখলাম, দুলালবাবুর মুখের চামড়ায় যে-সব ভাঁজটাজ ছিল, সেগুলো মিলিয়ে গিয়ে চামড়াটা বেশ টান-টান হয়ে উঠছে। রোগা শরীরটার মাসলগুলো যেন ঠেলে উঠতে চাইছে। আর বয়সটা যেন বেশ কমে যাচ্ছে।"

"বলো কী?"

"আজ্ঞে যা বলছি সব সত্যি। নিজের চোখে দেখা।"

"তখন তুমি কী করলে?"

"প্রথমে ভুতুড়ে কাণ্ড ভেবে একটু ভড়কে গিয়েছিলাম। তারপর মনে পড়ল, ল্যাবরেটরিতে আমি একটা আলো আর ধোঁয়া দেখেছি। তাই উঠে গিয়ে টেবিলের ওপরটা ভাল করে দেখলাম।"

"কিছু পেলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। মনে হল, একটা ছোটখাটো বিস্ফোরণের মতো কিছু ঘটে গেছে। একটা টেস্টটিউবের মধ্যে একটা জিনিস দেখে খুবই অবাক হলাম। সেটা থেকে তখনও একটা বিকিরণ বেরিয়ে আসছিল। অবশ্য দেখতে-দেখতেই সেটা মিলিয়ে গেল। তবু আমি টেবিলের ওপরে রাখা ভাঙা শিশিগুলো পরীক্ষা করে দেখলাম। আমার মনে হল, দুলালবাবু কোনও একটা এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন।"

"বটে!" ভুবনবাবুর চোখে-মুখে রীতিমত আলো ফুটে উঠল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। দুলালবাবু বোধহয় যৌবন ফিরে পাওয়ার কোনও ফর্মুলা আবিষ্কার করে ফেলেছেন। শিশিগুলো অধিকাংশই পুড়ে কালো হয়ে গেছে। তবে আমি কয়েকটা শিশির লেবেল থেকে কেমিক্যালগুলোর নাম টুকে নিতে পেরেছি। বাকিগুলো পারিনি।

ভুবনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "এ তো যুগান্তকারী ঘটনা।"

শ্যামলাল বলল, "যে আজ্ঞে। তবে দুলালবাবু ছাড়া এই ঘটনা বোধহয় আর

ঘটানো যাবে না। কারণ অন্তত সাত-আটটা শিশি-বোতল একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।''

ভুবনবাবু বিজ্ঞের মতো হেসে বললেন, ''কুছ পরোয়া নেই। কোন কোন শিশি কাজে লাগানো হয়েছিল, তা অনায়াসে বাই সিম্পল প্রসেস অব এলিমিনেশন বের করা যাবে। আমাদের কাছে সব কেমিক্যালের লিস্ট করা আছে। যেগুলো পাওয়া যাবে না সেগুলোই কাজে লাগানো হয়েছে বলে ধরতে হবে।''

''যে আজ্ঞে।''

''তোমাকে যতটা গবেট মনে করতাম, শ্যামলাল, তুমি বোধহয় ততটা নও। যাকগে, এখন ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ব্যাপারটা দেখি।''

দুলাল সেন ভুবনবাবুর বাড়ি থেকে সেই যে বেরিয়ে এসেছিলেন, তারপর থেকেই তাঁর একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে, তিনি আর আগেকার দুলাল সেন নন। আবার পুরনো দুলাল সেনকে যে মন থেকে তাড়াবেন তাও পারছেন না। ফলে এখন একটা মানুষের মধ্যেই দু-দুটো মানুষ ঢুকে বসে আছে।

সবেগে রাস্তা দিয়ে সোজা অনেকটা হাঁটলেন দুলালবাবু। আসলে তাঁর যাওয়ার কোনও তেমন জায়গা নেই। তাঁর তৈজপত্র বলতে যা-কিছু তা হল একটা টিনের সুটকেস আর শতরঞ্চিতে বাঁধা বিছানা। তা সে-দুটো ভুবনবাবুর ল্যাবরেটরিতেই পড়ে আছে, উদ্ধার করার কোনও আশা আপাতত নেই। সেখানে নিশ্চয়ই এতক্ষণে পুলিশ গিসগিস করছে। তবে দুলালবাবু জিনিসপত্রের জন্য বিশেষ চিন্তিত নন। তাঁর এখন প্রধান চিন্তা হল, নিজের ভিতর দু-দুটো মানুষকে তিনি সামলাবেন কী করে?

ভেবেচিন্তে তিনি দেখছেন যে তাঁর ভিতরে একটা হল সাবেক দুলাল। সে লোকটা নিরীহ, শান্ত, ভালমানুষ, ভিতু, বুড়োটে। আর একটা হল নতুন দুলাল। সে মহা চ্যাংড়া, গুণ্ডা, ফচকে, ইয়ারবাজ, সাহসী, মারকুট্টে। ফলে দুই দুলালে বনিবনা হচ্ছে না।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে তিনি স্পষ্ট টের পাচ্ছিলেন, তাঁর ভিতরকার সাবেক দুলাল আর নতুন দুলালের মধ্যে বেশ-একটা ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি লেগে পড়েছে। তবে নতুন দুলালের মধ্যে মসমস করছে জোর আর তেজ।

দুলালবাবু হঠাৎ রাস্তা থেকে একটা আধলা ইট তুলে নিয়ে হালদারবাবুর টিনের চালে ধাঁই করে ছুঁড়ে মারলেন। পিলে চমকে দেওয়ার মতো শব্দ হল।

দুলালবাবুর ভিতরকার সাবেক দুলাল হাঁ-হাঁ করে বলে উঠল, "এসব কী হচ্ছে? এসব তো মহা অন্যায় কাজ! এ যে ঘোরতর দুষ্টুমি!"

নতুন দুলাল জবাবে বলে উঠল, "রাখো, রাখো, তোমার ভালমানুষি। এই হালদার তোমার অভাবের সময় নিজের গবেট ছেলেকে চার মাস পড়িয়ে নিয়ে মাত্র এগারো টাকা ঠেকিয়েছিল, তা মনে আছে হে!"

"আহা, তাতে কী! বিদ্যাদান মহা পুণ্যকর্ম। টাকা-পয়সা কিছু নয়।"

"নয় মানে? টাকা-পয়সা কিছু নয় বললেই হল? এখন পকেটে গোটা-দশেক টাকা থাকলে নবীন ময়রার দোকানে বসে গরম-গরম কচুরি আর হালুয়া খাওয়া যেত না?"

এদিকে চালে ঢিল পড়ায় খিটকেল হালদারবাবু রে-রে করে তেড়ে বেরিয়ে এলেন। এসে দুলালবাবুকে দেখে তাজ্জব। আমতা-আমতা করে বললেন, "দুলালবাবু যে! তা ঢিলটা কে মারল দেখেছেন নাকি?"

দুলালবাবু বুকটা একটু চিতিয়ে বললেন, "আমিই মেরেছি। আপনি লোকটা খুবই খারাপ। ভীষণ রকমের খারাপ।"

হালদার চোখ পাকিয়ে বললেন, "বটে! কে বলল আমি খারাপ?"

"আমিই বলছি।"

"আপনার তো খুব তেল হয়েছে দেখছি!"

"মুখ সামলে কথা কইবেন।"

"বটে! না হলে কী করবেন শুনি!"

দুলালবাবু আর একটা ইট তুলে নিলেন। তাঁর বিবেক বলল বটে যে, 'কাজটা ঠিক হচ্ছে না,' তবু ধাঁই করে সেটাও টিনের চালে মারলেন তিনি।

হালদারবাবু এক লাফে এসে দুলালবাবুর টুঁটি টিপে ধরলেন। কিন্তু নতুন দুলালের সঙ্গে পারবেন কেন? দুলালবাবু এক ঘুসিতে তাঁকে সাত হাত দূরে ছিটকে ফেলে হাঃহাঃ করে হেসে উঠলেন।

ওদিকে হালদারের ছেলে শিবু বেরিয়ে এসে বাপের হেনস্তা দেখে আর থাকতে পারল না। সে মহা গুণ্ডা প্রকৃতির। ছুটে এসে সে দুলালবাবুকে জাপটে ধরে বলল, "স্যার, আপনাকে আমি মারব না, শত হলেও মাস্টারমশাই, কিন্তু পুলিশের হাতে তুলে দেব।"

দুলালবাবু ফের অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে শিবুকে স্রেফ বেড়ালছানার মতো তুলে দূরে ছুঁড়ে দিলেন।

এই কাণ্ড দেখে চারদিক থেকে লোকজন ছুটে আসতে লাগল। দুলালবাবু আর দাঁড়ালেন না। তাড়াতাড়ি অন্য রাস্তায় ঢুকে ছুটতে ছুটতে ভিন পাড়ায় চলে

এলেন। তাঁর বেশ ফুর্তি লাগছিল। নাঃ, এতদিনে বেঁচে থাকাটাকে প্রথম উপভোগ করা যাচ্ছে।

এই পাড়াতে ফটিকবাবুর বাস। ফটিকবাবুর সঙ্গে একসময়ে খুব দহরম-মহরম ছিল। সেই সময় একদিন ফটিক তাঁর কাছ থেকে দশটা টাকা ধার নিয়েছিল। এতকাল ঘটনাটা খেয়াল ছিল না দুলালবাবুর। এখন স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়ে ওঠায় মনে পড়ে গেল।

তিনি সোজা গিয়ে ফটিকের দরজায় কড়া নাড়তে-নাড়তে হেঁড়ে গলায় ডাকলেন, "ফটিক! ফটিক!"

ফটিকবাবু ঘুম থেকে উঠলেও ভাল করে ঘুমের রেশ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। গতকাল রাতে ভূতের খোঁজে মহানন্দ কাপালিকের ডেরায় রাত তিনটে অবধি ধরনা দিয়ে বসে ছিলেন। ভূত দেখতে পাননি। তাই মেজাজটাও খিঁচড়ে আছে। তাঁর শালা খুব ঠেস দিয়ে কথা বলছে আজকাল। বাজিটা একরকম হেরেই গেছেন বলা যায়।

দুলাল সেনকে দেখে তিনি বিশেষ আহ্লাদিত হলেন না। হাই তুলে বললেন, "দুলালদা যে! এত সকালে কী মনে করে?"

"বছর-পাঁচেক আগে তুমি দশটা টাকা ধার নিয়ে আর শোধ দাওনি। আমি এখন গরম কচুরি খেতে যাচ্ছি, বড্ড খিদে পেয়েছে। দশটা টাকা দাও।"

ফটিকবাবু একটু কৃপণ লোক। চোখ কপালে তুলে বললেন, "দশটা টাকা! ধার! এসব কী বলছ দুলালদা? আমার তো মনে নেই!"

"চোপ," দুলাল সেন একটা পেল্লায় ধমক দিয়ে বললেন, "তোমার মনে না থাকলেও আমার আছে। টাকাটা দাও শিগগির।

ফটিকবাবু কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে খানিকক্ষণ দুলালবাবুর দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "উঁহু, তুমি তো দুলালবাবু নও হে চাঁদু? আমাদের দুলাল সেন রোগা-ভোগা মাস্টার-মানুষ, তার এত তেজ নেই। তোমাকে দেখতে খানিকটা ওরকম হলেও সে তো নও!"

দুলালবাবুর এই ভয়টাই ছিল। তাঁর চেহারায় দুলালবাবুর আদল থাকলেও একটা মস্ত পরিবর্তনও যে ঘটে গেছে, তা তিনি বেশ টের পাচ্ছেন। কিন্তু তা বলে তা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য। তার ওপর প্রচণ্ড খিদেও পেয়েছে। ভ্যাজর-ভ্যাজর করলে তো চলবে না।

দুলালবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "সোজা আঙুলে যে ঘি উঠবে না, তা আমি আগেই জানতুম হে। আমি মুখচোরা আর লাজুক মানুষ বলে তোমরা খুব জো পেয়ে গেছ, না? এবার শঠে শাঠ্যং। আমি আর সেই সাবেক দুলাল নই। টাকাটা ছাড়বে কি না!"

ফটিকবাবু হঠাৎ "বাঁচাও, বাঁচাও, ডাকাত! ডাকাত! বলে বিকট চেঁচাতে লাগলেন।

দুলালবাবু খপ করে ফটিকবাবুর মুখটা চেপে ধরে অন্য হাতে পটাং করে একটা চড় কষালেন তাঁর গালে। ফটিকবাবু চোখে অন্ধকার দেখে বসে পড়লেন।

দুলাল সেন ঘরে ঢুকে বালিশের পাশে রাখা ফটিকবাবুর মানিব্যাগ থেকে দশটা টাকা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। ফটিকবাবুর উদ্দেশে বললেন, "দশটা টাকাই নিলাম, এই দেখে রাখো। সুদ ধরলেও পাঁচ বছরে আরও গোটা পাঁচেক টাকা বেশি হয়। কিন্তু আমি সুদখোর নই বলে শুধু আসলটা নিয়েই ছেড়ে দিচ্ছি।"

আর কোনওদিকে দৃকপাত না করে দুলালবাবু সটান গিয়ে ময়রার দোকানে হাজির হলেন। গরম কচুরির গন্ধে জায়গাটা মাত হয়ে আছে।

দুলালবাবু বাজখাঁই গলায় হুকুম দিলেন, "দশটা কচুরি আর এক পোয়া হালুয়া।"

নবীন ময়রা দুলালবাবুকে চেনে। নিতান্তই পেটরোগা গোবেচারা মানুষ। জীবনে কেউ তাঁকে দোকানে বসে কুপথ্য করতে দ্যাখেনি। তার ওপর মানুষটার হাবভাবও যেন কেমন-কেমন!

কচুরি ক'টা স্রেফ দু'মিনিটে উড়িয়ে এবং হালুয়া এক মিনিটে নস্যাৎ করে দুলালবাবু উঠে আড়মোড়া ভেঙে বললেন, "না, এসব হালকা-পলকা জিনিসে কি পেট ভরে?"

নবীন ময়রার হঠাৎ দয়া হল। বলল, "মাস্টারমশাই, আপনি যে কচুরি ভালবাসেন তা তো জানতাম না। আচ্ছা, আপনি বসুন, পেট ভরে যা খুশি খান, আজ আপনাকে দাম দিতে হবে না। আপনার চেষ্টাতেই না গবেট ছেলে রেমো পাশ করতে পেরেছিল। ওরে, মাস্টারমশাইকে আরও দে!"

দুলালবাবু ফের বসে গেলেন এবং তারপর যা খেতে লাগলেন, সে-একটা দৃশ্যই বটে। স্বয়ং নবীন আর তার কর্মচারীরা দুলালবাবুর খাওয়া দেখে এমন বিহ্বল হয়ে গেল যে, কাকে এসে জিলিপি তুলে নিয়ে গেল, বেড়াল এসে দুধ খেয়ে যেতে লাগল, কড়াইতে কচুরি পুড়ে ঝামা হয়ে গেল।

নবীন ময়রা দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "সাক্ষাৎ-বৃকোদরের দেখা পেলাম আজ। চক্ষু সার্থক, ময়রাজন্মও সার্থক। ওরে মাস্টারমশাইকে আরও দে, হাঁ করে দেখছিস কী?"

তা দুলালবাবুর তাতে আপত্তি হল না। এক ঝুড়ি কচুরি আর এক বারকোশ হালুয়া খেয়ে ডজন-চারেক জিলিপি আর সেরটাক রাবড়ি চালিয়ে দিলেন ভিতরে। তারপর ঠেলে-ওঠা পেটটার ওপর একটু তেরে-কেটে-তাক বাজিয়ে নিয়ে

বললেন, "না, এতেই দুপুর পর্যন্ত চলে যাবে।"

খেয়েদেয়ে মনটা বেশ প্রসন্ন লাগল দুলালবাবুর, হাসিমুখেই বেরিয়ে পড়লেন। শরীরটা চনমন করছে একটা কিছু করার জন্য। দৌড়তে ইচ্ছে করছে, লাফাতে ইচ্ছে করছে, ছুঁড়তে ইচ্ছে করছে।

দুলালবাবু খানিকদূর হেঁটে যেতেই দেখতে পেলেন বি.এন. ক্লাবের মাঠে খুব জম্পেশ করে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। বি.এন. মানে বিবেকানন্দ ক্লাব। এই অঞ্চলে বিবেকানন্দ ক্লাবের খুব নামডাক। তারা জেলার শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট টিম। বাঘা-বাঘা সব বোলার আর ব্যাটসম্যান খেলে। বাঘা সেন আর বিক্রম সিংহ দুই সাঙ্ঘাতিক ফাস্ট বোলার। তেজেশ বাগ আর সূর্যজিৎ পালধি বিখ্যাত ব্যাটসম্যান। তারাই সব খেলছে।

দুলালবাবু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ খেলা দেখলেন। তাঁর মনে হল বাঘা সেন-এর বল মোটেই তেমন জোরালো নয়। বিক্রম সিংহও নিতান্তই ম্যাড়মেড়ে।

ধুতিটা একটু গুটিয়ে পরে নিলেন দুলালবাবু। তারপর সোজা মাঠের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

"এই যে বাঘা, ও কী বল করছ ভাই? এই কি হাতের জোর? দাও তো দেখি আমাকে একবার।"

বাঘা সেন দুলালবাবুর প্রাক্তন ছাত্র। মাস্টারমশাইকে সে ভালই চেনে। জীবনে খেলাধুলার ধারে-কাছেও ঘেঁষেননি দুলালবাবু। তাই সে অবাক হয়ে বলল, "স্যার, আপনি বল করবেন?"

দুলালবাবু হাত বাড়িয়ে বললেন, "আরে দ্যাখোই না, কীরকম করি।"

বাঘা তাড়াতাড়ি বলটা দুলালবাবুর হাতে দিল। দুলালবাবু বল করার কায়দাটা খানিকক্ষণ দেখে মনে মনে রপ্ত করে নিয়েছেন। অনেকটা দৌড়ে এসে তিনি বলটা হাত ঘুরিয়ে চমৎকার ছেড়ে দিলেন।

ব্যাট করছিল বিখ্যাত সূর্যজিৎ। বলটা পিচে পড়েই এমন অদৃশ্য হয়ে গেল যে, সূর্যজিৎ ব্যাট হাতে হাঁ করে রইল। ততক্ষণে অবশ্য বলটা তার লেগ আর মিডল স্টাম্প উপড়ে দিয়ে বাউন্ডারিতে চলে গেছে।

চারধারে নিস্তব্ধতা নেমে এল বিস্ময়ের। তারপরেই অবশ্য সবাই হাততালি দিয়ে উঠল।

সূর্যজিৎও দুলালবাবুর পুরনো ছাত্র। সে এগিয়ে এসে বলল, "স্যার, আপনার ভিতরে যে এত বড় একজন ফাস্ট বোলার লুকিয়ে ছিল, তা তো কখনও টের পাইনি।"

দুলালবাবু একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন, "ক্রমে-ক্রমে আরও কত কী টের পাবে!"

মাত্র চার ওভারের মধ্যেই দুলালবাবু দশজনকে আউট করে দিলেন। চারদিকে একটা হই-চই পড়ে গেল। বি.এন. ক্লাবের সেক্রেটারি স্বয়ং এসে বললেন "দুলালবাবু আপনি আমাদের ক্লাবে জয়েন করুন।"

দুলালবাবু মিটমিট করে হেসে বললেন, "আমাকে রিক্রুট করা বড় চাট্টিখানি কথা নয়। আমার খোরাক কে দেবে?"

"সে আর বেশি কথা কী? আমার বাড়িতেই খাবেন।"

"বটে! পারবেন তো খাওয়াতে?"

সেক্রেটারি জয়ন্ত সোম মস্ত বড়লোক। টাকাপয়সার অভাব নেই। তাঁর আত্মসম্মানে লাগল। বললেন, "পারব না মানে? কত আর খাবেন আপনি?"

দুলালবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "ঠিক আছে। ভেবে বলব।"

"এর আর ভাবাভাবির কী আছে? আগামীকালই আমাদের সঙ্গে রসুলপুরের রামকৃষ্ণ ক্লাবের খেলা। আর. কে. ক্লাব খুবই ভাল টিম। আপনাকে এ-খেলায় নামতেই হবে।"

দুলালবাবু নিমরাজি হয়ে বললেন, "ঠিক আছে, দেখব।"

জয়ন্ত সোম বললেন, "আর আজ দুপুরে আমার ওখানেই চাট্টি খাবেন।"

দুলালবাবু একটু তেরিয়া হয়ে বললেন, "চাট্টি মানে? ওসব চাট্টি-ফাট্টিতে আমার আজকাল হয় না বাপু। আর খেতে বসলে লজ্জা-টজ্জার বালাইও থাকে না।"

জয়ন্ত সোম একটু লাল হয়ে বললেন, "ঠিক আছে। লজ্জা করার মতো ব্যবস্থা হবে না, ভাল করেই খাওয়াব।"

দুলালবাবুকে এরপর ব্যাটও করতে হল। কিন্তু সেটায় তেমন জুত করতে পারলেন না। তবে আনতাবড়ি ব্যাট চালিয়ে যে-ক'টা লাগাতে পারলেন সব ক'টাই ছক্কা হওয়ায় গোটা-ষাটেক রান তুলে আউট হয়ে গেলেন।

দুলালবাবুর অসামান্য ক্রীড়াপ্রতিভা এতকাল কোথায় লুকানো ছিল, তা সবাই জানতে বিশেষ আগ্রহী। খেলার পর সবাই দুলালবাবুকে ঘিরে ধরল।

আর তখনই সেই দুলালবাবুর সঙ্গে এই দুলালবাবুর নানা খুঁটিনাটি পার্থক্য সকলের চোখে পড়তে লাগল। সেই দুলালবাবু ছিলেন রোগা, সুঁটকো, দুবলা, আর এই দুলালবাবু ছিপছিপে হলেও তাগড়াই, লড়াকু, জোরদার। বয়সটাও বেশ তফাত।

সূর্যজিৎ আমতা-আমতা করে বলল, "কিছু মনে করবেন না, আপনি কি

দুলালবাবুর ছোট ভাই?”

দুলালবাবু অভিজ্ঞতার বলে সেয়ানা হয়েছেন। বুঝতে পেরেছেন যে, নিজেকে আর দুলালবাবু বলে চালানোর চেষ্টা বৃথা। তাই তিনি কথাটা স্বীকার করে নিয়ে বললেন, “হ্যাঁ। দাদার সঙ্গে আমার চেহারার বড্ড মিল বলে সকলেই ভুল করে।”

“আপনার নাম কী?”

দুলালবাবু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন, “নামে কীই-বা আসে যায়! পাঁচু মোদক নামটা কেমন?”

সবাই অবাক হয়ে বলল, “দুলাল সেনের ভাই পাঁচু মোদক হয় কী করে?”

“হয় না বুঝি! তা হলে সুলাল সেন নামটাই চলুক।”

সবাই একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। দুলাল সেনের ভাইয়ের মাথায় একটু ছিট আছে কি? তবে থাকলেও ক্ষতি নেই। লোকটা খেলে ভাল।

দুলালবাবুর নাম ক্লাবের খাতায় সুলাল সেন বলেই লেখা হল।

দুপুরবেলা জয়ন্ত সোম নিজের গাড়িতে করে মহা সমাদরে দুলালবাবুকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। বিশাল আয়োজন হয়েছে খাওয়ার। স্নান করে বেশ চা বোধ করলেন দুলালবাবু, খিদেটাও চাগিয়ে উঠল। খেতে বসবার কিছুক্ষণ পর নিজের খাওয়া দেখে দুলালবাবুর নিজেরই লজ্জা করতে লাগল। আসলে লজ্জা পাচ্ছিল তাঁর ভিতরকার সাবেক দুলাল। নতুন দুলাল ওসবের তোয়াক্কা করে না, সে আস্তিন গুটিয়ে তেড়ে-মেড়ে শুধু খেয়েই চলে। পাহাড়-পর্বত খেয়ে ফেলতে চায়।

সাবেক দুলাল বলে, “আস্তে হে দুলাল, আস্তে। অতটা মাংস না-ই বা খেলে! ঘি, গরমমশলা, লঙ্কাবাটা কি রোগা পেটে সইবে!”

নতুন দুলাল খেঁকিয়ে উঠে বলে, “নজর দেবে তো মারব দুই থাবড়া। নিজে খেতে পারতে না বলে এখন হিংসে হচ্ছে, না?”

সাবেক দুলাল দুঃখের গলায় বলে, “না ভাই, হিংসে নয়। তোমার জন্য বরং দুশ্চিন্তাই হচ্ছে। ওই যে সাতখানা কই মাছ ওড়ানোর পর ফের মাছ চাইলে, তোমার লজ্জা করল না? ভদ্রলোকেরা কি অত খায়? আর গেরস্তর দিকটাও তো ভাববে! তাদেরও তো কম পড়ে যেতে পারে!”

“দ্যাখো হে সুঁটকো দুলাল, তুমি একটি আস্ত শনিঠাকুর। সর্বদা টিক টিক করো বলেই তোমার উন্নতি নেই। কিন্তু এখন আমার মাথা গরম কোরো না। খাওয়ার সময় দিক করলে আমার মাথার ঠিক থাকে না।”

দুলালবাবু মোট ষোলোটা কই মাছ, সেরটাক মাংস, জামবাটি-ভর্তি পায়েস ও অন্যান্য উপকরণ শেষ করে যখন উঠলেন, তখন বাস্তবিকই জয়ন্ত সোমের

ভিতর-বাড়িতে ভাঁড়ার ফাঁকা। নতুন করে রান্না চাপাতে হয়েছে।

দুলালবাবু নিজের পেটে আবার একটু তেরে-কেটে-তাক বাজিয়ে নিলেন। না, মোটামুটি ভরেছে বলেই মনে হচ্ছে।

খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিতে যাবেন, এমন সময় সদর দরজায় কড়াত-কড়াত করে কড়া নাড়ার শব্দ হল। বেশ জোরালো আর মেজাজি আওয়াজ।

জয়ন্ত সোম দরজা খুলতেই পুলিশের দারোগার অত্যন্ত গম্ভীর মুখ দেখা গেল। তিনি গুরুতর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "দুলাল সেন এখানে আছে বলে আমরা খবর পেয়েছি।"

জয়ন্ত সোম উৎকণ্ঠ হয়ে বললেন, "আজ্ঞে না, তবে তাঁর ভাই ..."

দারোগা বাধা দিয়ে বললেন, "লোকটা যে দুলাল সেন নয় তা আমরাক্টজামি। লোকটা আসলে খুনি। ইমপস্টার। কখনও নিজের নাম বলছে পাঁচু মোদক, কখনও দুলাল সেন..."

"অ্যাঁ!" বলে হাঁ করে রইলেন জয়ন্ত সোম।

"হল কী মশাই? হাঁ করে রইলেন কেন?"

জয়ন্ত আমতা-আমতা করে বললেন, 'আমাদের কাছেও যে তাই বলেছে। নতুন একটা নামও বলেছে। সুলাল সেন।"

"কই, চলুন, চলুন লোকটাকে এক্ষুণি গ্রেফতার করতে হবে। সাঙ্ঘাতিক খুনি। দুলাল সেনকে মেরে পুঁতে ফেলেছে....."

দারোগা-পুলিশ সব হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল। তারপর চারদিকে তুমুল তল্লাশি হতে লাগল। কিন্তু কোথাও দুলাল সেনকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

দুলাল সেনের দোষ নেই। পুলিশ এসেছে টের পেয়েই তিনি জানালা গলিয়ে ঘরের পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে দৌড়োতে লেগেছেন। যদিও তিনি জানেন যে, নিজেকে খুন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তবু আপাতত গা-ঢাকা দিতেই হচ্ছে।

ছুটতে-ছুটতে দুলাল সেন যে-জায়গাটায় এসে থামলেন, সেটা ভৌত-ক্লাবের পিছনের পোড়ো-বাড়ি। জায়গাটা এক নজরেই তাঁর পছন্দ হয়ে গেল। চারদিকে ধ্বংসস্তূপ, আগাছার দুর্ভেদ্য বেড়া। এখানে চট করে ঢুকতে কেউ সাহস পাবে না।

দুলালবাবু গুঁড়ি মেরে কাঁটাঝোপের জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন। হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে পড়লেন একটা দেওয়ালের কানায়। তারপর পাঁচ ফুট নীচে লাফ দিয়ে নেমে একটা ঢিবি পেরোলেন। আরও গলিঘুঁজি এবং ভুলভুলাইয়া পার হয়ে ভিতরে ঢুকে বেশ একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরে এসে ঢুকলেন।

ঘরখানা দেখে খুবই অবাক। এমন একখানা পোড়ো এবং ভাঙা বাড়ির মধ্যে এই ঘরখানা যেন হাসছে। দিব্যি ঘর। রোজ ঝাঁটপাট হয় বলে মনে হচ্ছে। একধারে

একখানা তক্তাপোশ, তার ওপর শতরঞ্চি আর চাদর পাতা। একখানা বালিশ আর ভাঁজ-করা কম্বল। আর আছে জলের কুঁজো। ঘরের কোণে একটা কুলুঙ্গিতে কিছু অদ্ভুত ধরনের যন্ত্রপাতি। ঘুরে-ঘুরে সবটাই দেখে নিলেন দুলালবাবু। এ-ঘরে কেউ থাকে!

যে থাকে থাকুক, আসল কথা হচ্ছে লোকটা এখন নেই। সুতরাং তার বিছানাটা দখল করতে কোনও আপত্তি ওঠার কথাও নেই। দুলালবাবুর মধ্যাহ্নভোজন ভালই হয়েছে। এখন চোখ বুজে বিশ্রাম করা দরকার। পুলিশ তাঁকে এই পোড়ো বাড়ির ভিতরে খুঁজতে আসবে না, এ-বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত।

দুলালবাবু বিছানায় শুয়ে গায়ে কম্বলটা টেনে নিলেন। তারপর চোখ বুজে কাল রাত থেকে আজকের এই অবধি ঘটনাটা ভাবতে লাগলেন।

সাবেক দুলাল আর নতুন দুলালের মধ্যে খটাখটিটা এখনও চলছে। সাবেক দুলাল বলছে, "না হে, না বলে-কয়ে অন্যে বিছানাটা দখল করা ঠিক কাজ হল না।"

নতুন দুলাল, নাক সিঁটকে বলল, "তা হলে মেঝেতে পড়ে থাকাই বোধহয় তোমার মতে ভাল কাজ ছিল?"

"দ্যাখো দুলাল, তোমার বড্ড বাড় বেড়েছে। অতি বাড় ভাল নয় জানো তো!"

"তোমার মতো শুঁটকো দুর্বল লোকেরাই যত নীতিবাগীশ হয়। ভিতুদের তো নীতিই সম্বল। যার জোর আছে সে ওসব পরোয়া-টরোয়া করে না।"

দুলালবাবু ঠ্যাং নাচাতে-নাচাতে ঝগড়াটা অনুধাবন আর উপভোগ করছিলেন। বেশ লাগছে।

একটু বাদেই দুলালবাবুর বেশ নিদ্রাবেশ হল। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। হ্যাপা তো কিছু কম যায়নি।

ঘুম ভাঙল একটা প্রবল দীর্ঘশ্বাসের শব্দে। চেয়ে দেখলেন, সামনে নরহরি দাঁড়িয়ে। মুখে সেই বিগলিত হাসি নেই। একটু শুকনোও দেখাচ্ছে।

"এই যে নরহরি!"

"পেন্নাম হই পাঁচুবাবু।"

"তা খবর-টবর সব ভাল তো নরহরি!"

পাঁচু মোদক ওরফে নরহরি বলল, "সকলের খবর কি একসঙ্গে ভাল হতে পারে পাঁচুবাবু? কথায় বলে, কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ।"

"তা বটে। তবে তোমার কোন্‌টা?"

"আজ্ঞে আমার সাড়ে সর্বনাশ।"

"তার মানে?"

"আপনার জন্য কাল রাত থেকে কী হয়রানিটাই গেল। জীবনে যা কখনও হয়নি

তাও আজ হয়ে গেছে। আমি চোর-দায়ে গেরস্তবাড়িতে ধরা পড়েছিলুম। লজ্জায় আর মুখ দেখানোর জো নেই। তারা খুনের দায়ে ফেলবেন, না চুরির দায়ে, তা ঠিক করতে পারছিলেন না।"

"বটে! ভারি মজা তো!"

"মজা আপনার, আমার নয়।"

"ওই হল। আমার মজা হলে তোমারই বা হতে বাধা কী?"

"আছে। বাধা আছে। আপনার হাসি-হাসি মুখ আর চকচকে চেহারা দেখে মালুম হচ্ছে বেশ সাঁটিয়ে খেয়েছেন।"

"তা বলতে পারো। সাঁটনটা আজ মন্দ হয়নি। সকাল থেকে বেশ ভালই হচ্ছে।"

"বাজে কথা বলবেন না পাঁচুবাবু, সকাল থেকে নয়, রাত থেকেই আপনার সাঁটন চলছে।"

"রাতের কথাটা মনে ছিল না। কিন্তু খাওয়ার খোঁটা দিচ্ছ কেন বলো তো! না হয় খোরাকটা একটু বেড়েছেই।"

"আজ্ঞে খোরাক তো আমারও বড় কম নয়। কিন্তু আজ সারা দিনে কী জুটছে জানেন? রায়বাড়িতে ছ'খানা রুটি। মাত্র ছ'খানা।"

"তা হলে তো খুবই অসুবিধে তোমার।"

"আজ্ঞে। তার ওপর চারিদিকে পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনাকে আর আপনার লাশকে খুঁজতে। সঙ্গে আমাকেও। তা হলেই বুঝুন, সর্বনাশ আর কাকে বলে। মেলা চোরাগোপ্তা পথ আর গলঘুঁজি জাঙ্গাল-পাঙ্গাল ডিঙিয়ে নিজের ডেরায় এসে দেখছি—কী দেখছি, না পাঁচুবাবু ভুঁড়িটি ভাসিয়ে আমার বিছানা দখল করে পড়ে ঘুমোচ্ছেন। বুঝুন তা হলে, পৌষমাস ছাড়া একে আর কী বলা যায়।"

দুলালবাবু ভ্রূ একটু কুঁচকে বললেন, "ওহে শোনো, আমাকে তোমার আর পাঁচু নামে ডাকতে হবে না। নিজের নামটা আমার মনে পড়ে গেছে।"

পাঁচু মুখটা বিকৃত করে বলল, "তবে আর কী, কৃতার্থ করেছেন! এবার নাম বিক্রির টাকাটাও বোধহয় ফেরত চাইবেন!"

দুলালবাবু অমায়িক হেসে বললেন, "পুরোটা দিতে হবে না। এক টাকা নামের ভাড়া বাবদ কেটে চারটে টাকাই না-হয় দাও। এক রাত্তিরের ভাড়া হিসেবে এক টাকা কিছু কমও নয় কী বলো!"

"চাইছেন তা হলে!"

"চাইছি। আজকাল আমার বড্ড কথায়-কথায় খিদে পায়।"

পাঁচু মুখখানা গোমড়া করে ট্যাঁক থেকে পাঁচটা টাকা বের করে বলল, "এই নিন, পুরোটাই ফেরত দিচ্ছি। ভাড়া লাগবে না। দয়া করে বিছানাটা ছাড়েন তা হলে উপোসী শরীরটাকে একটু জিরেন দিতে পারি।"

দুলালবাবু তাড়াতাড়ি উঠে বললেন, "আহা, শোও হে শোও। আমার যথেষ্ট ঘুম হয়েছে।"

দুলালবাবু উঠে পড়লেন। শরীটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। মনেও বেশ ফুর্তি। গুনগুন করে গান ভাঁজতে-ভাঁজতে ঘরেই পায়চারি করতে লাগলেন।

"আচ্ছা নরহরি?"

"আবার নরহরি কেন? নামটা তো ফেরত দিলেন।"

"তা বটে। আচ্ছা পাঁচু।"

"বলুন দুলালবাবু।"

"এসব কী হচ্ছে বলে তো?"

"কোন্ সব?"

"এই যে, যা সব হচ্ছে, একি ভাল হচ্ছে?"

পাঁচু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আপনার পক্ষে তো বেশ ভালই হচ্ছে দেখছি মশাই। তবে সকলের ভাল তো একসঙ্গে হতে পারে না। ভগবান মানুষটাই এমনি, একজনের পিঠে যখন হাত বোলান তখন আর একজনকে তাঁর চিমটি না কাটলেই নয়। আপনার যেমন ভাল হচ্ছে ওদিকে তেমনি আমার হেনস্থা। ফলে রাতে ওই মোটে কয়েকখানা বাসন তাও রায়মশাই কেড়েকুড়ে নিয়ে নিলেন। তারপর সারাদিন উপোসী পেটে ছোটাছুটি করে দম একেবারে শেষ। তা হোক, আপনার তো ভাল হচ্ছে।"

দুলালবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "ভাল হচ্ছে বলে আমার মনে হচ্ছে না। এত ভাল, ভাল নয়। আজ দুটো লোককে এমন টিট করলুম যে, বাবা রে মা রে বলে চিতপাত হয়ে পড়ে গেল। জীবনে আমি কখনও কারও সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে উঠিনি। তা হলে জোরটা এল কোত্থেকে? তারপর খাওয়া। আমি যা খাই বিশ গুণেরও বেশি খেয়ে ফেলেছি, অথচ পেটে খিদেটা কেমন যেন খাচচি মেরে রয়েই গেছে। এই দ্যাখো, বলতে-বলতেই আবার খিদে পেয়ে গেল। না হে পাঁচু, এত ভাল, ভাল নয়।"

পাঁচু চোখ বুজে পড়ে ছিল, স্তিমিত গলায় বলল, আপনার ভাবসাব আমারও ভাল ঠেকছে না। রাত্রিবেলা চুরি শেখালুম, একটি পয়সা গুরুদক্ষিণা বলে ঠেকালেন না। চুরির মাল ফেরত দিতে হল। নাঃ, আমার সময়টাই খারাপ পড়েছে....

দুলালবাবু পায়চারি করতে-করতে বললেন, "আমার খুব মারপিট, দুষ্টুমি করতে ইচ্ছে হচ্ছে। লাফাতে ইচ্ছে করছে। কী করি বলো তো?"

পাঁচু জুলজুল করে দুলালবাবুর দিকে চেয়ে থেকে বলল, "ওরে বাবা, তা হলে তো চিন্তার কথা মশাই।"

"চলো, দুজনে মিলে একটা কিছু করে আসি।"

পাঁচু সভয়ে বলল, "কী করতে চান?"

"একটা হই-হট্টগোল পাকিয়ে দিয়ে আসি শহরে। চলো, চলো...."

"আজ্ঞে আমার বয়স যে সত্তর পেরিয়েছে।"

"তাতে কী? বসে থেকে-থেকেই যে জাতটা শেষ হয়ে গেল। ওঠো, একটা হুটোপাটি করে আসি গিয়ে।"

সন্ধে হয়ে গেছে। পোড়ো বাড়ির সামনের দিকে ভৌত ক্লাবের সদস্যরা একে-একে জড়ো হয়েছেন। ফটিকবাবু, সাত্যকীবাবু, নরেনবাবু, সবাই আছেন। নন্দবাবুও এসে হাজির হলেন। মড়ার খুলির দু'পাশে মোমবাতি জ্বলছে। বেশ ভৌতিক আবহাওয়া। কিন্তু সকলের মুখেই একটা উদ্বেগের ভাব।

নন্দবাবু বললেন, "দুলালবাবুর মতো চেহারার সেই লোকটার কাণ্ডকারখানা সব শুনেছেন তো?"

সবাই 'হুঁ' দিল।

ফটিকবাবু বললেন, "আজ আমাকে লোকটা খুন করার চেষ্টা করেছিল। অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। তবে টাকাপয়সা সবই ডাকাতি করে নিয়ে গেছেন। ভাবা যায় না।"

একজন বলল, "তবে লোকটা যা ক্রিকেট খেলেছে আজ তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। লারউডও ওরকম খেলতে পারতেন না।"

ক্রিকেটের কথাও সবাই শুনেছে।

নন্দবাবু বলে উঠলেন, "কিন্তু লোকটা কে?"

অল্পবয়সীরা সমস্বরে বলে উঠল, "উনি দুলাল-স্যারই হবেন।"

"কিন্তু দুলালবাবুর মতো দেখতে হলেও এঁর যে বয়স কম, জোর বেশি।"

একটি ছোকরা মাথা নেড়ে বলল, "কায়কল্প আর যোগ-ব্যায়ামের ফল। দুলালবাবু রিটায়ার করার পর যোগ-ব্যায়াম শুরু করেছিলেন। আর তাতেই চেহারাটা একেবারে ছোকরা-মার্কা হয়ে গেছে।"

সাত্যকীবাবু বললেন, "শুনেছি, কুমিরের রক্ত খেলে নাকি বয়স কমে যায়?"

"না না, বানরের ঘিলু।"

"ওরে, তোরা কিছুই জানিস না। বয়স কমানোর জন্য দরকার হল বাঘের চর্বি। গায়ে মেখে সাত দিন বসে থাকতে হয়।"

এই নিয়ে একটা তর্ক পাকিয়ে উঠল।

হঠাৎ পোড়ো বাড়ির দিককার বন্ধ জানলাটা দড়াম করে খুলে গেল, আর একটা বাতাসের ঝাপটায় নিভে গেল মোমবাতি।

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

জানালার বাইরে থেকে একটা রক্ত জল-করা খোলা হাসির শব্দ এল।

পোড়ো বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে ভাঙা পাঁচিলটা ডিঙোবার পর দুলালবাবু পাঁচু মোদককে বললেন, "একটা চেঁচামেচি হচ্ছে যেন!"

পাঁচু মাথা নেড়ে বলল, "আজ্ঞে ভুতোবাবুরা মনে হয় ভয়টয় পেয়েছেন।"

"ভুতোবাবু কারা?"

"আজ্ঞে ওই ক'জন বাবু মিলেমিশে একটা ক্লাব করেছেন। ভারি মজার ক্লাব আজ্ঞে। তাঁরা সব ভূত নামানোর জন্য নানা কসরত করেন।"

"ভূত কি নামে?"

"আজ্ঞে এখনও নামেনি। তবে আমি যাতায়াতের পথে মাঝে-মাঝে ঢিল ছুঁড়ে বা ফাঁকা গলায় আওয়াজ তুলে বাবুদের ভয়টয় দেখাই আর কি।"

"তা আজ চেঁচামেচি হচ্ছে কেন?"

চেঁচামেচি বেশ ভালই হচ্ছিল। কে যেন তারস্বরে "রাম, রাম" করে চেঁচাচ্ছে! আর-একজন "হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ।" একজন চেঁচিয়ে বলছে, এইবার...এইবার...জয় ভূত...জয় ভূত... ব্যোম কালী....এবার আমার শালা বাজি হারবেই...।" আর দরজা খুলে সটাসট দৌড়ে কিছু লোক পালিয়েও গেল।

দুলালবাবু বললেন, "ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে হে পাঁচু।"

পাঁচু বেজার মুখে বলল, "দেখার কিছু নেই। বাবুরা ওরকম মাঝে-মাঝেই করেন। "ভিতুর ডিম সব। এই তো সেদিন নন্দবাবু একখানা হেলমেট ফেলেই পালিয়ে গেলেন। আমি সেখানা যত্ন করে তুলে রেখেছি। কখন কোন কাজে লাগে বলা তো যায় না।"

দুলালবাবু উৎকর্ণ হয়ে কিছুই শুনছিলেন। বললেন, "উত্তর দিকের জঙ্গলে কে যেন হাসছে, শুনতে পাচ্ছ?"

পাঁচু শুনল, তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, "ও গণেশ।"

"তার মানে?"

"আজ্ঞে গণেশ গন্ধবণিক। এই তো হপ্তাখানেক আগে জঙ্গলের একটা জামগাছে গলায় গামছা দিয়ে ম'ল।"

দুলালবাবু আঁতকে উঠে বললেন, "মরেছে?"

"আজ্ঞে একেবারে নির্যস মরাই মরেছে। নিজের চোখে দেখা।"

"তবে হাসছে কী করে?"

"আজ্ঞে সেইটেই তো গোলমেলে। বেঁচে থাকতে গণেশকে কেউ হাসতে দ্যাখেনি। মুখখানা গোমড়া করে ঘুরে বেড়াত। ঘরে দজ্জাল বউ। তা এখন মনের সুখে হাসছে। বেশ ফুর্তিতেই আছে মনে হয়।"

"গণেশ কি তা হলে ভূত হয়ে?"

পাঁচু মাথা চুলকে বলল, "তা না হলে আর হাসে কী করে বলুন। নতুন ভূত হয়েছে তো, এ-সময়টায় একটু দুষ্টুবুদ্ধি কাজ করে। এই যেমন ছেলেপুলেরা করে আর কি।"

"তুমি ভূত দেখেছ?"

"বিস্তর। রাত-বিরেতেই তো আমার কাজ। নিশুত রাতে কত তেনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।"

"বলো কী?"

পাঁচু খুব বিনয়ের সঙ্গে হেঃ হেঃ করে একটু হাসল। মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বলল, "তবে তাঁরা সকলেই কিছু খারাপ লোক নয়। দু'চারজন তো রীতিমত স্নেহই করেন। দেখা হলেই খোঁজখবর নেন।"

"বটে! কিন্তু আমি হচ্ছি বিজ্ঞানের লোক। ভূতটুত মানি না। তবে ভূত যদি দেখাতে পারো, তা হলে মানতে আমার আপত্তি নেই।"

পাঁচু বেজার মুখ করে বলল, "আপনাকে ভূত দেখিয়ে আমার কাজ কী? ভূত আপনি মানুন বা না মানুন তাতে আমার কচুপোড়া। তার চেয়ে ভূত-পাগলা ফটিকবাবুকে দেখাতে পারলে একটা কাজ" হাসি-হাসি মুখ করে বলল, "আজ্ঞে ফটিকবাবু, একটু গুরুতর কথা ছিল। এমন সুযোগ আর হবে না।"

ভৌত-ক্লাবের ভিতরে তখন তিনজন মূর্ছা গেছেন, দু'জন হতভম্ব, ফটিকবাবু শুধু ছটফট করছেন আর বলছেন, 'কোথায় ভূত? কোথায় ভূত?" পাঁচুর কথা শুনে একটু ধাতস্থ হয়ে বললেন, "তুমি কে?"

"অধমের নাম পাঁচু মোদক। এমন সুযোগ আর পাবেন না।"

"কিসের সুযোগ?"

"আজ্ঞে, গণেশের ভূত এই কাছেই ঘাপটি মেরে আছে। আমি বন্ধন মন্ত্র দিয়ে

বাছাধনকে একেবারে বেঁধে রেখে এসেছি। তবে কি না.....''

''তবে কী?''

''আজ্ঞে আমি গরিব মানুষ, পেটের দায়েই এইসব করতে হয়। তাই বলছিলাম কি....''

''কত দিতে হবে?''

''আজ্ঞে শ-পাঁচেক হলে বেশ হয়। শ-চারেক হলেও মন্দ হয় না। আর দুশো টাকা হলে মন্দের ভাল।''

কে যেন পিছন থেকে একটা হ্যাঁচকা টানে পাঁচুকে সরিয়ে নিয়ে বলল, ''আহাম্মক কোথাকার! ওভাবে দর কমাতে হয়?''

ভুবনবাবু আর রামলালবাবু মিলে ল্যাবরেটরিটা সারাদিন খেটে ফের সাজিয়ে তুলেছেন। আসল ধকলটা অবশ্য রামলালবাবুর ওপর দিয়েই গেছে, ভুবনবাবু শুধু তদারকি করেছেন। শুধু সাজিয়ে তুলেই রেহাই নেই। কোন্-কোন্ কেমিক্যাল মিলিয়ে মিশিয়ে দুলালবাবু রাত্রিবেলা একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন তাও হিসেব করে-করে বের করতে হয়েছে রামলালবাবুকে। এখন তিনি খুবই ক্লান্ত। তবু ছুটি নেই। কারণ, ল্যাবরেটরিতে বসে ভুবনবাবু কাল রাত থেকে এ-পর্যন্ত যত ঘটনা

ঘটেছে, তা লিপিবদ্ধ করছেন। মাঝে-মাঝে রামবাবুর কাছ থেকে তথ্য জেনে নিচ্ছেন।

লিখতে লিখতে মাঝে-মাঝে তিনি ভাবছেনও। গোটা ঘটনাটাই তাঁর কাছে ভীষণ ধোঁয়াটে বলে মনে হচ্ছে।

রামলাল ঢুলছিলেন চেয়ারে বসে। ভুবনবাবু তাঁর দিকে একবার তাচ্ছিল্যের চোখে চেয়ে বললেন, "বুঝলে রামলাল, ব্যাপারটা এখনও কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না..."

"আজ্ঞে না।"

ভুবনবাবু ভ্রূ কুঁচকে ছেলেকে নীরবে একটু ভর্ৎসনা করলেন যেন। তারপর বললেন, "তুমি কি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছ?"

"আজ্ঞে ভাবছি। খুব ভাবছি।"

"তোমার ভাবসাব দেখে তা মনে হচ্ছে না। তোমার তো দেখছি ঘুমও পাচ্ছে। কিন্তু এরকম এটা রহস্যময় রোমহর্ষক ঘটনার পর ঘুম আসা বা খিদে পাওয়া বা হাস্যোদ্রেক হওয়ার কথাই নয়।"

"আজ্ঞে, তা বটে।"

"ঘুম বেশি পায় গবেটদের।"

"আজ্ঞে বটেই তো।"

ভুবনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "যাকগে, এখন বলো তো আমাদের এবার কী করা উচিত?

রামলাল একটা বিকট হাইকে চাপতে গেলেন, দুটো কান দিয়ে বাতাস বেরিয়ে গেল। বললেন, "আমার তো মনে হয় এই ল্যাবরেটরিটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত।"

"বলো কী! কেন?"

"আজ্ঞে, এখানে ভূতটুত কিছু আছে, সবটাই ভুতুড়ে কাণ্ড।"

ভুবনবাবু চোখ কপালে তুলে অতিশয় বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, "এই বিজ্ঞানের যুগে তুমি ভূতে বিশ্বাস করো, নিজে একজন বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও?"

রামলালবাবু বিনয়ের সঙ্গে কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়স্বরে বললেন, "কিন্তু আপনিই তো ভৌত চশমা আবিষ্কার করেছেন এবং তার ভিতর দিয়ে বিস্তর ভূতও দেখা গেছে। ভূত না থাকলে কি সেটা সম্ভব হত?"

ভুবনবাবু বিপাকে পড়ে একটু আমতা-আমতা করে বললেন, "আমারটা হল সায়েন্টিফিক রিসার্চের ফল, আর তোমাদেরটা হল কুসংস্কার। একটা হল বৈজ্ঞানিক ভূত, আর-একটা হল কল্পনার ভূত।"

রামলালবাবু বিনয় এবং দৃঢ়তার সমান মিশেল দিয়ে বললেন, "বিজ্ঞানে ভূতের

কোনও স্থান নেই। সেইজন্যই আপনার ভৌত চশমা নিয়ে লোকের মনে নানারকম সন্দেহ দেখা দিয়েছে। অনেকে বলছে, চশমা দিয়ে যা দেখা যায় তা চোখের ভুল।"

ভুবনবাবু মহা খাপ্পা হয়ে টেবিলে মস্ত একটা থাপ্পড় কষিয়ে বললেন, "কোন্ আহাম্মক এত বড় কথা বলেছে? তার নাম বলো।"

ভুবনবাবুর রুদ্রমূর্তি দেখে রামলাল মিইয়ে গিয়ে বললেন, "কেউ বলেনি এখনও, তবে বলতে পারে।"

"কে এমন কথা বলতে পারে? কার ঘাড়ে দু'টো মাথা গজিয়েছে?"

রামলাল দৃঢ়তা ছেড়ে পুরোটাই বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "আজ্ঞে, সেরকম লোক নেই বলেই মনে হয়। তবে কিনা, আমিও আগে ভূতে বিশ্বাস করতাম না, আপনার ভৌত চশমাটা আবিষ্কার হওয়ার পর থেকেই ভূতপ্রেতে বেশ বিশ্বাস হয়েছে। এরকম অদ্ভুত আবিষ্কার আর তো কেউ করতে পারেনি।"

এ-কথায় ভুবনবাবুর মুখ উজ্জ্বল হল। তিনি খুশি হয়ে বললেন, "তা বটে। তবে হ্যাঁ, ভূতপ্রেত থাকলেও তাতে অত বিশ্বাস রাখতে নেই। আর হ্যাঁ, ল্যাবরেটরিটা বন্ধ করে দেওয়াও মূর্খের মতো কাজ হবে। আমার মনে হয়, দুলালবাবু যুগান্তকারী একটা কিছু আবিষ্কারের গন্ধ পেয়ে ফেলাতেই তাঁর বিপত্তি হয়েছে। কোনও দুষ্টচক্র আবিষ্কারের গন্ধ পেয়ে তাঁকে গুম করেছে এবং তাঁর জায়গায় তাঁর মতো দেখতে আর-একটা লোককে বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। এইসব সম্ভাবনার কথা তোমার মগজে আসছে না কেন?"

"আজ্ঞে আসছে। আমার মগজেও এইসব সম্ভাবনার কথাই আসছে। তবে ব্যাপারটা ভারি গোলমেলে আর ভুতুড়ে।"

ভুবনবাবু একটা লিস্ট টেনে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, "এই কেমিক্যালগুলোই দুলালবাবু ব্যবহার করেছিলেন, তাঁর আবিষ্কারে। তা তুমি এসব মিশিয়ে দ্যাখো কিছু একটা হয় কি না। হয়তো এর সঙ্গে আরও কিছু ছিল, সেসব তুমি বিচার করে দেখবে। সহজে হাল ছেড়ে দিও না।"

"যে আজ্ঞে।"

ভুবন রায় উঠে পড়লেন। সারাদিন বড্ড ধকল গেছে।

হরমোহিনীর ঘর পার হয়ে ভুবনবাবুর ঘর। মায়ের ঘরের দরজা পেরনোর সময় হরমোহিনী হাঁক দিলেন, "কে যায় রে?"

"আমি মা, আমি ভুবন।"

"ভুবন! না বাবা, আমি মুখের কথায় বিশ্বাস করি না। শুনলুম, কাল সারা রাত্তির ধরে এ-বাড়িতে চোরের উপদ্রব হয়েছে। দেখি বাবা, তোর মুখখানা আগে দেখি। আজকালকার চোরেরা ভারি সেয়ানা, তারা নানারকম নাম নেয় যখন

তখন। আগে মুখ দেখব, তবে বিশ্বাস করব। ও মোক্ষদা, আমার ঠ্যাঙাটা দে তো, হাতে রাখি। আর তুইও ওই মুগুরখানা নিয়ে তৈরি থাক।"

মোক্ষদা ধমক দিয়ে বলে উঠল, "তোমার কি মাথাটা একেবারেই গেল? ওম্‌মা, কোথা যাব গো! বলি বড়বাবুকে চিনতে পারছ না গলা শুনে! আর সাঁঝরাতে কি গেরস্তর বাড়িতে চোর ঢোকে?"

হরমোহিনী গলা তুলে বললেন, "দ্যাখ মোক্ষদা, ভুবনকে আমি পেটে ধরেছি, তার গলা আমি চিনব না তো কে চিনবে? বাছা আমার দিনে ক'বার শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় তারও হিসেব আমার আছে।"

"এতই যদি চেনো তা হলে লাঠি-ঠ্যাঙা চাইছ কেন?"

"সে তুই বুঝবি না। দিনকাল ভাল নয়। লোকটা ফশ করে ঢুকে পড়ার পর যদি দেখি, সে আমার ভুবন নয়, একটা মুশকো-মতো ঝ্যাঁটা গোঁফ মিশমিশে কালো আর ভাঁটার মতো চোখওয়ালা বিচ্ছিরি লোক, তখন কী হবে লা? চোরেরা কত লোকের গলা নকল করতে পারে তা জানিস?"

"খুব জানি গো, খুব জানি। চোরের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, লোক-জানান দিয়ে মাঝের রাত্তিরে ঘরে ঢুকবে।"

ভুবনবাবু ঘরে ঢুকে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। হরমোহিনী তাঁর দিকে ফিরেও তাকালেন না। গায়ের লেপটা সরিয়ে ঠ্যাঙা হাতে উঠে বসলেন। তারপর মোক্ষদার দিকে চেয়ে দ্বিগুণ গলায় বললেন, "দ্যাখ মোক্ষদা, তুই হচ্ছিস সেদিনকার মেয়ে, তুই ক'টা চোর দেখেছিস র‍্যা জীবনে? চোর কতরকমের হয় তা জানিস?"

"আমার নাতির বয়স কত, তা জানো? খুব যে আমাকে কচি খুকি বলে উড়িয়ে দিচ্ছ, আর চোর তুমি আমাকে কী চেনাবে, চোর দেখে-দেখে চোখ পচে গেছে। এখন হাঁটুটা দাও, তেলটা মালিশ করে চলে যাই। অনেক কাজ পড়ে আছে।"

কাজের কথায় কান দিলেন না হরমোহিনী। হাতের ঠ্যাঙাটা নাচাতে-নাচাতে বললেন, "আমাকে আর কাজ দেখাস না মোক্ষদা, কী কাজ যে তুই করিস তা খুব জানি। আমার বাঁ হাটুতে ব্যথা আর তুই রোজ চুপিচুপি আমার ডান হাঁটুতে মালিশ করে যাস। কাল রাতে চোর এল আর তুই পড়ে-পড়ে ঘুমোলি। আর আজ আমাকে যা নয় তাই বলে মুখে-মুখে জবাব করছিস। অতই যদি চোর দেখেছিস তবে বল দেখি চোরের কথা। তুইও বল, আমিও বলি। পাঁচজনে শুনে বলুক, চোরের কথা কে বেশি জানে।"

"আমারও বলে কাজ নেই, তোমার শুনে কাজ নেই। ওই বড়বাবু দাঁড়িয়ে আছেন, ঘরে আলো জ্বলছে, ভাল করে দেখে নাও।"

হরমোহিনী বললেন, "দেখার আবার কী আছে রে, নিজের পেটের ছেলে, সেই

এতটুকুন বেলা থেকে দেখে আসছি।''

''তাই তো বলছি গো, নিজের ছেলে চিনতে পারো না, তুমি কেমনধারা লোক?''

হরমোহিনী চোখ পাকিয়ে বললেন, ''চিনতে পারিনি এ-কথা তোকে কে বলল? হ্যাঁ রে ভুবন, আমি কি বলেছি যে, তোকে চিনতে পারিনি? আমার কি তেমন ভীমরতি ধরেছে?''

ভুবন রায় মাথা নেড়ে বললেন, ''না তো।''

''ওই শোন্ মোক্ষদা, শুনলি তো। আমি আমার ভুবনকে চিনতে পারব না তাও কি কখনও হয়? তোর যে দিন-দিন কী আক্কেল হচ্ছে তাই ভাবি।''

মোক্ষদা গজ গজ করতে লাগল, ''আমার আক্কেল ঠিকই আছে। তোমার আক্কেলেরই বলিহারি যাই। দিন-রাত হাতে ঠ্যাঙা নিয়ে বসে আছ। বলি চোর আসুক না আসুক, ভুল করে ঠ্যাঙাটা আবার কার মাথায় বসিয়ে দাও তার তো ঠিক নেই।''

''আমি বুঝি সেরকম লোক! মানুষকে ধরে-ধরে মাথায় ঠ্যাঙার বাড়ি মেরে বেড়াই বুঝি?''

''তা মোটেই বলিনি। চোখে ভাল দেখতে পাও না, কানেও ভাল শুনতে পাও না, বুদ্ধিও ঘোলাটে, এই বয়সে ভুলটুল তো হতেই পারে।''

''কবে আবার চোখে দেখলুম না, কবে আবার কানে শুনলুম না রে পাজি? নিয়ে আয় ছুঁচ-সুতো, এক্ষুণি ছুঁচে সুতো পরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর কানের কথা বলছিস? একতলায় কেউ ফিসফিস করে কথা বললেও দোতলায় আমার কানে আসে।''

''ঘাট হয়েছে বাপু। তবু বলি, ঠ্যাঙাটা তোমার হাতে মোটেই আমার সুবিধে ঠেকছে না।''

ভুবনবাবু সারা দুনিয়ায় এই একটিমাত্র মানুষকে বড় সমঝে চলেন। তিনি হলেন তাঁর মা হরমোহিনী। ভুবনবাবু আশি ছাড়িয়েছেন সেই কবে, কিন্তু হরমোহিনী এখনও তাঁকে নিতান্তই নাবালক মনে করেন। শাসন-তর্জনও বড় কম করেন না।

মোক্ষদা আর হরমোহিনীর ঝগড়ায় ভুবনবাবুর কোনও ভূমিকা নেই। অথচ চলেও যেতে পারছেন না।

হরমোহিনী তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, ''হ্যাঁ রে ভুবন, আমি কি চোখে দেখি না? কানে শুনি না? আমার কি বুদ্ধিনাশ হয়েছে?''

ভুবনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, ''না মা, তোমার চোখ-কান-বুদ্ধি সবই ঠিক আছে।''

"তবে যে মোক্ষদা বলে! হ্যাঁ রে মোক্ষদা, ছুঁচ-সুতো আনলি? নিয়ে আয়, তারপর দ্যাখ পিদিমের আলোতেও সুতো পরাতে পারি কি না, তারপর কানের পরীক্ষা...."

হরমোহিনীর কথা শেষ হল না, তার আগেই সিঁড়িতে দুদ্দাড় পায়ের শব্দ হল। কে যেন দৌড়ে আসছে। নীচের তলা থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, "কে যায় ঐ কে যায় রে? ডাকাত নাকি?"

ভুবনবাবু আঁতকে উঠে ঘরের দরজাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করতে গেলেন, তারপর চেঁচাতে লাগলেন, "ডাকাত! ডাকাত! সব দৌড়ে এসো...."

হরমোহিনী ঠ্যাঙাটা বাগিয়ে প্রায় লাফ মেরে খাট থেকে নেমে ভুবনবাবুকে টেনে আনলেন দরজার কাছ থেকে, "তুই ছেলেমানুষ, গিয়ে খাটের তলায় লুকিয়ে থাক। আমি দেখছি, কে আমার বাছার গায়ে হাত দেয়। যা যা, খাটের তলায় যা।"

মায়ের হুকুম। ভুবনবাবু হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় সেঁধিয়ে গেলেন। হরমোহিনী ঠ্যাঙা হাতে দরজা আগলে দাঁড়ালেন দেখে মোক্ষদা মূর্ছা গেল।

ডাকাত দৌড়ে আসছিল ঠিকই। কিন্তু বারান্দায়-রাখা এক বালতি জলে হোঁচট খেয়ে দড়াম করে আছাড় খেল।

হরমোহিনী দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। ডাকাতটা সামনেই পড়ে আছে দেখে হরমোহিনী ঠ্যাঙাটা তুলে বললেন, "দেখলি তো, কেমন ধর্মের কল বাতাসে নড়ে! এবার দিই মাথাটা ভেঙে!"

"ঠাকুমা মেরো না।"

"বিপদে পড়ে ঠাকুমা বলে ডাকলেই কি আর আমি ভুলি রে বাপু! তোরও আক্কেল নেই! রোজ রোজ একটা বাড়িতে এসে হামলা করিস কেন রে বেআক্কেলে? কেন, ওই তো হরিপদ পালের অত বড় আড়ত রয়েছে, কালী স্যাকরার দোকান রয়েছে, রহিম শেখের তেজারতি রয়েছে, সেসব তোর চোখে পড়ে না? কানা নাকি? এ বাড়িতে কিসের মধু রে অলপ্পেয়ে?"

"ঠাকুমা, আমি নন্দ।"

"নন্দ! বলিস কী? তুই নন্দ হতে যাবি কোন্ দুঃখে?"

নন্দবাবু শীতে কাঁপতে কাঁপতে ভেজা গায়ে উঠে দাঁড়ালেন। ককিয়ে উঠে বললেন, "ওফ্ মাজাটা গেছে, হাঁটুটার অবস্থাও ভাল নয়। ওফ্, তারপর ভূতের তাড়া।"

হরমোহিনী নাতিকে চিনতে পেরে ঠ্যাঙাটা নামিয়ে বললেন, "তাই তো! তুই তো নন্দই মনে হচ্ছে।"

"নন্দই বটে গো ঠাকুমা, তবে নিজের নামটা ভুলবারই জো হয়েছে। সাঙ্ঘাতিক

কাণ্ড।"

"আয় ভাই, ঘরে আয়। দিনকাল ভাল নয়, অমন দৌড়াদৌড়ি হুটোপাটি করতে আছে?"

নন্দবাবু খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে ঢুকলেন। আর সেই সময় খাটের তলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে ভুবনবাবুও বেরিয়ে আসছিলেন। নন্দবাবু দেখে হাঁ, নিজের ডাকসাইটে বাবাকে এরকম হামাগুড়ি দিতে জীবনে দ্যাখেননি।

ভুবনবাবুও যথেষ্ট লজ্জা পেয়েছেন। সেটা ঢাকা দিতেই ভ্রূকুটি করে গম্ভীর মুখে বললেন, "ভূতের কথা কী বলছিলে? তোমাদের দুই ভাইকেই দেখছি আজকাল বেশ ভূতে ধরেছে। ব্যাপারটা কী বলো তো!"

নন্দবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, "আজ্ঞে, ভৌত-ক্লাবে আজ যথার্থই ভূত এসেছিল।"

ভুবনবাবু অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, "এই বিজ্ঞানের যুগে তোমরা যে কী করে ভূতে বিশ্বাস করো তা আমি তো ভেবেই পাই না। কাজকর্ম না করে তুমি বায়ুগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছ। ভীতু, অলস, নিষ্কর্মা......"

হরমোহিনী অত্যন্ত কঠোর গলায় ডাকলেন, "ভুবন! কোন্ সাহসে আমার সামনে তুই বাচ্চাটাকে বকছিস!"

ভুবন রায় সঙ্গে-সঙ্গে কেঁচো হয়ে গেলেন। এ-বাড়িতে বড়দের সামনে ছোটদের মেজাজ দেখানোর রেওয়াজ নেই।

হরমোহিনী অত্যন্ত কঠোর গলায় বললেন, "খুব পণ্ডিত হয়েছিস না? ভূত-প্রেত নেই তোকে কে বলল? না থাকলে তোর বাবা, তোর দাদু, তোর জ্যাঠা, তোর ঠাকুমাকে আমি রোজ দেখতে পাই কেন? তারা যে সর্বদা ঘুরঘুর করে চারদিকে। এই তো কাল রাতেও শুনলুম, তোর দাদু কাসছে পাশের ঘরে। ভাবলুম, গিয়ে একটু তেল মালিশ করে দিয়ে আসি বুকে। তারপর মনে হল, বায়ুভূত অবস্থায় মালিশটা ঠিকমতো বসবে না। তোর বাবা তো ফি-রাতে এসে বলে যায়, 'ওগো ভুবনটাকে দেখো, লেখাপড়া ঠিকমতো করছে তো! না কি কেবল খেলে বেড়াচ্ছে!' বল তা হলে ভূত না থাকলে এসব হচ্ছে কোত্থেকে।"

ওদিকে ভৌত-ক্লাবের দরজার বাইরে আর এক নাটক চলছে। পাঁচু পাঁচশো টাকা থেকে দুশো টাকায় নেমে আসায় কে যেন পিছন থেকে হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে সরিয়ে দিয়ে বলে উঠল, "আহাম্মক কোথাকার! ওভাবে দর কমাতে হয়!"

হ্যাঁচকা টানে পাঁচু অনেকটাই ছিটকে গিয়ে কুলতলায় পড়ে ভিরমি খেল। তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দেখল তার স্থান নিয়েছেন স্বয়ং দুলালবাবু।

দুলালবাবু ফটিকবাবুকে বেশ চড়া গলায় বললেন, "ওই পাঁচশোই, এক পয়সাও কম নয়। ভূত দেখতে চাও তো টাকাটা ফ্যালো হে ফটিক।

ফটিকবাবু দুলালবাবুকে দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন। কারণ আজ সকালেই এই লোকটা তাঁর ওপর বিস্তর হামলা করে এসেছে। লোকটাকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। শোনা যাচ্ছে সেই নকল দুলাল আসল দুলালকে খুন করে লাশ সরিয়ে ফেলেছে।

ফটিকবাবু সভয়ে তিন হাত পিছিয়ে গিয়ে বললেন, "আমি ভূত দেখতে চাই না।"

"আলবাত চাও। ভূত তোমাকে দেখতেই হবে।"

"আমি ভূত-টূত বিশ্বাসই করি না। আপনি যেতে পারেন।"

দুলালবাবু হাঃ-হাঃ করে হেসে উঠে বললেন, "তা হলে শালার কাছে তোমার যে মাথা হেঁট হতে হবে হে ফটিক। সেটা কি ভাল হবে?"

"শালার কাছে মাথা হেঁট হয় হোক। আমি ভূত দেখতে চাই না। এখন আমি বাড়ি যাব, বড্ড খিদে পেয়েছে।"

দুলালবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহু, সেটি তো হওয়ার উপায় নেই হে ফটিক। তুমি ভূত দেখতে চাও বলে সারাদিন ছোটাছুটি করে আমি আর পাঁচু মিলে কত কষ্টে একটা ভূত ধরেছি, এখন তুমি দেখতে না চাইলে হবে কী করে? পাঁচশো টাকা না থাকে তো চারশো নিরানব্বই টাকা পঁচানব্বই পয়সাই দাও। একেবারে জলের দর। রিডাকশন সেল যাকে বলে।"

ফটিকবাবু আরও তিন হাত পিছোতে গিয়ে মড়ার খুলি ও মোমবাতি-সহ টেবিলটায় ধাক্কা খেলেন। বললেন, "না-না, ভূত-টুত খুব খারাপ জিনিস। ও আমি দেখতে চাই না। যদি কেউ ভূত ধরে আমার সামনে নিয়ে আসে তাহলেও আমি চোখ বুজে থাকব।"

দুলালবাবু এখন আর আগের দুলাল নেই। গায়ের জোর যেমন বেড়েছে, তেমনি মেজাজটাও তিরিক্ষি হয়েছে। ফটিকবাবু পিছোচ্ছেন দেখে তিনি তার মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না। এক লাফ মেরে ঘরে ঢুকে তিনি ফটিকবাবুর ঘাড়টা চেপে ধরে একেবারে শূন্যে তুলে ফেললেন, "ভূত দেখতে চাও না? তা হলে এতদিন ধরে সবাইকে বলে বেড়ালে কেন যে, ভূত না দেখলে তোমার পেটের ভাত হজম হচ্ছে না? অ্যাঁ! ভূত যদি না দেখতে চাও তা হলে তোমাকেই ভূতের দেশে পাঠাব।"

এই সময়ে কে যেন পিছন থেকে মোলায়েমভাবে দুলালবাবুর পিঠে তিনটে টোকা দিয়ে অমায়িক গলায় বলল, "আজ্ঞে দুলালবাবু, যে পরিমাণ চেঁচামেচি

করছেন তাতে যে গণেশ ভয় খেয়ে আকাশে তিন মাইল ওপরে উঠে গেছে।"

দুলালবাবু বিরক্ত হয়ে ফিরে দেখলেন, পাঁচু গম্ভীর ও করুণ মুখে দাঁড়িয়ে।

"কী বললে?"

"বলছিলুম, আপনার চেঁচামেচিতে ভূত হাওয়া। আমি দুশো টাকা দর দিয়েছিলুম, এখন তো দু'পয়সাও আশা নেই।"

দুলালবাবু ফটিকবাবুকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "ভূতটা তা হলে গেল কোথায়?"

"বললুম তো পালিয়েছে।"

দুলালবাবু খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন, "ভূতটাকে বলো, ফের যদি পালায় তা হলে আমি তাকে আস্ত রাখব না।"

"বলব 'খন।"

"আর কাল যেন সে অবশ্যই এখানে হাজির থাকে। নইলে খুব খারাপ হয়ে যাবে।"

ফটিকবাবু সভয়ে বাক্যহারা হয়ে দৃশ্যটা দেখছিলেন। বললেন, "আমি কালও ভূত দেখতে চাই না। ভূত দেখার ইচ্ছে চলে গেছে।"

"চোপ!" বলে তাঁকে একটা পেল্লায় ধমক মারলেন দুলালবাবু।

ফটিকবাবু আবার পিছোলেন।

দুলালবাবু পাঁচুর দিকে চেয়ে বললেন, "চলো তা হলে আমার অন্য কাজে যাই।"

"কী কাজ?"

"চুরি-ডাকাতি যা হোক । কিছু তো করতে হবে।"

পাঁচু খুবই ক্ষুব্ধ গলায় বলল, "আপনার দোষ কী জানেন দুলালবাবু, সব ব্যাপারেই বড় তাড়াহুড়ো করেন। ভূতের কারবারটায় জলের মতো দু-দুশোটাকা চলে আসছিল হাতে, আপনি নাক গলিয়ে বারোটা বাজালেন। এসব কাজে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ধীর স্থিরভাবে কাজ করতে হয়। খুব সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচের ব্যাপার কিনা। কথার একটু এদিক-ওদিক হলেই মক্কেল সন্দেহ করতে শুরু করবে, পিছিয়ে যাবে, শেষে পালাবে।

দুলালবাবু একটু অপ্রস্তুত মুখে বললেন, "তা-বটে হে পাঁচু, কাজটা খারাপই করলাম। তবে আমাদের আয়ুটাও যে বেজায় কম। এত কম সময়ে কত কাজ করার আছে বলো তো। ওই হাড়কেপ্পন ফটিকের পিছনে মূল্যবান সময় নষ্ট করার মানেই হয় না।"

পাঁচু গম্ভীর হয়ে বলল, "একটা ভুল করে ফেলেছেন, কিছু বলছি না, কিন্তু এরপর কথাবার্তা যা বলার তা আমিই বলব, আপনি পিছনে থাকবেন।"

"তাই হবে হে পাঁচু, কিন্তু এখন কী করা যায় বলো তো! কিছু একটা না করলে

যে শরীরটা ঠাণ্ডা হবে না। চলো, কাউকে ধরে কিছুক্ষণ খুব পেটাই, তাতে শরীরটা ধাতস্থ হবে, মাথাটাও ঠাণ্ডা হয়ে আসবে।"

পাঁচু গম্ভীরতর হওয়ার চেষ্টা করে বলল, "আমাদের শাস্ত্রে আছে, ক্ষমতার অপব্যবহার করতে নেই। শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে হয়। ঠিক সময়ে ক্ষমতা কাজে লাগে।"

দুলালবাবু করুণ স্বরে বললে, "কিন্তু আমার হাত-পা যে বড্ড নিশপিশ করছে। কীরকম জানো? অনেকটা সুড়সুড়ির মতো। কিছু না করলে বড্ড কষ্ট হবে।"

পাঁচু বুঝদার মানুষ। দুলালবাবুকে এখনই একটু হাঙ্গামায় নামাতে না পারলে উনি আরও কিছু কেলেঙ্কারি করে বসতে পারেন। তাই সে বলল, "খুব উচাটন হয়ে থাকলে একটা কাজ করুন। ওই যে ঝুপসিমতো গাছটা দেখছেন ওটার গায়ে কয়েকটা ঘুসিটুসি মেরে আসুন।"

"মারব?" বলে দুলালবাবু রোষকষায়িত লোচনে গাছটার দিকে একবার তাকালেন। তারপর একটা হুঙ্কার দিয়ে গিয়ে কয়েকটা ঘুসি বসিয়ে দিলেন গাছটার গায়ে। বললেন, "তবে রে! তোরই একদিন কি আমারই একদিন!"

দুলালবাবুর গায়ে এখন সাঙ্ঘাতিক জোর। তাঁর ঘুসির চোটে গাছটা থরথর করে কেঁপে উঠল। গাছে যত পাখি ছিল তারা কিচিরমিচির করে চেঁচাতে লাগল। আর গাছ থেকে বড়-বড় সব গোল ও কালো ফল ধপাধপ পড়তে লাগল মাটিতে।

ফল দেখে দুলালবাবু খুশি হয়ে বললেন, "ওহে পাঁচু, দেখেছ কত ফল পড়েছে! কী ফল বলো তো! এরকম কালো আর বড় ফল তো জন্মেও দেখিনি! এ কি খাওয়া যায়?"

পাঁচু কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে বলল, "আজ্ঞে, ও হল জিকা গাছ। কস্মিনকালেও ও-গাছে ওরকম ফল হয় না।"

"হয় না, তা হলে ফল পড়ল কী করে?"

"সেটাই তো ভাবছি।"

ভাবতে হল না। ফলগুলো পড়ে নিজে থেকে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ ফট করে একটা ফল যেন ফেটে গেল। ভিতর থেকে খানিকটা ধোঁয়ার মতো জিনিস বেরিয়ে এসে লম্বা সুড়ঙ্গে একটি চেহারা ধরে ফেলল। সেই চেহারা দেখলে ভিরমি খেতে হয়। দু'খানা ভাটার মতো চোখ ধক-ধক করে জ্বলছে।

পাঁচু দৃশ্য দেখে হাঁ, দুলালবাবু মাথা চুলকোতে লাগলেন।

মূর্তিটা খোনা স্বরে বলল, "কে রে? কার এত বুকের পাটা? দেড় হাজার বছরের ঘুমটা মাটি করলি হতভাগা? আজ তোর মুণ্ডু যদি চিবিয়ে না খাই তবে আমার নাম পতিতপাবনই নয়।"

দেখতে-দেখতে অন্য ফলগুলোও ফটাফট ফাটতে লাগল আর একে একে সুড়ুঙ্গে-সুড়ুঙ্গে সব মূর্তি সুড়ুত-সুড়ুত করে বেরিয়ে আসতে লাগল। তারা যে বেজায় অসন্তুষ্ট, তা তাদের চেঁচামেচি আর হাবভাবে বেশ ভালই বোঝা যাচ্ছিল।

পাঁচু একটু চাপা গলায় বলল, "দুলালবাবু, ব্যাপারটা সুবিধের ঠেকছে না!"

"আমারও না।"

"কেটে পড়াই ভাল।"

"আমিও তাই বলি।"

"কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে কাজটা ভাল করেননি।"

"তুমিই তো গাছে ঘুসি মারতে বললে হে।"

মূর্তিগুলো কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠে সঠিক বুঝতে পারছিল না, কীর্তিটা কার। তাই নিজেদের মধ্যেই একটু ঝগড়া বিবাদ করছিল। সেই ফাঁকে পাঁচু আর দুলালবাবু দৌড় লাগালেন।

বাজারের কাছ-বরাবর পৌঁছে দুলালবাবু পাঁচুর ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পাঁচু পিছিয়ে পড়েছিল।

"দুলালবাবু, একটু দাঁড়ান, হাঁফ ছেড়ে নিই।"

"আমার যে আরও দৌড়তে ইচ্ছে করছে হে পাঁচু! আমি যে এখনও মাইল-দশেক দৌড়তে পারি।"

"লাভ কী? ক্ষমতার অপচয় করতে নেই। তেনারা সব পিছিয়ে পড়েছেন!"

দুলালবাবু একটু লাজুক গলায় বললেন, "লোকগুলো কে বলো তো পাঁচু?"

"আজ্ঞে, এখন আর এঁরা লোক নন, পরলোকের লোক। তবে আপনি ভারি একটা উপকারও করেছেন আমার। ওই গাছটাতেই যে তেনাদের বাসা, সেটা টের পাইনি এতদিন। পেয়ে খুব ভাল হল। ভূতের কারবারে কাঁচা পয়সা।"

দুলালবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, "তবে চলো একটা থলে নিয়ে গিয়ে সব ক'টাকে ভরে ফেলি।"

পাঁচু মাথা নেড়ে বলল, "আগেই বলেছি আপনাকে, সব কাজে তাড়াহুড়ো করতে নেই। এখন যদি ফিরে যান তবে তেনারা রাগের মাথায় এখন ছিঁড়ে ফেলবেন। ঘাপটি মেরে থাকুন। তেনারা আবার ঠাণ্ডা হয়ে গাছে উঠে গুটি পাকিয়ে ঘুমোতে থাকুন, পরে ব্যবস্থা হবে।"

"বলছ।"

"বলছি।"

"কিন্তু এখন তবে কী করা যায়?"

"চলুন, ওই রকটায় বসে একটু ভাবি। সব কাজ কি গায়ের জোরে হয়? বুদ্ধি

খাটাতে হয়।"

রাত খুব বেশি হয়নি। তবে মফস্বলের শহর আর শীতকাল বলে এর মধ্যেই চারদিকটা বেশ নির্জন হয়ে গেছে। বাজারের দোকানপাটও সবই প্রায় বন্ধ। দু-একটা খোলা আছে মাত্র।

দু'জনে রক-এ বসে ভাবতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর পাঁচু বলল, "দুলালবাবু।"

"হুঁ।"

"বাজারের শেষ মাথায় হরেন কর্মকারের দোকানে এখনও আলো জ্বলছে, দেখতে পাচ্ছেন?"

"পাচ্ছি।"

"হরেনের মেলা টাকা। রাত্রিবেলা যখন দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরে তখন কোমরের গেঁজের মধ্যে দশ-বিশ হাজার টাকা হেসে খেলে থাকে।"

দুলালবাবু উঠে পড়তে-পড়তে বললেন, "তাই নাকি? তবে তো দেখতে হচ্ছে।"

পাঁচু হাত তুলে বলল, "দাঁড়ান, আরও কথা আছে। হরেনের সঙ্গে দুটো বিশ্বাসী পাহারাদার থাকে। তাদের হাতে লাঠি, কোমরে ভোজালি।'

দুলালবাবু একটা তাচ্ছিল্যের ভাব করে বললেন, "ফুঃ! মোটে দুটো পাহারাদার। ও আমি এক লহমায় উড়িয়ে দেব।"

বিচক্ষণ পাঁচু মাথা নেড়ে বলল, "কাজটা সহজ হবে না দুলালবাবু। হরেনের কাছে ছোট বন্দুকও আছে। কৌশল করা ছাড়া উপায় নেই।"

"কৌশলটা কী?"

"আপনার হাতে একটা আংটি দেখছি। ওটা কি সোনার আংটি?"

দুলালবাবু বললেন, "হ্যাঁ সোনা বইকী!

"তা হলে ওটা খুলে নিয়ে সোজা হরেনের কাছে চলে যান। ও সোনা বাঁধা রাখে। বাঁধা দেওয়ার নাম করে লোকটাকে পরখ করে নিন। তারপর কথাটথা বলতে থাকুন। সুযোগের সন্ধান করতে থাকুন।"

দুলালবাবু অধৈর্য হয়ে বললেন, "ওসব আমার পোষাবে না। কথাটথা আমার আসে না। আমি চাই কাজ।"

"তা হলে আংটিটা আমার হাতেই দিন! আমি গিয়ে ব্যাপারটা একটু বুঝে আসি। ভয় নেই, আংটি নিয়ে পালাব না। আমার ঘাড়ে তো একটা বই দুটো মাথা নেই।"

দুলালবাবু হেলাভরে আংটিটা খুলে পাঁচুর হাতে দিয়ে বললেন, "সামান্য

আংটিও তোমাকে গুরুদক্ষিণাই দিলাম ধরে নাও। সামান্য আংটি গেলে যাক, তার বদলে যদি কয়েক হাজার টাকা আসে।”

পাঁচু আংটিটা নিয়ে উঠল, গুটিগুটি গিয়ে সে যখন হরেনের দোকানে ঢুকল, তখন হরেন একটা হিরে বা মুক্তো মন দিয়ে দেখছে। সামনে দু'জন খদ্দের বসা। দরজায় দুটো ভোজপুরি দারোয়ান। তাদের চোখ একেবারে বুকের ভিতরে এসে সেঁধোয়।

হরেন পাঁচুকে পাত্তাও দিল না! পাথরটা রেখে সে খদ্দেরদের সঙ্গে নিচু স্বরে কথা বলতে লাগল, পাঁচু দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। সে ধৈর্যশীল লোক। জানে সবুরে মেওয়া ফলে। তবে দাঁড়িয়ে থেকে সেসব দিকে চোখ রাখছিল। কোথায় কী আছে, কী থাকতে পারে।

অনেকেক্ষণ বাদে খদ্দেররা বিদায় নিলে হরেন পাঁচুর দিকে চেয়ে চোখ ছোট করে বলল, “কী হে, তোমার মুখখানা যেন চেনা-চেনা ঠেকছে।”

“আজ্ঞে, এই বাজারেই পান বেচি।”

“বটে! তবে কী মনে করে?”

“একটু বিপদে পড়ে গেছি হঠাৎ। বড্ড টাকার দরকার।”

“বটে! দরকার ছাড়া আর এই অধমের কাছে কে আসবে বলো। তা জিনিসপত্তর কী এনেছ?”

“এই আংটিটা। আমার দাদামশায়ের জিনিস, সাবেক মাল।”

হরেন আংটিটা নিয়ে কয়েক সেকেন্ড মাত্র দেখল, তারপর কষ্ঠিপাথরে ঘষে রংটা দেখে বলল, “অনেক ভেজাল আছে হে, তা কত চাও?”

“আজ্ঞে দু-চার হাজার যা দেবেন।”

হাজার শুনে হরেন অট্টহাস্য করে উঠল। মিনিটখানেক সে হাসির দমকে কথাই বলতে পারল না। তাতে তার গায়ের ফতুয়া ভুঁড়ির ওপরে উঠে গেল। কোমরের গেঁজেটা টপ করে দেখে নিল পাঁচু। তার আন্দাজ নির্ভুল। গেঁজেতেই মালপত্র থাকে তা হলে।

হরেন হাসি থামিয়ে আংটিটা ফেরত দিয়ে বলল, “তুমি বেশ মজার লোক হে। এই আংটিতে দু-চার হাজার টাকা যে চায় তার স্থান হল পাগলাগারদ। যাও তো, এখন আমি উঠব।”

“যে আজ্ঞে।” বলে পাঁচু উঠল।”

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই বাধা পড়ল। দুই দরোয়ান একসঙ্গে “এই, এই”বলে চেঁচিয়ে উঠল বিকট স্বরে।

পাঁচু চোখ বুজে ফেলল।

চোখ বুজলেই কি আর রক্ষে পাওয়া যায়? পাঁচু চোখ বুজেও রেহাই পেল না। কান তো আর বন্ধ নেই। শুনতে পেল দুমদাম দমাস সব সাঙ্ঘাতিক শব্দ। দুলালবাবু হেঁড়ে গলায় চেঁচাচ্ছেন, "আমাকে রুখবি এত ক্ষমতা তোদের? অ্যাঁ! এই দিলুম এক ঘুঁষো... কেমন বুঝছিস রে পাজি?...... ওরে ছুঁচো, আমাকে ল্যাং মারা হচ্ছে? এই নে, তোকেও দিলুম এক রদ্দা....কেমন লাগছে রে? ছ্যাঃ, দু-দুটো মুশকো জোয়ান তোরা, দু'বেলা নিশ্চয়ই ভরপেট খাস, ডন বৈঠক দিস, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা গেলি বাবা! না, না, হরেন, এ কোনও কাজের কথা নয়, এই দরোয়ান তোমার চলবে না..."

বলতে-বলতে দুলালবাবু হাতটাত ঝেড়ে হাসি-হাসি মুখে দোকানে ঢুকলেন। ভাবখানা এমন, যেন কিছুই হয়নি।

পাঁচু চোখ চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কারণ সে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে, হরেন কর্মকার তার রিভলভারটা বের করে ইতিমধ্যে বাগিয়ে ধরেছে আর বাঘা চোখে দুলালবাবুর কীর্তিকলাপ লক্ষ করছে। হরেন পাকা লোক, খামোখা ঘাবড়ে গিয়ে চেঁচামেচি করেনি। দরকার হলে তার হয়ে হাতের অস্ত্রটাই কথা কইবে।

কিন্তু দুলালবাবুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। হরেন কর্মকারের দিকে চেয়ে বললেন, "তা ভাল আছ তো হরেনভায়া? অনেকদিন বাদে দেখা। একটু শুকনো-শুকনো দেখাচ্ছে যেন! তা ভাল। বয়স হলে রোগা হওয়া স্বাস্থ্যের লক্ষণ। তা আর সব খবরটবর কী? কাজ কারবার তা হলে ভালই চলছে! অ্যাঁ?"

হরেন তার অস্ত্রটা আর-একটু শক্ত করে ধরে ঠাণ্ডা গলায় বলল, আপনি কে? এখানে আগমনই বা কিসের জন্য?"

দুলালবাবু ভারি অভিমানের গলায় বললেন, "সে কী! আমাকে চিনতে পারছ না হরেনভাই? কলিকালটা যে বড়ই জাঁকিয়ে বসেছে বলে মনে হচ্ছে! সেই যে গো, বছর-পনেরো আগে আমার মরা মায়ের একজোড়া কানপাশা বাঁধা রেখে তোমার কাছ থেকে পঞ্চাশটা টাকা কর্জ করেছিলুম, মনে নেই! সুদে-আসলে দেড়শো টাকা ফেরত দেওয়ার কথা ছিল। সে আর জোগাড় হল না বলে কানপাশা দুটো তুমি গাপ করে ফেললে!"

হরেন কর্মকার ঠাণ্ডা গলাতেই বলল, "জিনিস বাঁধা রাখাই আমার ব্যবসা। দিনরাত হাজারটা লোক আসছে। সবাইকে মনে রাখা আমার কাজ নয়।"

"সে কী হে! দুলাল-মাস্টারকে ভুলে গেলে হে হরেন? এরপর তো নিজের মায়ের পেটের ভাইকেও চিনতে পারবে না! কলিকালে যে কত কী হয়! তা সে-কথা থাক ভায়া, কাজের কথাটাই বরং হয়ে যাক। ওই যে দেখছ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ভালমানুষের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, ও হল পাঁচু মোদক। মুখ দেখে

কিচ্ছুটি বুঝতে পারবে না রে ভাই, এক্কেবারে বিচ্ছু একটি। দিনে-দুপুরে রাহাজানি করে বেড়ায়। আর আমি হলুম যে, ওরই শাগরেদ, দুলাল গুণ্ডা। হেঁ হেঁ। রাজযোটক যাকে বলে।"

হরেন দরজার কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়ে-থাকা তার দু-দুটো দরোয়ানের দিকে একবার করুণ নয়নে চাইল। তারপর রিভলভারটা দুলালবাবুর দিকে তাক করে বলল, "আমি পোড়-খাওয়া লোক, অনেক দেখেছি, অনেক শয়তান বদমাশকে টিটও করেছি। এখানে খুব সুবিধে হবে না। মাথার ওপর হাত তুলে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ান, নইলে গুলি চালাব।"

দুলালবাবু একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন, হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর দুঃখিত গলায় বললেন, "তোমাদের দরোয়ানদের নয় ভদ্রতাবোধ নেই, তা বলে তুমিও কি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেললে ভায়া? অতিথি হল নারায়ণ। আগের দিনে অতিথি-অভ্যাগতদের কত সম্মান ছিল। কলিকালে দেখছি সবই গেছে। তা ভায়া, অতিথি-সৎকার না-হয় না-ই করলে, কিন্তু একটু বসতে তো দেবে, একটু জলটল তো খাওয়াবে! এ কী ব্যবহার তোমার!"

হরেন রিভলভারের ঘোড়ায় আঙুলটা কি একটু জোরেই টিপে ধরল? পাঁচু সভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল আবার। না, পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে আজ আর বোধহয় ফেরা যাবে না।

হরেন গর্জন করে উঠল, "খবর্দার! আর এগোলে কিন্তু...."

দুলালবাবু হরেনের হুমকি অগ্রহ্য করে তবু এক পা এগিয়ে গিয়ে একগাল হেসে বললেন, "আমি জানি হে হরেন, তোমার বড় দয়ার শরীর। তুমি পিঁপড়ে পর্যন্ত মারতে শেখোনি। ওইসব বন্দুক-পিস্তল কি ভাই তোমার হাতে শোভা পায়? বড় বিপজ্জনক জিনিস। ও তুমি রেখে দাও বাক্সের মধ্যে। ওসব ঘাঁটাঘাঁটি করলে মনের মধ্যে জিঘাংসা আসে, নিরীহ লোকের মাথাতেও খুন চেপে যায়। রেখে দাও ভাই। অনেকদিন বাদে তোমাকে দেখে ভারি ভাল লাগছে। আঙুল ফুলে কলাগাছটি হয়েছে, দিব্যি ফলাও কারবার ফেঁদে বসেছ, দু'পয়সা আসছে, এ দেখেও চক্ষু সার্থক।"

হরেন এবার বাস্তবিকই চঞ্চল হল। কথাটা ঠিকই যে, সে কখনও খুন-খারাপি করেনি। দরকারও হয়নি বড় একটা। এখনও করতে চাইছে না। শুধু ভয় দেখাতে চাইছে। কিন্তু লোকটা যে কেন ভয় পাচ্ছে না, তাও বুঝে ওঠা দুষ্কর। সে এবার একটু কাঁপা গলায় বলল, "এবার ভয় না পেলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে।"

দুলালবাবু খুব হাসলেন। একেবারে খিকখিক করে হাসতে লাগলেন। যেন এরকম মজার কথা জীবনে শোনেনি। তারপর গদগদ করে বললেন, "তোমাকে

ভয় পাব! কেন হে হরেন? তোমার মতো একজন নিরীহ সজ্জনকে ভক্তি করব, শ্রদ্ধা করব, কিন্তু ভয় পাব কেন? এই যে তুমি এত উন্নতি করেছ, এতে কি আমার আনন্দ হচ্ছে না? আমি গর্ব অনুভব করছি না? খুব করছি হে হরেন, খুব করছি। বাঙালির আজ ভারি দুর্দশা। তার মধ্যে তুমি যে উন্নতি করেছ, এটা যে খুব আশার কথা ভাই। ভয়ের কথা এখানে উঠছে কিসে?''

ওই বলে দুলালবাবু দু'হাত বাড়িয়ে একেবারে প্রেমানন্দে হরেনের দিকে এগিয়ে গেলেন, বললেন, ''এসো এসো ভাই, বাঙালির গৌরব, আমাদের গৌরব, এসো কোলাকুলি করি। আমার মায়ের কানপাশাজোড়া গাপ করেছ বটে, কিন্তু আমি ভাই চৈতন্যদেবের ওই কথাটা বড় বিশ্বাস করি, মেরেছ কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না....''

হরেন সভয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে রিভলভার তুলে বলল, ''খবর্দার বলছি, ভাল হবে না! খুন হয়ে গেলে কিন্তু আমাকে দায়ী করতে পারবেন না বলে দিচ্ছি। এই তবে ছুঁড়লুম গুলি.....''

বলে বাস্তবিকই হরেন তার রিভলভারের ঘোড়া টিপে দিল। পাঁচু বিপাক বুঝে আগেই মেঝেয় শুয়ে পড়েছিল। এবার চোখও বুজে ফেলল। ভয় হল, দুলালবাবুর লাশটা নির্ঘাত তার ঘাড়েই এসে পড়বে। রক্তটক্তও লেগে যেতে পারে। সে তো গেল একটা ঝামেলা। তারপর খুনের মামলায় সাক্ষীটাক্ষি দেওয়ার হ্যাপাও কি কম? নাঃ, দুলালবাবুর সঙ্গে কাজ-কারবারে নামাটাই একটা মস্ত ভুল কাজ হয়েছে।

'ঢিসুম' শব্দ করে হরেনের রিভলভারের গুলি ছুটল। তবে হরেনের কাঁপা হাতের গুলি কারও কোনও ক্ষতি করল না। দরজা দিয়ে উড়ে গিয়ে উলটো দিকের একটা চালাঘরের চালে গিয়ে সেঁধোল।

কিন্তু হরেন ভাবল, তার গুলিতে নির্ঘাত লোকটা মরেছে। জীবনে এই প্রথম তার গুলি ছোঁড়া। শব্দে সে নিজেই ঘাবড়ে গেল। চোখ বুজে রিভলভারটা ফেলে কাঁপতে-কাঁপতে বসে পড়ল সে। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে ''রাম-রাম, হরি-হরি'' করতে লাগল। নরহত্যার মতো পাপ নেই। আর তার হাতেই কিনা আজ একটা নরহত্যা হয়ে গেল! এই হাতে যে রোজ সকালে ঠাকুরের ফুল তোলে, লক্ষ্মীনারায়ণের পট পরিষ্কার করে, নারায়ণশিলাকে দুর্বো-গঙ্গাজলে স্নান করায়। এখন এই খুনে হাত দিয়ে আর কি সেসব পুণ্যের কাজ করা যাবে? ঠাকুর কি আর তার দিকে মুখ তুলে চাইবেন? ছিঃ ছিঃ, এ কী হল? না-হয় যেতই কয়েক হাজার টাকা, কিছু সোনাদানা আর হিরে-জহরত! গেলেও অনেক থাকত হরেনের। কিন্তু নরহত্যা করে যে সে নিজের স্বর্গে যাওয়ার রাস্তাটাই বন্ধ করে দিল। তার মতো পাতকীকে এখন ক'হাজার বছর নরকবাস করতে হয় কে জানে!

ভাবতে-ভাবতে হরেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

হরেনের দুঃখ দেখে দুলালবাবুও স্থির থাকতে পারলেন না। সামনের লোহার বেড়াটা ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকে ক্যাশবাক্সের ওপর বসে হরেনের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "কেঁদো না হে হরেন, কেঁদো না। জানি তুমি হিসেবী মানুষ, একটু-একটু কিপ্টেও, একটা গুলি খরচ হয়ে যাওয়ার শোকটা সামলাতে পারছ না। কিন্তু আমি বলি কি, একটা গুলির কীই-বা এমন দাম! দু-আড়াই টাকার বেশি হবে কি? তা বেঁচে থাকতে গেলে ওরকম দু-আড়াই তো ভাই কতদিক দিয়েই যায়। ভেবে কী করবে?"

হরেন দু'হাতে মুখ ঢেকেই কাঁদতে-কাঁদতে বলল, "দু-আড়াই গেছে যাক, কিন্তু একটা নরহত্যা হয়ে গেল যে! মহাপাপ হয়ে গেল। এখন কী হবে।"

দুলালবাবু বিজ্ঞের মতো হেসে বললেন, "তাই বলো। পাপ নিয়ে ভাবছ! ভাই রে দুনিয়াতে এমন কোনও সমস্যাটা আছে যার সমাধান নেই? নরহত্যা, মিথ্যে কথা, চুরি-জোচ্চুরি সব কিছুরই নিদান আছে, আমি বলি কি ভায়া, কিছু মূল্য ধরে দাও, তা হলেই পাপটাপ সব কেটে যাবে। বেঁচে থাকতে গেলে ওরকম দু-চারটে নরহত্যা না করে উপায়ই বা কী?"

হরেন যেন এ-কথায় একটু শান্ত হল। লাল দু'খানা চোখ মেলে বলল, "নরহত্যার রেট কত জানেন?"

একগাল হেসে দুলালবাবু বললেন, "তা আর জানি না ভায়া! এই কর্ম করে-করেই তো চুল পাকিয়ে ফেললুম। তা হাজার-পাঁচেক যদি ছাড়ো তো লাশ-টাশ একদম গুম করে ফেলব। কেউ টেরটিও পাবে না।

হরেন হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে বড়-বড় চোখে চেয়ে বলল, "কিন্তু আপনি তো মরেননি! দিব্যি বেঁচে আছেন।"

দুলালবাবু মুখটা গোমড়া করে বললেন, "ভাই রে, আমি মরলে তবু ভাল ছিল। যাকে মেরেছ সে আমার গুরু। ওই দ্যাখো, পাঁচু মোদকের লাশ পড়ে আছে। যে-সে লোক তো নয়, কাঁচা-খেকো তান্ত্রিক। মাটি থেকে চার হাত শূন্যে উঠে ভাসতে-ভাসতে ধ্যানজপ করে, শবসিদ্ধ পিশাচসিদ্ধ যোগীপুরুষ। এমন মানুষকে মারলে পাপ কতগুণ বেড়ে যায় তা জানো? আমাকে মারলে যদি তোমার এক কেজি পাপ হয় তো পাঁচু মোদককে মারলে হয় পঁচাত্তর কেজি। পাঁচ হাজার রীতিমত কমই বলেছি হে।"

হরেন একটু কিন্তু-কিন্তু করতে লাগল। বলল, "লোকটা যে সত্যিই মরেছে তার প্রমাণ কী? আমি তো ওর দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়িনি।"

দুলালবাবু বললেন, "আমাকে ফসকে গিয়ে ওকেই লাগল কিনা। একেবারে মাথা ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। দ্যাখো না, কেমন দাঁত ছরকুটে পড়ে আছে। আর দেরি কোরো না ভায়া, বন্দুকের শব্দ বহুদূরে যায়। লোকজন এসে পড়ার আগেই লাশ সরাতে হবে। পরের জন্য খেটে খেটেই গেলুম।"

"কত বললেন?"

"পাঁচ হাজারই দাও। প্রাণের দাম তার চেয়ে ঢের বেশি।"

ঠিক এই সময়ে "এঃ, এই লোকটা কেবল আমাকে কাতুকুতু দিচ্ছে" বলে হরেনের পাহারাদারদের একজন সটান উঠে বসল।

পাঁচু লোকটাকে কাতুকুতু মোটেই দেয়নি। তার কোমরের কাছে একটা মশা কামড়েছে। সে চুলকোচ্ছিল। লোকটা পাশেই ছিল বলে হাতটা একটু লেগে গেছে হয়তো। কিন্তু সে প্রতিবাদ না করে মড়া সেজে পড়ে রইল।

কিন্তু লোকটা মহা ত্যাঁদড়। উঠে বসে তাকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, "এই লোকটা, ওঠো, উঠে পড়ো। অনেকক্ষণ ধরে বদমায়েশি করে যাচ্ছ।"

পাঁচু একটা চোখ খুলে লোকটাকে দেখে নিয়ে চাপা গলায় বলল, "আমি না। আমি কিছু করিনি। ওই লোকটা করেছে।" বলে দুলালবাবুকে দেখিয়ে দিল।

পাঁচুর কথা শুনে পাহারাদারটা দুলালবাবুর দিকে চাইল। তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই লোকটাই তো! একটু আগে বেকায়দায় পেয়ে আমাকে রদ্দা মেরেছিল। তবে রে.....।"

বলে লোকটা এক লাফে লোহার বেড়াটা ডিঙিয়ে দুলালবাবুকে জাপটে ধরল।

দুলালবাবু ভারি বিরক্ত হয়ে লোকটাকে আর-একটা রদ্দা কষিয়ে হাঁটুর নীচে চেপে ধরে রেখে বললেন, "একটা জরুরি কথা হচ্ছে, এর মধ্যে কি হুটোপাটি করতে হয় রে দুষ্টু ছেলে : তারপর হরেনভায়া, বলো।"

হরেন বড়-বড় চোখে দৃশ্যটা দেখল। তারপর চোখ বুজে ফেলে বলল, পাহারাদারগুলোকে কালই বিদায় করে দেব।"

দুলালবাবু খুব উৎসাহের গলায় বললেন, "সে খুব ভাল কথা। এসব রোগা দুবলা জীব দিয়ে কি আর ডানপিটেদের কাজ হয়! ও, কাল থেকে আমি আর পাঁচু মিলেই তোমার দোকান পাহারা দেব'খন। মাথাপিছু মাসে হাজারখানেক করে টাকা দিও, তাতেই হবে। আমাদের খাঁই বেশি নয়, আর তোমার দিকটাও তো দেখতে হবে।"

হরেন এবার চোখ খুলল, "ওকে ছেড়ে দিন। আর বেশিক্ষণ ওভাবে চেপে রাখলে মরে যাবে। রদ্দা খেয়েই বেচারা অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

"তাই নাকি!" বলে ভারি লজ্জিত মুখ করে দুলালবাবু লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "আর দেরি কোরো না ভায়া। টাকাটা ফেলে দাও, আমি লাশটা ঘাড়ে করে বেরিয়ে পড়ি। সেই পশ্চিমের জঙ্গলে গিয়ে কোদাল-গাঁইতি নিয়ে গর্ত করতে হবে, লাশ পুঁততে হবে, অনেক ঝামেলা। তোমার মুখ চেয়েই কষ্টটা স্বীকার করছি।"

হরেন মুখখানা তোম্বা করে বলল, "কাকে পুঁতবেন? লোকটা তো মরেনি।"

দুলালবাবু অবাক হয়ে বললেন, "মরেনি মানে? আলবত মরেছে। ওর ঘাড় মরেছে। না মরে ওর উপায় আছে।"

হরেন মাথা নেড়ে বলে, "আমি বলছি মরেনি। একটু আগেই আমি ওকে মশা মারতে দেখেছি।"

দুলালবাবু খুব হেসেটেসে মাথা নেড়ে বললেন, "না রে ভাই, না। ও তোমার চোখের ভুল।"

"মোটেই ভুল নয়। ওর কনুইয়ের গুঁতোয় আমার দারোয়ান রাম সিং পর্যন্ত মূর্ছা ভেঙে উঠে পড়েছে।"

দুলালবাবু নিতান্ত ভালমানুষের মতো মুখ করে বললেন, "ওরকম হয়, মরার পরও হাত-পা একটু-আধটু নড়ে।"

"তার মানে?"

"পাঁঠা বলি দ্যাখোনি? গলা কেটে ফেলার পরও পাঁঠাটা কেমন ছটপট করে পা টানা দেয়, ম্যা-ম্যা করে ডাকে!"

"মোটেই ম্যা-ম্যা করে ডাকে না।"

"আহা, না ডাকলেও ছটফট তো করে। এও তাই। লোকটার মাথা ফুটো করে গুলি বেরিয়ে গেল, স্বচক্ষে দেখলাম। গুলির সঙ্গে ওর প্রাণটা লেগে ছিল। প্রাণটা নিয়েই গুলিটা বেরিয়ে গেল কিনা। একেবারে টা-টা গুডবাই করে চলে গেল।"

"আপনারা দু'জনেই জোচ্চার। ওই দেখুন, লোকটার চোখ মিটমিট করছে। ওই যে, কোমরের নীচে হাত দিয়ে চুলকোচ্ছে!"

"বটে! এত বড় সাহস!" বলে দুলালবাবু এক লাফে গিয়ে পাঁচুর ঘাড়টা চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করালেন। তারপর বললে,ন "বলি দু'দণ্ড চুপ করে মটকা মেরে শুয়ে থাকতে পারো না, আর এই বিদ্যে নিয়ে বড়াই করে বেড়াও! ছিঃ ছিঃ!"

পাঁচু কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "বড্ড মশা যে!"

"মশা! সামান্য মশার কামড়েই এই দশা! পায়ে কামড়েছে! দিলে তো দাঁওটার বারোটা বাজিয়ে। লোকটাকে ভজিয়ে-ভজিয়ে যখন কাজটা প্রায় সেরে এনেছি তখনই উনি মশা মারতে লাগলেন।"

পাঁচু আমতা-আমতা করে বলল, "সব কাজেই যে কেন আপনার এত তাড়াহুড়ো তা বুঝি না। বুদ্ধিটাও বড্ড গোলমেলে। হরেন যখন অস্ত্র ফেলে কাঁদতে বসেছিল তখনই তো ওকে একটা রদ্দা মেরে টাকাটা কেড়ে নিতে পারতেন। তা না করে আপনি আমাকে মড়া সাজাতে গেলেন। এই বুদ্ধি নিয়ে কি কাজ হয়?"

"তাও তো বটে!" বলে দুলালবাবু হরেনের দিকে তাকালেন। কিন্তু হরেন এখন অস্ত্রটা তুলে নিয়ে ফের বাগিয়ে ধরেছে। দুলালবাবু দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললেন, "এঃ হেঃ, বড্ড ভুল হয়ে গেছে হে।"

পাঁচু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আজকের দিনটাই দেখছি অপয়া।"

হরেন কর্মকার মৃদু একটু বিজ্ঞের হাসি হেসে বলল, "সেটা যদি বুঝতে পেরে থাকো, তা হলে এক মিনিটের মধ্যে আমার দোকান থেকে বেরোও। নইলে পুলিশে দেব।"

দুলালবাবু একটু হেসে অমায়িকভাবে বললেন, "তাই ডাকো হরেনভায়া, সেইটেই ভাল হবে। আমি বরং পাঁচুকে বেঁধে ফেলে পাহারা দিতে থাকি, তুমি ততক্ষণে গিয়ে চট করে পুলিশ ডেকে আনো। এসব লোককে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। তোমার দয়ার শরীর, জানি। তবু বলি, সমাজের ভালোর জন্যই এইসব লোককে যখন-তখন ক্ষমা করে দেওয়াটাও কাজের কথা নয়। যাও, তুমি বেরিয়ে পড়ো। আর দেরি করো না।"

হরেন গম্ভীর হয়ে বলল, "ওসব চালাকি আর খাটবে না। যা বলছি শোনো, এক মিনিটের মধ্যে যদি বেরিয়ে না যাও তো আমি গুলি চালাব।"

"এই যে বললে পুলিশ ডাকবে।"

"বলেছিলাম বটে, তবে ভেবে দেখলাম, যা করার নিজের হাতেই করা ভাল। গত বছর এক জ্যোতিষী আমার হাত দেখে বলেছিল বটে যে, আমার হাতে নরহত্যা আছে। তখন বিশ্বাস করিনি। এখন মনে হচ্ছে, কথাটা মিথ্যে বলেনি, আছেই যখন নরহত্যা, তখন ঘটেই যাক আজ।"

এই বলে হরেন তার অস্ত্রটা তুলে দুলালবাবুর দিকে তাক করল।

দুলালবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "নলটা আমার দিকে তাক না করে তোমার উচিত ছিল পাঁচুর দিকে তাক করা। আমি মানুষ তো খারাপ নই হে হরেনভায়া। সুযোগ পেয়েও তোমায় রদ্দা মারলুম না, নিজের চোখেই তো দেখলে। যাকগে, কলিকালে কারও ভাল করতে নেই। মানুষ বড্ড নেমকহারাম হয়ে গেছে। চলে হে পাঁচু, হরেনভায়ার এখানে আর সুবিধে হবে না।"

পাঁচু বিবেচকের মতোই ঘাড় নেড়ে বলল, "আমারও তাই মত। যেখানে লাভের আশা নেই সেখানে সময় নষ্ট করার কোনও মানেই হয় না।"

দুলালবাবু হরেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তা হলে আসি ভায়া, দেখা হয়ে বড় আনন্দ পেলুম। আমার মায়ের দুলজোড়া যে তোমার কাছেই বাঁধা। সেটা ভেবে ভারি আনন্দ হচ্ছে। তোমার মতো ভাল লোক হয় না।"

হরেন ধমক মেরে বলল, "আর কথা বাড়িও না। কেটে পড়ো।"

"যাচ্ছি, যাচ্ছি। তাড়া দিতে হবে না" বলে দরজার দিকে পা বাড়িয়েও দুলালবাবু ফিরে এলেন, "একটা কথা মনে পড়ল ভায়া। দারোয়ানটাকে বড্ড জোরে চেপে ধরে রেখেছিলুম, এখন কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে, সত্যি-সত্যি মরে যায়নি তো? দ্যাখো তো নাকের সামনে হাত দিয়ে শ্বাস চলছে কি না! মরে গিয়ে থাকলে হ্যাপাটা তোমাকেই তো সামলাতে হবে।"
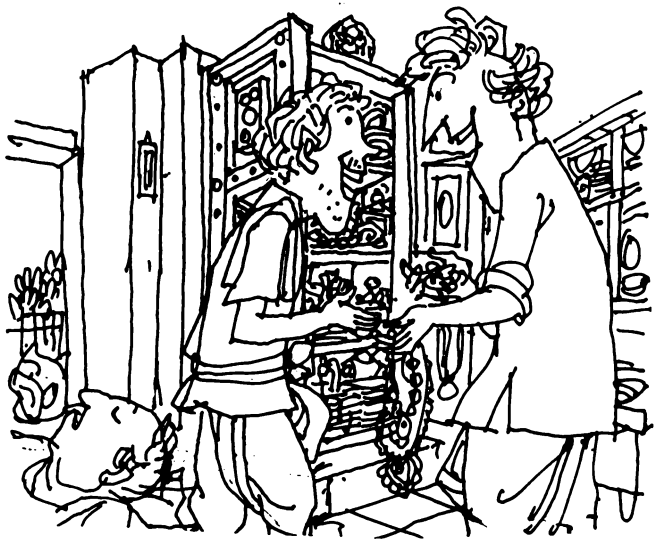
হরেন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেলে গেল। তারপর কী ভেবে একটু নিচু হয়ে লোকটার নাকের সামনে হাত রাখল।

এই সুযোগটার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন দুলালবাবু। হরেন যেই নিচু হয়েছে অমনি তিনি হনুমানের মতো লাফ মেরে বেড়া ডিঙিয়ে সোজা তার ঘাড়ের ওপর পড়লেন। তারপরেই এক রদ্দা।

পাঁচু চোখ বুজে ফেলেছিল। সে চোর বটে, কিন্তু খুনে নয়। চোখ বুজেই সে বলল, "রক্ষে করুন দুলালবাবু, লোকটাকে মেরে ফেলবেন না।"

দুলালবাবু একগাল হেসে বললেন, "আরে না। এই দ্যাখো, লোকটার গেঁজের মধ্যে কত টাকা। বিশ-ত্রিশ হাজার তো হবেই।"

পাঁচু চোখ খুলে গদগদ হয়ে বলল, "বলেন কী! এ তো আমার ছ'মাসের রোজগারের চেয়েও বেশি। নাঃ, আপনি বাহাদুর বটে!"

দুলালবাবু হরেনের চাবি নিয়ে তাড়াতাড়ি সিন্দুক খুলে ফেললেন। তার মধ্যে বিস্তর সোনাদানা, দামি পাথর, রুপোর বাসন থরে থরে সাজানো।

"দ্যাখো হে পাঁচু।"

"আজ্ঞে দেখছি। চোখের পলক পড়ছে না। তবে দুলালবাবু, একটু হাত চালিয়ে। এসব কাজে সময় নিতে নেই।"

"সে কি হে পাঁচু! এই যে তুমি বলো আমি তাড়াতাড়ি করে কাজ পণ্ড করি।"

"আজ্ঞে সে-কথাটাও ঠিক। কিন্তু এখন তাড়াতাড়ি না করলে লোকজন এসে পড়তে পারে।"

পাঁচু কথাটা শেষ করতে-না-করতেই দরজার বাইরে থেকে কার যেন গলা পাওয়া গেল, "হরেন, আছ নাকি হে!"

পরমুহূর্তে দেখা গেল, বিশাল চেহারার খাকি পোশাক-পরা একটা লোক দরজা জুড়ে দাঁড়াল, তারপরই বলে উঠল, "এ কী? এসব কী কাণ্ড?"

পাঁচু ফুট করে একটা আলমারির পাশে ঢুকে গা-ঢাকা দিল।

দুলালবাবু নির্বিকারভাবে সিন্দুক থেকে জিনিসপত্র বের করতে-করতে বললেন, "আর বলবেন না দারোগাবাবু, দিনকাল যা পড়েছে আর কহতব্য নয়।"

দারোগাবাবু তাঁর রিভলভারের বাঁটে হাত রেখে বললেন, "তিন তিনটে লাশ পড়ে আছে, জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড, কী ব্যাপার? আর আপনিই বা কে?"

দুলালবাবু সোনারুপো সব গুছিয়ে হরেনের আলোয়ানে পোঁটলা বাঁধতে-বাঁধতে বললেন, "চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটে গেল দারোগাবাবু। ভয়ে তো আমার মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। মায়ের একজোড়া দুল বাঁধা দিয়ে কয়েকটা টাকা ধার নেব বলে হরেনভায়ার কাছে এসেছিলাম। অনেকদিন বাদে দেখা তো, বসে বসে দু-চারটে সুখ-দুঃখের কথাও বলছিলাম। এমন সময়ে চার-চারটে বন্দুকধারী ডাকাত এসে হাজির।"

"বলেন কী?"

"আজ্ঞে, তাই তো বলছি, দেশে আইনকানুন বলে আর কিছু রাইল না দারোগাবাবু। ভরসন্ধেবেলা হরেনভায়ার মতো একটা নিরীহ লোকের ওপর চড়াও হয়ে এসব কী কাণ্ড বলুন তো।"

দারোগাবাবু তিনজন মূর্ছিত লোকের দিকে চেয়ে বললেন "এরা কি বেঁচে আছে?"

"বলতে পারছি না। না থাকারই কথা। আমি হরেনভায়ার জিনিসগুলো একটু গুছিয়ে দিচ্ছি। নেইও বিশেষ কিছু, সব চেঁছেপুঁছে নিয়ে গেছে। যা আছে তা ওর বউকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"ডাকাতরা কোনদিকে গেল বলুন তো?"

"ওইদিকে। গেলে এখনও ধরে ফেলতে পারবেন।"

দারোগাবাবু তবু কূট সন্দেহের চোখে দুলালবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না, অথচ চেনা-চেনাও লাগছে।"

"অনেকেরই লাগে। ওটা কিছু নয় দারোগাবাবু, চোখের ভুল।"

"আমরা একটা সাঙ্ঘাতিক খুনিকে খুঁজছি। সে এই শহরেই কোথাও পালিয়ে আছে। সে ভাল ক্রিকেট খেলে, গায়ে ভীষণ জোর, প্রচণ্ড খেতে পারে, আর দেখতে অনেকটা সায়েন্সের মাস্টার দুলালবাবুর মতো। এরকম লোক কাউকে দেখেছেন নাকি?"

দুলালবাবু ভ্রূ-কুঁচকে একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "দাঁড়ান, দাঁড়ান! হুঁ হুঁ, ঠিক তো। চারজন ডাকাতের একজনের চেহারা তো বাস্তবিকই দুলালবাবুর মতোই! সে খুনি নাকি দারোগাবাবু? কী সর্বনাশ! খুব জোর বেঁচে গেছি তা হলে।"

দারোগাবাবু খাপ থেকে রিভলবারটা বের করে মাথা নেড়ে বললেন, "না, আপনি বেঁচে যাননি। বাঁচার কোনও উপায় আপনার সামনে নেই।"

দুলালবাবু মিষ্টি করে হেসে বললেন, "এত কম বয়সে তো কারও ভীমরতি হয় না দারোগাবাবু! আপনার হল কী করে?"

"ভীমরতি যে হয়নি তা আপনিও নির্ঘাত হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছেন। এবার মানে-মানে পোঁটলাটা যেখানকার সেখানেই রেখে দু'হাত তুলে এগিয়ে আসুন, আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করলাম।"

পোঁটলাটা ছেড়ে দুলালবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "গাড়লদের সঙ্গে কাজ করতে গেলে এরকমই হয় দারোগাবাবু। ওই যে দেখুন, আমার স্যাঙাত পাঁচু মোদক কেমন আলমারির আড়ালে ভালমানুষের মতো গা বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চেনেন তো ওকে? বিখ্যাত চোর। এখন কি ওর উচিত ছিল না একটা মুগুর-টুগুর বা নিদেন একটা ইট দিয়ে পিছন থেকে আপনার মাথায় মারা? আপনিই বলুন! এই বিপদের সময় এটা কি বন্ধুর মতো কাজ হল? ছ্যাঃ ছ্যাঃ। দেশটার এই জন্যই কোনও উন্নতি নেই, বুঝলেন দারোগাবাবু! অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে যদি না পড়লি তা হলে আর মানুষ কিসের! তাই না দারোগাবাবু?"

পাঁচু মাথা চুলকোতে-চুলকোতে ভারি লাজুক গলায় আলমারির আড়াল থেকে

বলল, "তা কি করব? এখানে যে মুগুর-টুগুর কিছু নেই। ইটও তো দেখছি না। কেবল একটা জলের কুঁজো আছে। কিন্তু তাই দিয়ে কি কাজ হয়?"

দুলালবাবু ব্যথির গলায় বললেন, "শুনুন দারোগাবাবু, শুনুন উনি জলের কুঁজোটা হাতের কাছে পেয়েও ভাবছেন ওতে কাজ হবে কি না! আচ্ছ দারোগাবাবু, আপনিই বলুন, জলের কুঁজো মাথায় মারলে কাজ হয় না এ-কথা শুনে কে না হাসবে!"

দারেগাবাবু বিস্ফারিত চোখে পাঁচুকে দেখছিলেন। হঠাৎ প্রবল একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "পাঁচু, পাঁচু মোদক! সেই বিটকেল চোর যে আমার বাড়িতে ঢুকে অবধি দেওয়ালঘড়ি আর বাসন চুরি করে নিয়ে গেছে!"

দুলালবাবু একগাল হেসে বললেন, "আজ্ঞে সে-ই। ওই সেই পাঁচু মোদক। তবে আপনাকেও বলি দারোগাবাবু, পাঁচুর মতো আনাড়ি চোরের কাছে জব্দ হওয়া আপনার উচিত হয়নি। দেখছেন তো কেমন ভ্যাবাগঙ্গারাম। আপনি যখন আমার দিকে পিস্তল তাক করে আছেন তখন অনায়াসে কুঁজোটা তুলে আপনার মাথায় বসিয়ে দিতে পারত। তা না করে বোকার মতো কনেবউ সেজে দাঁড়িয়ে আছে দেখুন!"

দারোগাবাবু হুঙ্কার দিলেন, "খবর্দার, জলের কুঁজোয় হাত দেবেন না বলছি।"

পাঁচু হাত দেয়ওনি। সভয়ে মাথা নেড়ে বলল, "আজ্ঞে না, জলের কুঁজোয় হাত দেওয়া খুব খারাপ জিনিস। ও পাপ আমি কখনও করব না দারোগাবাবু। কিন্তু আপনি ওদিকটা দেখুন। উনি লোক সুবিধের নন।"

দারোগাবাবু চট করে দুলালবাবুর দিকে ফিরে বললেন, "খবর্দার.....!"

দুলালবাবু অমায়িক গলায় বললেন, "আজ্ঞে, আমি তো কিছু করিনি। আমি শুধু পাঁচুকে নজরে রাখছি। যদি এই সুযোগে ও কিছু একটা করে বসে....।"

দারোগাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে পাঁচুর দিকে ঘুরে বললেন, "খবর্দার!"

পাঁচু সঙ্গে-সঙ্গে নিজের নাক-কান মলে বলল, "ওঁকে বিশ্বাস করবেন না দারোগাবাবু, নড়া তো দূরের কথা, আমি শ্বাস অবধি ফেলছি না ভয়ে। তবে কি না দুলালবাবু নানা কায়দা জানেন। কখন যে কী করে বসবেন!"

দারোগাবাবু ফের দুলালবাবুর দিকে ফিরে বললেন "খবর্দার!"

দু'জন ঘরের দু'দিকে। ফলে দু'জনকে পিস্তলের পাল্লায় আনা বা একসঙ্গে নজরে রাখা যাচ্ছে না। দারেগাবাবু বেশ ফাঁপরে পড়লেন। একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে মোচড় মারতে মারতে তিনি হন্যে হয়ে গেলেন। তারপর পাঁচুর দিকে ফিরে বললেন, "ওহে পাঁচু, যাও গিয়ে ওই লোকটার পাশে দাঁড়াও।"

"যে আজ্ঞে", বলে পাঁচু এগোতে লাগল।

দুলালবাবু এই সুযোগে হারানের অস্ত্রটা তুলে নিয়ে ভারি অমায়িক গলায় বললেন, "আচ্ছা দারোগাবাবু, এটা কী জিনিস বলুন তো? হারানভায়ার কাছে ছিল। আমি ভাবলুম, কী জানি বাবু কী জিনিস। বোধহয় বিপদে আপদে কাজে লাগে, তাই না দারোগাবাবু?"

দারোগাবাবুর চোখ জিনিসটা দেখে গোলাকার হয়ে গেল। অত্যন্ত উত্তেজিত গলায় বললেন, "শিগগির ফেলে দিন। ও খুব বিপজ্জনক জিনিস।"

দুলালবাবু অস্ত্রটা বাগিয়ে ধরে বললেন, "আমিও তো সেই কথাই বলি, এ-সব খুব বিপজ্জনক জিনিস। আপনিও ওটা ফেলে দিন।"

দারোগাবাবু গর্জন করে বললেন, "ভাল হবে না বলছি, ফেলে দিন নইলে গুলি করব।"

দুলালবাবু একগাল হেসে বললেন, "আমারও ওই কথা, ফেলে দিন নইলে গুলি করব।"

দারোগাবাবু এক পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, "ভাল হবে না বলছি, খুব খারাপ হয়ে যাবে।"

"আজ্ঞে, আমিও তো সেই কথাই বলতে চাইছি। ভাল হবে না বলছি, খুব খারাপ হয়ে যাবে।"

দারোগাবাবু আরও এক পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, "ট্রিগার থেকে আঙুল সরিয়ে নিন। দুম করে গুলি বেরিয়ে যেতে পারে।"

"আজ্ঞে, যথার্থই বলেছেন। আমি আবার আনাড়িও বটে। হাতটাত কাঁপছে, যে-কোনও সময়ে গুলি ছুটে যেতে পারে।"

দারোগাবাবু আরও এক পা পিছোতে গেলেন, কিন্তু চৌকাঠে পা ঠেকে একেবারে চিতপটাং হয়ে উলটে ঘরের বাইরে পড়লেন। তারপর গড়িয়ে পড়ে গেলেন সিঁড়ির নীচে।

দুলালবাবু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দারোগাবাবুর নাড়ি দেখে বললেন "মূর্ছা গেছে। ওহে পাঁচু!"

পাঁচু পোটলাটা ঘাড়ে করে বেরিয়ে এল। একগাল হেসে বলল, "যে আজ্ঞে।"

"আজ তা হলে কাজ-কারবার বেশ ভালই হল, কী বলো!"

"কী আর বলব বাবু, একটু পায়ের ধুলো দিন। এত এলেম আমার পেটেও নেই।"

দুলালবাবু বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "এ আর কী দেখছ! এরপর আরও তো কত কী হবে। সবে তো সন্ধে।"

পাঁচু মাথা নেড়ে বলল, "আজ আর নয়। সোনায়-দানায় মিলিয়ে অনেক হয়েছে। লাখ টাকার মাল তো বটেই।"

দুলালবাবু একটু তাচ্ছিল্যের ভাব করে বললেন "ছোঃ! লাখ টাকা আবার একটা টাকা নাকি?"

"বেশি লোভ করা ভাল নয় বাবু। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।"

দুলালবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "লোভ নয় হে, লোভ নয়। কাজ করার একটা আনন্দও আছে। যত বিপদ তত আনন্দ, যত বাধা তত উত্তেজনা।"

পাঁচু গম্ভীর হয়ে বলল, "আপনাকে নিয়ে মুশকিল কী জানেন? আপনার মতলবের ঠিক নেই। কখন যে কী করে বসবেন তাই ভেবেই আমার দুশ্চিন্তা হয়। এখন চলুন তো, ঘরে গিয়ে আগে মালপত্র রাখি।"

দুলালবাবু হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে বললেন, "আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও! কাদের যে পায়ের শব্দ পাচ্ছি! চারদিক থেকে কারা যেন আসছে! বেশ ভারী-ভারী বুটের আওয়াজ!"

পাঁচুও শব্দটা শুনতে পেল। মুখ শুকনো করে বলল, "সর্বনাশ! এ যে পুলিশের বুট। দারোগাবাবুর সেপাইরাই হবে।"

কথা শেষ হওয়ার আগেই কয়েকটা ঝাঁঝালো টর্চবাতির আলো এসে তাদের ওপর পড়ল। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, "পাকড়ো! পাকড়ো! ওই ডাকাত।"

পাঁচু পোঁটলাটা ফেলে চোখের পলকে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ফেলল। সেপাইরা এসে দুলালবাবুকে ঘিরে ফেলল।

দুলালবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "না, শেষরক্ষা হল না।"

এক সেপাই বলল, "কী বলছেন?"

দুলালবাবু করুণ মুখ করে বললেন "দারোগাবাবুর কথাই বলছি। ওই যে পড়ে আছেন ময়দার বস্তার মতো।"

সেপাইদের কয়েকজন দৌড়ে গিয়ে দারোগাবাবুকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, "সর্বনাশ! ইনি তো খুন হয়ে গেছেন।"

দুলালবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "যেতেন, যেভাবে ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করছিলেন, তাতে খুন হওয়ারই কথা। তবে শেষ অবধি হননি।"

একজন সেপাই কঠিন গলায় বলল, "আপনি কে?"

"আমি একজন লোক। এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলুম। হঠাৎ দেখি দারোগাবাবু একা পাঁচ-সাতটা মুশকো লোকের সঙ্গে লড়াই করছেন। তা আমি এসব মারদাঙ্গা দেখতে খুব ভালোবাসি। ওই দোকানঘরটার দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে লড়াই দেখলাম। আহা, এমনটা বহুদিন দেখিনি। খানিকটা অরণ্যদেব, খানিকটা টিনটিন, খানিকটা টারজান মিলিয়ে-মিশিয়ে যেন ভগবান আমাদের দারোগাবাবুকে তৈরি করেছেন। কী ঘুসি রে বাবা! যেন বোমা ফাটছে।

ক্যারাটে, কুংফু সবই দেখাতে লাগলেন।"

সেপাইটা সন্দিহান গলায় বলল, "আমাদের দারোগাবাবু তো জলঢোসকা মানুষ, তার গায়ে একরত্তি জোর নেই। আর সাহস! হিঃ হিঃ! আরশোলা, ভূত, পেতনি সব কিছুকেই ভারি ভয় পান।"

দুলালবাবু নিমীলিত নয়নে বললেন, "না না, আপনি ভুল করছেন, দারোগাবাবুকে বাইরে থেকে বোঝা যায় না বটে, কিন্তু ভিতরে তিনি অন্য জিনিস।"

সেপাইটা দুলালবাবুর সঙ্গে মোটেই একমত হয় না। বলল, "মোটেই নয়। উনি একটা জিনিসই পারেন সেটা হল খাওয়া, হাঁড়ি-হাঁড়ি রসগোল্লা, কাঁড়ি-কাঁড়ি মাছ-মাংস খেয়ে ফেলতে পারেন। আর কোনও কাজই করেন না। চোর-টোর তো আমরাই ধরি। উনি কিছু করেন না।"

"তা হলে কি ভুল দেখলাম! কালকেই গণেশ-ডাক্তারের কাছে গিয়ে চোখটা পরীক্ষা করাতে হবে। যাই, গিয়ে একটু জিরোই, বড্ড ধকল গেছে।"

"জিরোবেন কি? আপনাকে যে থানায় যেতে হবে। আপনি যে ঘটনার সাক্ষী!"

ভুতোর পরিদের গল্প যে কেউ বিশ্বাস করে না, তা সে জানে। সবাই বলে ওটা নাকি স্বপ্ন। কিন্তু ভুতো জানে, তা নয়। পরিদের ব্যাপারটা একদম জলজ্যান্ত সত্যি। একটা কথা ভুতো কাউকে কখনও বলেনি। সেটা হল, ছোট একটি ডিবে। ডিবেটা কোন ধাতু দিয়ে তৈরি তা ভুতো অনেক ভেবেও বুঝতে পারেনি। রংটা রুপোলি, চ্যাপটা আর চৌকোমতো। আড়ে-দীর্ঘে এক আর দেড় ইঞ্চি মাত্র। কৌটোটা সে অনেক চেষ্টা করেও কখনও খুলতে পারেনি। ছুরি দিয়ে, টিন-কাটার দিয়ে অনেক চেষ্টা করে দেখেছে। কিছু হয়নি। একদিন তো খুলতে না পেরে রেগে গিয়ে বশে কয়েকটা আছাড় দিয়েছিল। কিছু হয়নি। পরিরা এই ডিবেটা তাকে দিয়ে বলেছিল, "যত্ন করে রেখো। কাজে দেবে।" কী কাজে দেবে তা অবশ্য ভুতো জানে না। তার বিশেষ কোনও সমস্যাও নেই। এ-বাড়িতে সে বেশ বাড়ির ছেলের মতোই আছে। ফাইফরমাশ করতে হয় বটে, কিন্তু পড়াশোনার জন্য তাকে স্কুলেও ভর্তি করা হয়েছে। সে খেলাধুলো করে, লেখাপড়া করে, খায়-দায়, তার আর সমস্যা কী? কিন্তু একটা ব্যাপার ভুতো লক্ষ করেছে, ডিবেটা হাতে নিলে সে বেশ একটা মনের জোর পায়। কোনও শক্ত অঙ্ক কষতে না পারলে ডিবেটা বাঁ হাতে মুঠো করে ধরে কষলেই অঙ্ক জলের মতো মিলে যায়। পরীক্ষার সময়েও সে ডিবেটা পকেটে নিয়ে যায়। ডিবের গুণেই কি না কে জানে, ভুতো প্রত্যেক পরীক্ষায় ক্লাসে ফার্স্ট হয়।

কিন্তু এসব ভুতো কাউকে বলে না। তবে একবার ভারি অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছিল। স্কুলে তার প্রাণের বন্ধু হচ্ছে সেকেন্ড বয় চিতু। একবার চিতুকে সে কৌটোটা লুকিয়ে দেখিয়েছিল। হাতের তেলোয় কৌটোটা নিয়ে সে চিতুকে দেখিয়ে বলল, "বল তো এটা কী?"

চিতু অবাক হয়ে বলল, "কোথায় কী?"

"এই যে আমার হাতে!"

চিতু তার হাতের তেলোর দিকে চেয়ে থেকে বলল, "তোর হাতে? তোর হাতে তো কিছুই নেই! হাত তো খালি!"

ভুতো তখন নিজেও অবাক হয়ে দেখল, তার হাতের চেটোটায় কিছু নেই। অথচ সে স্পষ্ট টের পাচ্ছিল ডিবেটা তার হাতেই রয়েছে। কিন্তু চোখে দেখা যাচ্ছে না। সে ভয় খেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে কৌটোটা পকেটে ভরে ফেলে বলল, 'ইয়ার্কি করছিলাম।"

ওই একবারই কাণ্ডটা হয়েছিল। সেই রাতেই কিন্তু পরি এল। একজন রোগা বিষণ্ণ মুখওয়ালা পরি, খুব গম্ভীর হয়ে বলল, "তোমাকে সাবধান করা সত্ত্বেও তুমি কৌটোটা অন্যকে দেখানো চেষ্টা করেছিলে। সাবধান, আর এরকম করো না। ওই কৌটোর ভিতর তোমাকে প্রোগ্রাম করা আছে। মাঝে-মাঝে এটা হাতে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকবে। ওটা আর কখনও ঘরের বাইরে নিয়ে যেও না।"

"তোমাকে প্রোগ্রাম করা আছে', এই কথাটা ভুতো বুঝতে পারেনি। জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পরিটা তার কথা শেষ করেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সবে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এখন বাচ্চাদের আর পড়াশুনোর কোনও চাপ নেই। এ-সময়টায় এক-একদিন নিয়ম করে তার কেউ বাগান করে, কেউ পশুপাখির পরিচর্যা করে, সকলে মিলে দল বেঁধে পিকনিক করতে যায়, খেলাধুলো তো আছেই। আজ ভুবন রায় তাঁর বড় ছেলে রামলালকে হুকুম দিয়েছেন, "বাচ্চাদের হাতেকলমে একটু বিজ্ঞান শেখাও। ওদের মধ্যেও হয়তো সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে। নানারকম অ্যাপারেটাস দাও, যে-যার নিজের মতো কিছু করুক। তুমি নিজে সঙ্গে থেকো, নইলে আবার বিপদ ঘটতে পারে।"

তাই আজ বাচ্চারা সব ল্যাবরেটরিতে এসেছে। মন্টু, লালু, গদাই, টিকলি, কাজু আর ভুতো। রামলাল তাদের যথাসাধ্য বিজ্ঞান বোঝানোর চেষ্টা করছেন।

ভুতো হঠাৎ লালুকে চুপিচুপি বলল, "আগের দিন যে ল্যাবরেটরিতে একটা বিস্ফোরণ হয়েছিল তার কারণ জানিস?"

লালু চাপা স্বরে বলল, "চুপ, শুনতে পেলে রক্ষে নেই।"

ভুতো চাপা গলায় বলল, "সেই বিস্ফোরণের পর থেকে আর দুলালবাবুকে দেখা যাচ্ছে না।"

"হ্যাঁ। কিন্তু দুলালবাবু তো খুন হয়েছেন। ঠিক তাঁর মতোই দেখতে আর একটা লোক তাঁকে খুন করেছে বলে শোনা যাচ্ছে।"

ভুতো বলে, "দুলালবাবুকে খুন করার পিছনে কারও কোনও মোটিভ নেই। দুলালবাবুর টাকা-পয়সা ছিল না, তাঁর ওপর কারও কোনও রাগও ছিল না, তবে খুন করবে কেন?"

"সেই রাতে একটা চোরও এসেছিল এ-বাড়িতে।"

"একটা নয়, দুটো। তবে আমার মনে হয়, দু'জনের একজন সত্যিই চোর, আর অন্যজন চোর নন, দুলালবাবু।"

"দুলালবাবু! যাঃ, দুলালবাবুর গায়ে অত জোর ছিল কখনও? দুলালবাবুর বয়স অত কম ছিল? আর দুলালস্যারকে আমরা চিনতে পারব না নাকি?"

ভুতো গম্ভীর হয়ে বলল, "কিন্তু আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।"

"কিসের সন্দেহ?"

"কোথায় যেন একটা গুবলেট পাকিয়ে গেছে। সেদিন কী কী কেমিক্যাল মেশানো হয়েছিল মনে আছে?"

"তাই কখনও থাকে? যা খুশি মিশিয়ে একটা খিচুড়ি পাকানো হয়েছিল। কেউ তো আর লিখে রাখেনি।"

"তা বটে।" বলে ভুতো গম্ভীর হয়ে গেল। শহরে চারিদিকে এখন বেশ একটা আতঙ্কের ভাব। কোথাও চুরি, কোথাও ডাকাতির চেষ্টা হচ্ছে। স্বয়ং দারোগাবাবু কাল রাতে ডাকাতদের হাতে খুন হতে-হতে বেঁচে গেছেন। আর শোনা যাচ্ছে ডাকাতদের সর্দার হচ্ছে সেই লোকটা, যে নাকি অনেকটা দুলালবাবুর মতো দেখতে। বাজারের স্যাকরা আর তার দুই দরোয়ানও সাক্ষী দিয়েছে যে, এই সেই খুনে-লোক। শহরে এই নিয়ে এখন তুমুল আলোচনা হচ্ছে। ভৌত-ক্লাবের মেম্বাররা পর্যন্ত বলছেন যে, সেই লোকটা সেখানেও হামলা করেছিল। আবার শোনা যাচ্ছে এই লোকটা সাঙ্ঘাতিক ভাল ক্রিকেট খেলে।

ভুতো কিছুতেই অঙ্কটা মেলাতে পারছে না।

রামলালবাবু সায়েন্স নিয়ে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তারপর দু-একটা এক্সপেরিমেন্ট করলেন। তারপর বিরক্ত ও গলদঘর্ম হয়ে বললেন "যাও সব, গিয়ে খেলা-টেলা করোগে।"

সন্ধের পর আজকাল বাচ্চারা কেউ ক্যারাম খেলে, কেউ বই পড়ে, কেউ গল্প-

টহল করে। কারও ওপর পড়ার চাপ নেই।

ভুতো সন্ধেবেলায় তার একা ঘরটায় এসে চুপচাপ ডিবেটা হাতে নিয়ে চোখ বুজে স্থির হয়ে বসে রইল।

হঠাৎ সে শুনতে পেল একটা গলার স্বর খুব চিঁচিঁ করে তার কানের কাছে মশার পনপনানির মতো কিছু বলছে।

সে কৌটোটা আরও জোরে চেপে ধরল।

গলার স্বরটা খুব দূর থেকে আসছে। অনেক দূর থেকে। খুব ক্ষীণ। ভুতো কান খুব সজাগ করল।

গলার স্বরটা বলল, "লাল হেলমেট পরো, বুঝতে পারবে।"

ভুতো সভয়ে বলল, "লাল হেলমেট! সেটা আবার কী?"

"খুঁজে বের করো। কাছাকাছি কোথাও আছে।"

"সেটা দিয়ে কী হবে?"

"মজা হবে। খুব মজা।"

"দুলালবাবুর কী হল?"

"হেলমেট জানে। তাকে জিজ্ঞেস করো।"

"কোন দিকে খুঁজব?"

"জঙ্গলের দিকে, আর কিছু বলতে পারছি না। ক্ষমা করো।"

ভুতো অবাক হয়ে ডিবে হাতে বসে ভাবতে লাগল।

ভুতো জানে এটা স্বপ্ন নয়। যা ঘটছে তা সব সত্যি। হেলমেটটার খোঁজ পেলে হয়তো যা সব ঘটছে তার একটা হদিস পাওয়া যাবে।

ভুতো উঠে পড়ল এবং চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের দিকে রওনা হল।

জঙ্গল বলতে যে সাঙ্ঘাতিক কিছু ব্যাপার তা নয়। তবে দুর্গম বটে। কেননা, জঙ্গলটায় বিছুটি আর কাঁটা গাছ সাঙ্ঘাতিক। সাপখোপ, বিছেটিছে আছে। আগে প্রায়ই চিতাবাঘ বেরোত। আজকাল চিতাবাঘ নেই, শেয়াল আছে।

ভুতোর ভয়ডর এমনিতেই কম। তার ওপর মাথায় নানা ফন্দি খেলছে বলে ভয়ডরের বালাই রইল না।

জঙ্গলে ঢুকতে হলে ভৌত-ক্লাবের পাশ দিয়ে শুঁড়িপথ ধরে যেতে হয়। আজ ভৌত-ক্লাবে কেউ আসেনি। দরজায় তালা ঝুলছে। ক্লাবের ঘরটা পার হয়ে একটা দুর্গম ধ্বংসস্তূপ, সেটাকে ডাইনে ফেলে কয়েক পা এগোলেই জঙ্গলের শুরু।

বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। চারপাশে কুয়াশায় ঢাকা অস্পষ্টতা। ভুতো পথ ঠাওর করে করে হাঁটছে। হেলমেটটা এই বিশাল জায়গায় কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে তা সে জানে না, কিন্তু বিশ্বাস আছে পাবেই।

সামনেই গাছের তলায় একটা গোলমতো জিনিস পড়ে আছে। ভুতো জিনিসটা কী দেখার জন্য নিচু হয়ে তুলে নিল। এত হাল্কা জিনিস সে কখনও দ্যাখেনি। একেবারে যেন বেলুনের চেয়েও হাল্কা। বলটা তার হাতের মধ্যে একটু যেন নড়ানড়ি করে উঠল। ভুতো নিতান্তই ছেলেমানুষ। জিনিসটা নিয়ে একটু লোফালুফি করে তারপর একটু চেপে ধরে দেখল ফাটে কি না।

আশ্চর্যের বিষয়, বলটা দুম্ করে না হলেও, হুস করে ফেটে গেল। ভুতো ভারি অবাক হয়ে দেখল, ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো কী যেন বেরিয়ে আসছে।

থতমত খেয়ে তিন হাত পেছিয়ে গেল ভুতো, তারপর হাঁ করে রইল। এরকম কাণ্ড সে জীবনে দ্যাখেনি। গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে একটা সুড়ুঙ্গে কালো ঢ্যাঙা মূর্তি সামনে দাঁড়াল। তার দু'খানা চোখ ভাটার মতো জ্বলছে।

"কে তুই?"

ভুতো আমতা-আমতা করে বলল, "ভু-ভুতো।"

"ভুতো! চালাকি কারবার জায়গা পেলে না? ভুতো বললেই ভুতো!"

ভুতো এবার যথার্থই ভয় খেয়ে বলল, "বিশ্বাস করুন, আমার নাম ভুতনাথ, সবাই ভুতো বলে ডাকে। আপনি কে?"

"তোর সে খোঁজে দরকার কী? এখন বল আমাকে ঘাঁটালি কেন?"

আজ্ঞে, ইচ্ছে করে নয়। জিনিসটা কী দেখতে গিয়ে ফট করে ফেটে গেল।"

"কী ফাটালি জানিস?"

"আজ্ঞে না।"

"পুরনো ভুতেরা একরকম গুটি পাকিয়ে তার মধ্যে থাকে। আমি কত বছরের পুরনো জানিস?"

"আজ্ঞে না।"

"দেড় হাজার বছরের। কালও একটা পাজি লোক আমার ঘুম ভাঙিয়েছিল। আজ আবার। তা হলে তুই-ই এসব করিস?"

"কাল আমি ভাঙাইনি।"

"তবে কে?"

"আজ্ঞে, আমি জানি না।"

"বললেই বিশ্বাস করব? লোকটাকে ধরার জন্য আজ আমি বুদ্ধি করে পথের ওপর পড়েছিলুম।"

"কিন্তু আমি নই।"

সুড়ুঙ্গে ভুতটা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ঢেউয়ের মতো হেলদোল খেল। তারপর

বলল, "তুই নোস তো কে? অবশ্য আমরা গন্ধ চিনি। তোর গায়ের গন্ধটা অন্যরকম। তা বলে তোকে যে ছেড়ে দেব তা ভাবিস না।" ভুতো ভয় খেয়ে বলল, "কী করবেন তা হলে?" ছায়ামূর্তি বলল, "কী করব তা ঠিক করবে লম্বোদর। সে-ই আমাদের সর্দার কিনা।"

"লম্বোদর? সে কে?" ভূতটার এতক্ষণ কোনও হাত-পা ছিল না। কেবল লম্বাটে এক ধোঁয়াটে মূর্তি আর দুটো জ্বলন্ত চোখ। কিন্তু এবার একটা লিকলিকে হাত দেখা দিল। মনে হল যেন ভূতটা সেই হাত দিয়ে চিন্তিতভাবে মাথা চুলকোল, তারপর বলল, লম্বোদর যে কে তা কি আর আমরাই জানি? ভারি গোলমেলে ব্যাপার।"

"আপনিই তো লম্বাদরের কথা বললেন?"

বলেছি ঘাট হয়েছে। লম্বোদর আমাদের সর্দার ঠিকই, প্রায় হাজার বছর ধরেই সে সর্দার। কিন্তু ভূতের তো শরীর থাকে না, তার চেহারারও কোনও ঠিক নেই। তারপর পুরনো ভূত তো, চেহারা চিমসে মেরে একেবারে সব ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। তারপর ধরো, ফ্যাসাদ তো একটা নয়। মাঝেমধ্যে আমাদের ঝগড়া কাজিয়া মারপিট হয়, তখন সব আমরা গুলিয়ে যাই। তারপর ঝড়-বাতাস তুফান এলেও একেবারে তালগোল পাকিয়ে ফেলে আমাদের। তারপর যখন ফের আলাদা হই, তখনই হয় মুশকিল। কে যে লম্বোদর ছিলুম, আর কে যে বিশ্বনাথ সেইটে ঠিক করাই হয় সমস্যা। তা আমরা কী করি জানো? আমরা ওই লম্বোদর নামটাই ধরে রেখেছি। এক-একবার এক-একজন পালা করে লম্বোদর হয়ে যাই। একটা ভোটের মতো ব্যাপারও হয়। বেশিরভাগ ভূত যাকে লম্বোদর বলে ঠিক করে সে-ই হয়।"

"আপনার কোনও নাম নেই?"

ভূতটা মাথা-টাথা চুলকে বলে, "না থেকে কি পারে? তবে কথা হল, ভূত তো আর নাম নিয়ে জন্মায় না। যখন জ্যান্ত ছিলুম তখন বোধহয় আমার নাম ছিল জনার্দন। কিন্তু এত পুরনো দিনের কথা কি মনে থাকে রে বাপু? জনার্দনও হয়তো লম্বোদরের মতোই গুলিয়ে গেছে আর কারও সঙ্গে।"

ভূতো কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, "তাহলে আমাকে আর লম্বোদরের কাছে নিয়ে গিয়ে লাভ কী? আপনিই বরং নিজেকে লম্বোদর মনে করে শাস্তি দিয়ে দিন। এই নাক-কান মলছি, দশবার ওঠ-বোস করছি।"

"উহুঁ, উহুঁ, সব কিছুরই একটা নিয়ম আছে। চল্, ওই শ্যাওড়া গাছের নীচে আজ আমাদের জলসা বসবার কথা। সবাই সেখানে আসবে। সেখানেই বোঝা যাবে এবার লম্বোদরটা কে। লম্বোদর ছাড়া তোর বিচার হওয়া সম্ভব নয়।"

"ওরে বাবা!"

ভূতটা বিরক্ত হয়ে বলল, "তোর কি ভূতের ভয় আছে নাকি?"

"বেজায় আছে।"

"লক্ষণ তো দেখছি না। দিব্যি তো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা বলছিস। একবার মূর্ছা গেলেও না হয় বুঝতাম।"

"মূর্ছা যাওয়ার ইচ্ছেও ছিল। কিন্তু এত ভয় খেয়েছি যে মূর্ছাটাও হতে চাইছে না।"

"কিন্তু আমার তো উপায় নেই, একজনকে যে হাজির করতেই হবে। আমার ওপর ভার ছিল লোকটাকে খুঁজে বের করার।"

"কিন্তু আমি তো সেই লোক নই।"

"ওসব আমি জানি না আমি তো'কে লম্বোদরের সভায় হাজির করে দেব, ব্যস।"

ভুতো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, "আপনাদের লম্বোদরের সভায় আজ কী নিয়ে আলোচনা হচ্ছে?"

"দুটো লোক মিত্তিরদের পোড়ো ভিটে জবরদখল করে বসে আছে। তাদের কীভাবে তাড়ানো যায় সেই পরামর্শ হচ্ছে। লোক দুটো ভারি বদমাশ, একটা চোর, অন্যটা ডাকাত। আমাদের চোদ্দটা ভূত ও-বাড়িতে বসবাস করে, তাদের ভারি অসুবিধে হচ্ছে।"

"লোক দুটো কে ? নাম জানেন?"

"একজন পাঁচু মোদক। অন্যজন দুলাল সেন।"

দুলাল সেন। ভুতো ফের চমকে উঠে বলল, "দুলালবাবু কি তা হলে ওখানে লুকিয়ে আছেন?"

"শুধু লুকিয়েই নেই এইমাত্র হরগোপাল খবর এনেছে যে, ওরা দু'জন নাকি ভূত বেচে দু'পয়সা আয় করার কথাও ভাবছে।"

ভুতো অবাক হয়ে বলল, "কিন্তু ভূত কিনবে কে?"

"আজকাল সবাই সব কিছু কেনে। একবার ব্যবসাটা চালু হয়ে গেলে কাণ্ডখানা কী হবে ভাব তো! দলে দলে লোক জালদড়ি দিয়ে ভূত ধরতে ঝাঁপিয়ে পড়বে না?"

"ভূত কি ধরা যায়?"

"ধরা তো সোজা। সাত বছর মাছ ধরা হয়েছে এমন মেছো-জালে গাবের আঠা আর লোহার গুঁড়ো মিশিয়ে মাখিয়ে নিলেই হয়ে গেল। ঝপাঝপ ধরা পড়বে। তবে কায়দাটা সবাই জানে না বলে রক্ষে। ওই যাঃ, তোকে যে বড় বলে দিলাম!"

ভুতো ভয় খেয়ে বলল, "আমি ভাল করে শুনতেই পাইনি। কী যেন বললেন,

হেঁসোতে ডাবের জল আর সোহাগার গুঁড়ো না কী যেন!"

"যাক বাবা। বেঁচে গেছি। অবশ্য শুনে ফেললেও তোর লাভ হত না। তোকে তো আজ রাতেই ঘাড় মটকে মারা হবে।"

"আমার কী মনে হচ্ছে জানেন জনার্দনদা? আমার মনে হচ্ছে, ওই দুলাল সেন আর পাঁচু মোদকই আপনাদের সঙ্গে গণ্ডগোল করেছে। ওদের ধরলেই সব সমস্যার সমাধান।"

জনার্দন একটা ধমক দিয়ে বলল, "ফ্যাচফ্যাচ করিস না তো! ধরব! ওদের ধরা কি সোজা? দুটোই মহা ধূর্ত, আর তারাই আমাদের ধরার তাল করছে।"

ভুতো এবার বেশ একটু রাগের গলায় বলল, "আসলে আপনারা ভীষণ ভিতু ভূত। ভিতু বলেই ওদের ধরতে ভয় পাচ্ছেন। আর আমি নিরীহ বলে আমাকে ধরে এনেছেন।"

জনার্দন ফের খিঁচিয়ে উঠে বলল, "আমরা ভিতু? ছাই জানিস। আমরা ভয় খাব কেন রে? তবে সবাইকে সবসময়ে ধরা যায় না। ধরার একটা নিয়ম আছে। যেখানে তেকাঠির ছায়া, নিমের ছায়া, শিমুলের গন্ধ সেখানে ঈশেন কোণ থেকে যে আসে ভরসন্ধেবেলা শুধুমাত্র তাকেই ধরা সম্ভব।"

"আমি কি তাই আসছিলাম?"

জনার্দন খুক করে একটু হেসে বলল, "একেবারে ঠিক বলেছিস। যেখানে তোকে ধরলুম সেখানে একটা জারুল গাছ ছিল। তার তেকাঠির ছায়া পড়ে নীচে। নিমের হাওয়া দিব্যি বইছিল। আর শিমুল গাছের ছালের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছিল। তাই তো ওখানে ঘাপটি মেরে ছিলুম রে। আর তুইও এলি ঈশেন কোণ থেকে। বায়ু বা অগ্নিকোণ থেকে এলে কিছুই করতে পারতুম না।"

'ইস, বড্ড ভুল হয়ে গেছে তো তা হলে।"

"এখন চুপ। এবার বোধহয় তোর পালা।"

বাতাসে জোর ফিসফাস হচ্ছিল। কে কী বলছে তা শুনতে।

"তা হলে কি তুই ভৌত-ক্লাবের মেম্বার। সেই লোকগুলোকেও আমরা খুঁজছি। বাগে পেলে একবোরে পিণ্ডি চটকে দেব। মড়ার মাথার খুলি সাজিয়ে রোজ-রোজ ভূত নিয়ে ওরা ইয়ার্কি দেয়।"

"আমি ওই ক্লাবে জীবনে যাইনি।"

ভূতদের নিশ্চয়ই নিজস্ব বেতারবার্তার ব্যবস্থা আছে। ভূতটা হঠাৎ স্থির হয়ে শরীরের ঢেউটা বন্ধ করে কী যেন একটু শুনল। তারপর হঠাৎ স্পাইডারম্যানের মতোই ঝাঁ করে ভুতোর দিকে একটা সূক্ষ্ম জালের মতো কী যেন ছুঁড়ে দিল। বলল, "আয় আমার সঙ্গে। লম্বোদর তোকে ধরে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়েছে।"

ভুতোকে হেঁটে যেতে হল না। যেন হালকা একটা ব্যাগের মধ্যে ভরে তাকে শূন্যে তুলে দোলাতে-দোলাতে জনার্দন তাকে নিয়ে ফেলল শ্যাওড়া গাছের গোড়ায়।

ভুতো সভয়ে দেখল, সেখানে আবছা অন্ধকারে ছায়া-ছায়া সুড়ুঙ্গে চেহারা। প্রত্যেকটা শরীরেই অনবরত ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সংখ্যায় তারা ক' হাজার হবে তার হিসেব করা খুবই কঠিন। কারণ মাঝে-মধ্যেই ছায়ামূর্তিগুলো জড়াজড়ি হয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। তখন আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে না কাউকে। জনার্দন মিথ্যে বলেনি। এর মধ্যে কে লম্বোদর, কে জনার্দন তা বুঝে ওঠা শিবেরও অসাধ্য।

জনার্দন তাকে বসিয়ে, নিজে চারদিকে একটা পাক খেয়ে এসে বলল, "ওই যে দ্যাখ, লম্বোদর সিংহাসনে বসে আছে। দেখতে পাচ্ছিস?"

ভুতো দেখতে পেল, একটা ঢিবির মাথায় গোলমতো ছোট্ট একটা জিনিসের ওপর একটা ছায়ামূর্তি বসে আছে বটে।

"ওইটা বুঝি আপনাদের সিংহাসন?"

"হ্যাঁ। খুব দামি জিনিস। ক'দিন আগে ওটা চুরি হয়ে গিয়েছিল। ওটার ওপর অনেকের নজর আছে। খবরদার, ওদিকে নজর দিস না। সিংহাসন যে চুরি করবে তার রক্ষে নেই। আজ হোক কাল হোক, তার মুণ্ডু দিয়ে আমরা গেণ্ডুয়া খেলবই। গেলবার ওটা চুরি করেছিল ওই ভৌত-ক্লাবের একটা লোক। তার নাম নন্দলাল। তাকে কী শাস্তি দেওয়া যায় তাও আজকের মিটিং-এ ঠিক করা হবে।"

নন্দলাল নাম শুনে ভুতো একটু চমকে উঠল। নন্দবাবু ভাল লোক, চুরিটুরি করেন না কখনও। ভূতের সিংহাসন চুরি করতে যাবেন কেন তাও ভুতো বুঝতে পারল না। ভয়ে সে সিঁটিয়ে রইল। চারদিকে গিজগিজ করছে ছায়া-ছায়া সব লম্বাটে মূর্তি। তাদের শরীরে অনবরত ঢেউ খেলে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে শুধু ধকধক করছে জ্বলছে চোখ। কথাবার্তা হচ্ছে ফিসফিস করে। সেটাকে মনে হচ্ছে বাতাসের হাহাকারের মতো।

ভুতোর মনে হচ্ছিল, সভার কাজ চলছে। কিন্তু কীভাবে চলছে তা সে বুঝতে পারছে না। সে এখনও জালদড়িতে বাঁধা। জনার্দন পাশেই গোল বলের মতো পাকিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে।

ভুতো খুব নরম স্বরে ডাকল, "জনার্দনদা।"

জনার্দন খ্যাঁক করে উঠল, "দিলি তো ফের ঘুমটা ভাঙিয়ে!"

"ঘুমোচ্ছিলেন নাকি?"

"আমি মওকা পেলেই ঘুমোই।"

"বলছিলাম কি, এরা সব কোন ভাষায় কথা বলছে?"

"ও তুই বুঝবি না। আমরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলি তখন টেলিপ্যাথিতে কথা হয়।"

"তবে ফিসফাস হচ্ছে কেন?"

"তাও হয়। আমাদের টেলিপ্যাথি অন্যরকম। বাতাসে নাড়া দিয়ে পাচ্ছিল না ভুতো। তবে একটা উত্তেজনা টের পাচ্ছিল। জনার্দন তাকে শূন্যে দুলিয়ে ঢিবিটার নীচে নিয়ে মাটির ওপর রাখল। তারপর বলল, "লম্বোদর, এই মানুষের ছানাটাকে ধরে এনেছি।"

লম্বোদরের লম্বা গলা ঢিবির ওপর থেকে ক্রেনের মতো নেমে এল। দুটো চোখ ধকধক করে জ্বলতে লাগল ভুতোর মুখের ওপর। তারপর হঠাৎ লম্বোদর একটা চাপা আর্তনাদ করে বলল, "এ কাকে এনেছিস?"

"তার মানে?"

"এ-তো ভূতনাথ সমাজপতি!"

"তাতে কী হল?"

"লম্বোদর সমাজপতির ছেলে হল বৃকোদর, তস্য পুত্র দামোদর, তস্য পুত্র শিবচন্দ্র, এ হল শিবচন্দ্রের ছেলে ভূতনাথ সমাজপতি। লম্বোদরের বংশধর।"

জনার্দন মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বলল, "তা হলে তো বড্ড গণ্ডগোল হয়ে গেছে! জুতমতো পেয়ে ধরে এনেছিলাম।"

"ছিঃ ছিঃ! এরকম ভুল হবেই বা কেন? আমরা তো গন্ধেই বুঝতে পারি কে কোন্ বংশের।"

"মাপ চাইছি। তা হলে এটাকে কী করি?"

"জায়গামতো পৌঁছে দিয়ে আয়।"

জনার্দন ফের তাকে শূন্যে তুলে নিয়ে চলল বটে, কিন্তু লম্বোদরের সিংহাসনটা ততক্ষণে ভাল করেই দেখে নিয়েছে ভুতো। সিংহাসনটা আসলে একটা লাল হেলমেট।

ভুবন রায় আজ নিজেই ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে এসেছেন। অনেকদিন নানা গণ্ডগোলে কিছুই আবিষ্কার করতে পারেননি। আজ কিছু আবিষ্কার না করলেই নয়।

অনেকদিন আগে তিনি রথের মেলায় 'আঁটুলের গুপ্তবিদ্যা' নামে একখানা বই কিনেছিলেন। তাতে অদ্ভুত-অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা করার কৌশল ছিল। একটা ছিল 'পাখির মতো উড়িবার কৌশল', ছেলেবেলায় সেই কৌশল আয়ত্ত করার অনেক চেষ্টা তিনি করেছেন। তবে সফল হয়নি।

আজ অনেকদিন বাদে তাঁর কৌশলটা নিয়ে একটু মাথা ঘামানোর ইচ্ছে হল। ল্যাবরেটরিতে বসে তিনি রামলালকে ডেকে পাঠালেন।

"হ্যাঁ হে রামলাল, তোমার কাছে এয়ারোডাইনামিক্সের বই আছে?"

"আজ্ঞে আছে। আপনিই কিনিয়েছিলেন। এনে দেব?"

"না বাপু, ওসব খটোমটো বই পড়ে আমি কিছু বুঝতে পারি না। মোদ্দা কথায় ব্যাপারটা আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও।"

রামলাল ঘাড় চুলকে বললেন, "মোদ্দা কথায় এয়ারোডাইনামিক্স বোঝানো খুব শক্ত। অঙ্ক-টঙ্কেরও ব্যাপার আছে।"

"অঙ্ক!" বলে ভুবন রায় চোখ কপালে তুললেন। তারপর তিক্ত গলায় বললেন, "তোমাদের বৈজ্ঞানিকগুলোও হয়েছে বড্ড হামবাগ। সহজ সরল জিনিসকে এমন পেঁচিয়ে দেখাবে। যাহোক, তুমি যা জানো তাই বলো। এমনভাবে বলো যাতে বুঝতে পারি।"

রামলাল একটু ভয় খেয়ে বললেন, "ওটা যে আমার সাবজেক্ট নয়। বইটা আপনাকে পড়ে শোনাতে পারি।"

"আহা, ওড়ার তো একটা কৌশল আছে। সেটা কী? এই যে হাজার-হাজার পাখি আকাশে উড়ছে, চিল শকুন কাক, এরা কি সব অঙ্ক-টঙ্ক শিখে নিয়ে আকাশে উড়ছে? নাকি এরা এয়ারোডাইনামিক্সের কোনও খবর রাখে! বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের মধ্যে ওই অঙ্কের ভজঘট্ট ঢুকিয়ে তোমরা একেবারে বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড করে রেখেছ।"

রামলাল ঘনঘন মাথা চুলকে বললেন, "আপনি কী আবিষ্কার করতে চাইছেন তা জানলে না-হয় একটু ভেবে দেখতাম।"

"আরে অতি সামান্য ব্যাপার। ধরো, বিকেলের দিকে আমি একটু আমার বন্ধু সত্যশঙ্করের বাড়ি যাব। তা রোজই তো হেঁটে যাই। এক-একদিন একটু উড়ে উড়ে গেলাম। গায়ে হাওয়াও লাগল, চারদিকটা দেখাও হল, বুঝলে না?"

"যে আজ্ঞে।"

"কাজটা খুব শক্ত মনে হচ্ছে কি?"

"তা শক্তই হবে বোধহয়।"

ভুবন রায় কঠোর গলায় বললেন, "তোমাকে তো আর এরোপ্লেন বা হেলিকপ্টার বানাতে বলিনি হে বাপু! শক্ত আবার কী? আঁটুলের গুপ্তবিদ্যায় এসব অনেক কৌশল ছিল। ছেলেবেলায় পড়েছিলুম। এখন আর মনে নেই।"

"সে-বই আমি পড়িনি।"

"পৃথিবীতে ভাল জিনিস কিছুই টিঁকে থাকে না। সেসব বই কি আর পাওয়া

যাবে? যাকগে, যা বলেছিলাম। ওড়ার ব্যাপারটার কী হবে?"

"ভেবে দেখি।"

"আমিও চেষ্টা করছি। তুমিও বেশ করে ভেবে দ্যাখো। এমন কিছু বের করতে হবে, যা নিতান্তই হালকা, পকেটে নেওয়া যায়। দিব্যি ভেসে থাকা যায়।"

"যে আজ্ঞে।"

"বেশি দেরি কোরো না। আমি কালকের মধ্যেই জিনিসটা আবিষ্কার করে ফেলতে চাই। শুভস্য শীঘ্রম। যন্ত্রটা আবিষ্কার করে ফেলতে পারলে বাজারহাট করারও বেজায় সুবিধে হয়ে যাবে। বাজারের রাস্তাটা খুঁড়ে মেরামত করছে বলে যাতায়াতের বেশ অসুবিধে।"

"যে আজ্ঞে।"

"তুমিও কোনও-কোনওদিন ওটায় করে কলেজে যেতে পারবে।"

"যে আজ্ঞে।"

"ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে আর কষ্ট পাবে না। কী বলো?"

"যে আজ্ঞে।"

"আর মাকেও গঙ্গাস্নান করিয়ে আনা যাবে।"

"সে তো বটেই।"

"আর ধরো, নীচে পরিষ্কার বাতাসের অভাব হলে ওপরে উঠে কিছুক্ষণ বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করে আসা যাবে।"

"ঠিকই তো।"

"ধরো, আকাশে একটা এরোপ্লেন উড়ে দিল্লি যাচ্ছে। আমার হয়তো দিল্লিতে মাসির বাড়িতে একটা খবর পাঠানো দরকার। আমি চট করে উড়ে গিয়ে পাইলটকে খবরটা দিয়ে দিলুম, সে পৌঁছে খবরটা পাঠিয়ে দেবে। এতে ভাল হবে না?"

"খুবই ভাল হবে।"

"তারপর ধরো, এর জন্য যদি ওরা নোবেল প্রাইজটা নেহাত দিতেই চায়, তা হলে সেটা প্রত্যাখ্যান করার কোনও মানেই হয় না। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য আমাদের যথেষ্ট টাকার দরকার।"

"সে তো বটেই।"

"নোবেল পেলে নামটামও একটু ছড়ায়।"

"যে আজ্ঞে। নোবেল খুব ভাল জিনিস।"

"কাজেই আর দেরি কোরো না। অঙ্ক-টঙ্ক যদি কিছু কষতেই হয় সে তুমি কষে ফেলোগে। আমাকে শুধু মোদ্দা কথাটা জানালেই হবে।"

"আজ্ঞে তাই ভাল।"

রামলাল চলে যাওয়ার পর ভুবন রায় কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা আইডিয়া এসে গেল। পরিদের কথা তাঁর তো এতক্ষণ মাথাতেই আসেনি। পরিরাও মানুষের মতোই হয় বলে তিনি শুনেছেন।

"রামলাল! রামলাল!"

কিছুক্ষণ পর খবর পেয়ে রামলাল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন।

"আজ্ঞে?"

"আচ্ছা পরিদের ডানা কী দিয়ে তৈরি বলো তো!"

"পরি! আজ্ঞে পরিদের কথা তো জানি না।"

"জানো না! জানো না মানে! এসব কি শেখানো হয় না নাকি?

"বিজ্ঞানে পরিদের কোনও স্থান নেই।"

"অ। আচ্ছা ফড়িংকে কি তোমরা বিজ্ঞানে স্থান দাও?"

"আজ্ঞে তা দিই। এন্টেমোলজিতে ফড়িং গুরুত্বই পায়।"

"আমার মনে হয় ফড়িং এবং পরির ডানা একই মেটেরিয়ালে তৈরি।"

"তা হতেই পারে।"

"ভাল করে খোঁজ নাও। ফড়িংয়ের ডানা কী দিয়ে তৈরি সেটাও দেখতে হবে।"

"যে আজ্ঞে।"

"তবে তোমাকে এও বলে রাখি, ডানা-টানা আমার পছন্দ নয়। ডানার অনেক ঝঞ্ঝাট। সেটা ক্রমান্বয়ে নাড়তে হয়। আমি আরও সিম্পল জিনিস চাই। ধরো, দেশলাইয়ের বাক্সের মতো। বুঝেছ?"

"খুব বুঝেছি।"

"তাতে সুবিধে বেশি। তাই না?"

"আমিও সেই কথাই বলি।"

"কোন কথা?"

"ডানার চেয়ে দেশলাই ঢের ভাল। ঝামেলা কম।"

"হ্যাঁ। কথাটা মাথায় রেখে কাজ করো।"

"যে আজ্ঞে।"

রামলাল চলে যাওয়ার পর চঞ্চলমতি ভুবন রায় স্থির থাকতে পারলেন না। নানারকম জিনিসপত্র নিয়ে উড়ান-যন্ত্র তৈরি করতে বসে গেলেন। কাজে সাঙ্ঘাতিক মগ্ন।

ঘণ্টা-দুয়েক বাদে তিনি একটা বাক্সের মতো জিনিস বানিয়েও ফেললেন। ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আপনমনেই বললেন, "এটা দিয়ে কি সত্যিই ওড়া যাবে?"

কে যেন কানের কাছে বলে উঠল, "যাবে।"

"কে?"

"আজ্ঞে আমি দৈববাণী।"

দৈববাণী? বিজ্ঞানে কি দৈববাণীর কোনও স্থান আছে? ভুবন রায় ভ্রূ কুঁচকে ভাবলেন, তারপর তাঁর মনে হল, না হবেই বা কেন? ঈশ্বর তাঁকে অনন্ত ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁর ভিতর দয়েই হয়তো ঈশ্বরের কোনও ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

তিনি গলাখাঁকারি দিয়ে একটু ইতস্তত করে বললেন, "তা হ্যাঁ হে দৈববাণী, তুমি এখনও ধারেকাছে আছ নাকি?"

"বিলক্ষণ।"

"তা ইয়ে ভগবানের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা তা হলে বোলো।"

তা তো বলবই। ভগবানও জানেন কিনা, তিনিই পাঠালেন।"

ভুবন রায় দু'হাত আনন্দের সঙ্গে ঘষে নিয়ে বললেন, "বাঃ, চমৎকার। এতদিনে তা হলে নোবেলটাও পাওয়া যাবে, তা হ্যাঁ দৈববাণী, একটা কথা বলবে?"

"নিশ্চয়।"

তা ওখানে আইনস্টাইন বা নিউটনের সঙ্গে দেখা হয়?"

"রোজ দু'বেলা হচ্ছে মশাই।"

"তা তাঁরা সব আমাকে নিয়ে আলোচনা করেন নাকি?"

"খুব করেন। রীতিমত ভাবনায় পড়েছেন সবাই।"

"কীরকম?"

"আপনি যা কাণ্ড করছেন, তাতে তো তাঁদের নাম দুনিয়া থেকে মুছে যাওয়ার দাখিল হয়েছে। কারও আর চোখে ঘুম নেই, খাওয়া কমে গেছে।"

"বটে!"

"তবে হ্যাঁ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আর জগদীশচন্দ্র বসু খুব খুশি। আপনি বাঙালি হয়ে যেভাবে সাহেবদের টেক্কা দিলেন তার তুলনাই হয় না।"

"হেঃ হেঃ, এ আর এমন কী, সাহেবরাও এতদিন কম কিছু করেনি।"

"তা করলেও আপনার কাজে লাগে না।"

"তা বটে, আমার ধাতটা একটু অন্যরকম কিনা। এই তো রামলাল আমাকে অঙ্ক দিয়ে ভয় দেখাচ্ছিল, দিয়েছি ধমকে।"

"রামোঃ, অঙ্ক আবার একটা জিনিস নাকি?"

"আমার তো অঙ্কের দরকারই হল না। কেমন ওড়ার যন্ত্র বানিয়ে ফেললুম।"

"সে-কথাই তো আমরা স্বর্গে আলাপ-আলোচনা করি।"

"বটে! বটে! তা কী কথা হয়?"

"ভগবান নিজেই আপনার কথা তুলে মাঝে-মাঝে বলেন, হ্যাঁ, মানুষের মতো একখানা মানুষ বটে ভুবন রায়। যেমন রোখ, তেমনি ঝোঁক! ওরকম আর-একখানা মানুষ বানাতে পারলে বড় আনন্দ পেতাম। কিন্তু ছাঁচ ভেঙে ফেলেছি, আর তো হওয়ার নয়।"

"ছাঁচটা আবার কী?"

"প্রত্যেকটা মানুষের জন্য আলাদা-আলাদা ছাঁচ থাকে তো? যেই একটা তৈরি হয় অমনি ছাঁচ ভেঙে দেওয়াই নিয়ম। তাই একটার মতো আর-একটা হয় না কি না।"

ভুবন রায় খুব হাসলেন, বললেন, "তা বটে, আচ্ছা ওরা কি এর জন্য নোবেলটা আমাকেই দেবে?"

"না দিয়ে যাবে কোথায়? একবার নয়, নোবেল আপনার বার-চারেক পাওয়া উচিত।"

ভুবন রায় চোখ কপালে তুলে বললেন, "বলো কী হে দৈববাণী! নোবেল চারবার! সে যে অনেক টাকা?"

"তা বলতে পারেন দু'কোটির কিছু ওপরেই হবে।"

"দু'কোটি!" বলে ভুবন রায় মাথাটা চেপে ধরে বসে পড়লেন।

"ঘাবড়াচ্ছেন কেন? দু'কোটি তো নস্যি। এ জিনিস বিক্রি করলে তো আরও কত কোটি আসবে গুনে শেষ করতে পারবেন না।"

"উঃ, এ যে ভাবা যায় না। মাত্র কয়েক ঘণ্টার কাজে এত!"

"ভগবান যাকে দেন ছপ্পর ফুঁড়ে দেন।"

"তাই দেখছি।"

"তারপর খ্যাতির কথাটাও ধরুন। পৃথিবীতে সবাই এক ডাকে ভুবন রায়কে চিনে যাবে।"

"তা তো বটেই।"

"সেটারও তো দাম হয় না।"

"খ্যাতি তো আছেই। তবে খ্যাতির বিড়ম্বনাও কম নয়।"

"তা ঠিক। খাত্যি বলেই দুনিয়ার সব দেশ ডাকাডাকি করবে। আজ আমেরিকা, কাল রাশিয়া, পরশু চীন। খুব ছোটাছুটি পড়ে যাবে।"

ভুবন রায় উজ্জ্বল হয়ে বলেন, "তা নাকি?"

"নাকি মানে? ডাক এল বলে।"

“তা হলে এখন কি একটু চড়ে দেখব?”

“এখন কী দরকার? দৈববাণী তো বলছে যন্ত্রটা তৈরি হয়ে গেছে। বাইরে এখন বেশ অন্ধকার। এ সময়ে ওড়াউড়ি করতে গেলে বাদুড় বা প্যাঁচার সঙ্গে ধাক্কা লাগতে পারে। বাদুড়ের আবার ধারালো নখ আছে।”

“ও বাবা, তা হলে থাক।”

“ইয়ে একটা কথা ছিল।”

“কী কথা?”

“এত বড় একটা কাজ করলেন, ভগবানকে কিছু দেবেন-টেবেন না?”

“ভগবান কিছু চান নাকি?”

“না, না, ওসব চাওয়া-টাওয়া তাঁর ধাতে নেই। তবে কিনা দেওয়াটাই দস্তুর।”

“তা দেব না কেন। সোয়া পাঁচ আনা বা পাঁচ সিকে দিলেই তো হয়।”

“এটা একটা কথা হল?”

“কেন আমরা তো ওই রেটেই পুজো দিই।”

“সে আপনার অর্ডিনারি পুজো। চার-চারটে নোবেল পেলে কি আর পাঁচ সিকেতে হয়! নোবেলের পিছনে ভগবানের খাটুনিটার কথাও ভাবনু। কত সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচের ছাঁচ বানাতে হয়েছিল।”

তা হলে পাঁচ টাকাই দেব না হয়।”

“ছিঃ ছিঃ, নজরটা একটু উঁচু করুন ভুবনবাবু। আপনার উচিত পাঁচ লাখ দেওয়া। আমরা না হয় আপনার সম্মানে কিছু কমিয়ে দিচ্ছি। পাঁচ হাজার।”

ভুবন রায় আবার মাথায় হাত দিলেন, “পাঁচ হাজার!”

“ওর কমে আজকালকার বাজারে কি চারটে নোবেল পাওয়া যায়! পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করে দেখুন না!”

“না হে দৈববাণী, তোমার রেটটা বড্ড বেশি।”

“আমি নিমিত্ত মাত্র। ভগবানেরই ভোগে লাগবে। স্বর্গেও এখন জিনিসের দাম বেশ চড়া।”

“আচ্ছা, পঞ্চাশটা টাকা কাল সকালে থোক পুরুতমশাইকে দেব’খন, পুজো দিয়ে দেবে।”

“কী যে বলেন, পুরুত দিয়ে পুজো করাবেন কোন দুঃখে! ওসব মারফতি কারবার আর কেন? টাকাটা ফেলে দিন, আমরা টুক করে নিয়ে স্বর্গে একেবারে ভগবানের শ্রীচরণে ফেলে দিয়ে আসব। তিনি খুশিও হবেন। তবে পঞ্চাশ নয়।”

“কত”

'চার হাজার নশো নিরানব্বই। এক টাকা ছেড়ে দিচ্ছি।''
''ও আমি পারব না।''
''পুরো সাড়ে চার হাজারই দিন তবে। মেলা কমে গেল। জলের দরে নোবেল।''
ভুবন রায় পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে টাকা গুনে বললেন, ''না হে, হচ্ছে না।''
''কত আছে?''
''পাঁচশো টাকার মতো।''
''এখন ওটাই আগাম দিন। বাকিটা কাল নেবো।''
''কোথায় রাখব।''
''টেবিলে ওই উড়ানযন্ত্রের পাশে রেখে একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়ান, মিনিটখানেক।''
ভুবন রায় তাই করলেন। এক মিনিট বাদে ঘরে ঢুকে দেখলেন, টাকাটা নেই। যন্ত্রটা হাতে তুলে নিয়ে তিনি বিকটস্বরে চেঁচাতে লাগলেন, 'ইউরেকা! ইউরেকা!'

ভুতোকে শূন্যে ঝুলিয়ে এনে তার ঘরের দরজায় ঝপাস করে ফেলে জনার্দন বলল, ''এ যাত্রা খুব বেঁচে গেলি যাহোক।''
ভুতো চিঁচিঁ করে বলল, ''জনার্দনদা, একটা কথা ছিল।''
''আবার কী কথা?''
''লম্বোদর আমার একটা বংশপরিচয় দিচ্ছিল।''
''তার জন্যই তো বেঁচে গেলি।''
''কিন্তু আমার বংশপরিচয়টা এমন কী যে তোমরা খাতির করলে!''
''তা আমি জানি না, লম্বোদর জানে।''
''আমি কি লম্বোদরেরই বংশধর?''
''তাই তো মনে হল।''
''সেই লম্বোদর আর এই লম্বোদর কি এক?''
''ওসব বড় গোলমেলে কথা। মারপ্যাঁচের ব্যাপার। কিন্তু তোর অত খতেনে কাজ কী? গর্দানটা যে বাঁচাতে পেরেছিস সেই ঢের।''
''তা বটে। তবে আমি যদি লম্বোদরের বংশধর হয়ে থাকি তা হলে কিন্তু আমাকে তোমার একটু খাতিরটাতির করা উচিত।''
জনার্দন একটু বিপন্ন গলায় বলল, ''আবার খাতির চাইছিস! কেন, খাতিরটা কম কী করা হল শুনি!''

"তুমি মোটেই আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করোনি। কেবল ধমকেধামকে কথা বলছ। কিছু জিজ্ঞেস করলে কাটা-কাটা জবাব দিচ্ছ। তোমার ব্যবহার মোটেই ভাল লোকের মতো নয়।

"তা না-ই বা হল। লম্বোদরের বংশধর হয়ে কি মাথাটা কিনে নিয়েছিস নাকি?"

"তা আমি জানি না, লম্বোদরের সঙ্গে তো আর আমার তেমন সাক্ষাৎ-পরিচয় নেই। সে কেমন লোক তাও জানি না, তবে লম্বোদর যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে তা হলে বলে দেব যে, তুমি আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছ।"

"কখন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলুম? মহা পাজি ছেলে তো।"

"করোনি! এই যে সাত হাত ওপর থেকে দমাস করে ফেলে দিলে, আমার কোমরে কীরকম লেগেছে জানো?"

"আহা, ওরকম একটু-আধটু লেগেই থাকে। দাঁড়া, মালিশ করে দিচ্ছি।"

মালিশের দরকার নেই। তবে শোধ তুলতে আমিও ছাড়ব না। সাত বছরের মেছো জালে গাবের আঠা আর লোহার গুঁড়ো মাখিয়ে যখন ভূত ধরব, তখন দ্যাখাব মজা।"

"সর্বনাশ! তুই তখন বড় বললি যে, শুনতে পাসনি!"

"তা ওরকম একটু-আধটু বলতে হয়।"

"তুই মহা নচ্ছার দেখছি। তা ভাই; কী চাস বল তো!"

"যা চাই দেবে?"

"ভূতের সাধ্যে যা কুলোয় দেব। কিন্তু আমরা যে সব পারি তা কিন্তু নয়। অনেক কিছুই আমরা পারি না।"

"আমাদের ল্যাবরেটরিতে কয়েকদিন আগে এ-বাড়ির একটা ছেলে কয়েকটা কেমিক্যাল মিশিয়ে একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। সেই কেমিক্যালগুলো কী তা বের করতে পারবে?"

"ও বাবা, সে যে বিজ্ঞানের ব্যাপার!"

"বিজ্ঞান কি কিছুই জানো না?"

"না রে বাপু। বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের ঘোর শত্রুতা, সবাই বলে, বিজ্ঞানের বাড়বাড়ন্ত হলে ভূতে মন্দা দেখা দেয়।"

"তা হলে উপায়টা কী! ফরমুলাটা যে আমাদের দরকার।"

"কিন্তু আমাদের যে বিজ্ঞানের ধারে-কাছে যাওয়া বারণ। লম্বোদরের কড়া হুকুম আছে।"

"লম্বোদর কিছু জানতে পারবে না। দুলাল সেন ভারী নিরীহ মানুষ ছিলেন। কিন্তু ওই বিস্ফোরণের ধোঁয়া নাকে যাওয়ার পরই তিনি ভীষণ গুণ্ডা আর ডাকাত

হয়ে উঠেছেন। যদি তাঁকে আবার আগেকার মতো মানুষ করতে হয় তা হলে আমাদের ফরমুলাটা জানা দরকার।''

''বটে! দুলাল সেন মানে সেই বজ্জাত লোকটা তো।''

''হ্যাঁ, যিনি ভূতের ব্যবসা করতে চাইছেন।''

''তা হলে তো ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে।''

জনার্দন চোখের পলকে ল্যাবরেটরিতে এসে হাজির হয়ে গেল। হাজির হয়ে যা দেখল, তা না দেখলে তার প্রত্যয় হত না। দেখল, ভুবন রায় একটা চেয়ারে বসে নানা কথা বলছেন আর দুটো লোক আলমারির পিছনে ঘাপটি মেরে থেকে সেইসব কথার জবাব দিয়ে যাচ্ছে। মেদ্দা কথাটা হল, ভুবন রায় একটা আকাশে ওড়ার যন্ত্র বের করেছেন বলে খুব তড়পাচ্ছেন, আর লোক দুটো দৈববাণী করে খুব সায় দিয়ে যাচ্ছে। লোক দুটোকে চিনতে মোটেই কষ্ট হল না জনার্দনের। একজন দুলাল সেন, অন্যজন পাঁচু মোদক। কথাবার্তা দুলাল সেনই চালাচ্ছেন। কায়দাটাও বেশ ভালই। ভুবন রায় মাথা-পাগলা লোক, তাঁকে টুপি পরানো শক্ত নয়।

জনার্দন রাগে দাঁত কিড়মিড় করার চেষ্টা করল। তবে দাঁত নেই বলে কিড়মিড়টা তেমন জমল না, দুলাল সেন আর পাঁচু মোদক যে মহা ধূর্ত লোক তাতে সন্দেহ নেই। এই দু'জনের জন্যই আজ দুনিয়ার যত ভূতের চোখে ঘুম নেই। খাওয়া অর্ধেক হয়ে গেছে। এরা যে যথেষ্ট এলেম রাখে তা জনার্দনও স্বচক্ষেই দেখল।

উড়ান-যন্ত্রটা যে কোনও কর্মের নয় তা জনার্দন হাড়ে-হাড়ে জানে। তবে তার মাথাতেও দুষ্টবুদ্ধি কিছু কম খেলে না। সে সুড়ুক করে দেশলাইয়ের বাক্সের মতো যন্ত্রটার মধ্যে ঢুকে ঘাপটি মেরে রইল।

ওদিকে 'ইউরেকা, ইউরেকা' বলে চেঁচাতে-চেঁচাতে ভুবন রায় বাইরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুলাল সেন আর পাঁচু মোদক হাসতে হাসতে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

পাঁচু বলল, ''দুলালবাবু, আমার ওস্তাদ কালী তপাদার বলতেন, 'ওরে দুনিয়াময় চুরি অনেকেই করে, কিন্তু সত্যিকারের জাত-চোর ক'জন? ক'জন সত্যিকারের ওস্তাদ? ক'জন সত্যিকারের শিল্পী?' তা বলতে নেই দুলালবাবু, কালী তপাদারের চেলা হয়ে আমরা এতকাল যা করে বেড়িয়েছি তা নিছক ধ্যাষ্টামো, আপনি হলেন জাত-শিল্পী, আহা, কী বুদ্ধি, কি সাহস, কী বুকের পাটা!''

দুলাল সেন বুকটা একটু চিতিয়ে বললেন, ''তা বলতে পারো, তবে কিনা এ হল কলির সন্ধে, এখনই কী দেখছ! এরপর আরও কত হবে।''

পাঁচু একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, ''আপনার সবই ভাল দুলালবাবু, কিন্তু

দোষের মধ্যে ওই খাঁইটা, আপনি অল্পে খুশি নন, কেবল আরও চান, আরও চান। একসঙ্গে অত চাইতে নেই, আমার ওস্তাদ কালী তপাদার বলতেন, 'ওরে থামতে জানতে হয়। থামতে না জানলে অতি বড়রও পতন অনিবার্য।' আপনি ওই থামাটাই শেখেননি।"

"আহা, চটো কেন পাঁচু? বাচ্চাদের যখন প্রথম দাঁত ওঠে তখন তারা সবকিছুই কামড়াতে চায়। আমারও সেই দশা। চুরি করতে নেমে এমন নেশায় পেয়ে বসেছে যে, আর থামতে ইচ্ছে করছে না। তবে ক্রমে-ক্রমে ধাত আসবে। থামতেও শিখব, তা হলে এবার কী করা যায় বলো তো!"

"এখন আর নতুন কাজে হাত দেবেন না, রাত পুইয়ে এল, এবার একটু ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার। কাল রাতেও তো আবার কাজে নামতে হবে।"

"তা বটে, তবে ঘুমোতে আমার তেমন ইচ্ছে করছে না।"

"তা বললে হবে কেন? আপনার শরীরে এখন হাতির বল, কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ, আমার অত সয় না।"

"তা হলে এক কাজ করো, ওইপাশে আমার পুরনো বিছানাটা আছে, সটান গিয়ে শুয়ে পড়ো। আমি একটু যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করি। ভুবনবাবু এই ল্যাবরেটরির জন্যই আমাকে আনিয়েছিলেন, মনে পড়ছে।"

"এখানে শোব কী? ধরে ফেলবে যে!"

"আমি আছি, চিন্তা নেই।"

"কাজটা বিপজ্জনক হবে মশাই।"

"আরে আমাদের বিপদে ফেলবে তেমন মানুষ জন্মায়নি, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও, আমি সব সামলাব।"

পাঁচু অগত্যা হাই তুলতে তুলতে গিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

দুলালবাবু ভুবন রায়ের বানানো উড়ান-যন্ত্রটা হাতে নিয়ে একটু হেসে আপনমনে বললেন, "এঃ, উড়ান-যন্তর বানিয়েছে! নোবেল পাবে।"

ভুবন রায় যখন আনন্দে উদ্বাহু হয়ে 'ইউরেকা, ইউরেকা," বলে চেঁচাচ্ছেন তখন চেঁচানির চোটে লোকজন দৌড়ে আসছে। কালী তপাদারের চেলা পাঁচু বিপদের গন্ধ পাঁচ মাইল দূর থেকে পায়। সে লাফিয়ে উঠে দুলালবাবুর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, "কর্তা, এবার পালান।"

"আহা, হলটা কী? এখন তো কলির সন্ধে।"

"বিপদ। যে বিপদের গন্ধ না পায় সে চোর হওয়ার যোগ্যই নয়।"

দু'জনে একটা জানলা গলে বাইরে এলেন। পাঁচু বলে, "এবারটা ক্ষ্যামা দিন দুলালকর্তা, হরেনের দোকান থেকে লুঠ করা সব জিনিস তো ফেলেই চলে আসতে

হল, শুধু যদি বেশি লোভ না করতেন তা হলেই সোনাদানায় মিলিয়ে আমরা একক্ষণে লাখ টাকার মালিক হতুম। এখন যদি আর বেশি লোভ করেন তা হলে এই পাঁচশোও যাবে।''

দুলাল সেন চাপা গলায় ধমক দিয়ে বললেন, ''নজরটা একটু উঁচু করতে শেখো তো! পাঁচশোতে কেন খুশি হতে যাব! লোকটা তো পাঁচ হাজার কবুল করেছে!''

''পাঁচ হাজার নয়, সাড়ে চার হাজার। আপনিই তো দর কমিয়ে দিলেন।''

''ওই হল। আরও চার হাজার আদায় না করে ছাড়ছি না।''

পাঁচু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, ''আপনি চার হাজার আশা করে বসে থাকুন তবে। কাল সকালে যখন যন্তর নিয়ে উড়তে গিয়ে হাত-পা ভাঙবে তখন বুঝবেন।''

''আহা, তখন আর কোনও ফন্দি বের করা যাবে মাথা থেকে! এখন আমার মাথায় যে কত ফন্দি-ফিকির খেলছে সে আর তোমাকে কী বলব! মাথা-ভর্তি শুধু নানারকম ফন্দি-ফিকির। কী করে যে মাথাটা এত খুলে গেল, কিছু বুঝতে পারছি না। তবে এতদিনে মাথাটা বেশ কাজ করতে লেগেছে।''

পাঁচু আর-একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ''আহা, আপনার মাথাটা যদি আর একটু কম কাজ করত তা হলে আজ রাতেই আমরা রাজা হয়ে যেতুম।''

''রাজা হতে আর কীই-বা পরিশ্রম! রাজা তিন দিনে বানিয়ে দেব। রোসো না, মজাটা আগে দেখি। তোমার দোষ কী জানো?''

পাঁচু মাথা নেড়ে দুঃখের সঙ্গে বলে, ''গুনে দেখিনি, তবে দোষ মেলাই থাকবার কথা। আমার মতো লোক তো দোষে-গুণেই মানুষ। তা দোষটা কী দেখলেন?''

দুলালবাবু বললেন, ''তুমি কাজের মধ্যে কেবল লাভ খোঁজো মজাটা খোঁজো না। এসব কাজে লাভ যেমন, মজাও তেমনই। বরং মজাটাই বেশি।''

''যে আজ্ঞে। তা এক কাজ করলে হয় না? এ-কারবারে মজাটা আপনি নিন, টাকাটা আমি। একেবারে ন্যায্য ভাগাভাগি।''

দুলালবাবু একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, ''সেটা ভাল দেখাবে না। মজা জিনিসটা টাকা দিয়ে কেনা যায় না। সব সময়ে টাকা-টাকা করলে মজাটা মাটি হয়। তোমাকে আমি মজা থেকে বঞ্চিত করতে চাই না।''

পাঁচু আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ''যে আজ্ঞে।''

দুলালবাবু অত্যন্ত গম্ভীর মুখ করে বললেন, ''এমনকী, এই পাঁচশো টাকাও আমি নিতে চাই না। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ। এসব ছোটখাটো কাজ করতে আজকাল আমার ঘেন্না হয়।''

এই বলে বিস্মিত পাঁচু মোদকের চোখের সামনেই টাকার তাড়াটা ফের

ল্যাবরেটরির মধ্যে জানলা গলিয়ে ছুঁড়ে দিলেন দুলালবাবু। পাঁচু হাঁ-হাঁ করে উঠেছিল, দুলালবাবু তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বললেন, "মজাটার কথা ভাবো। মজাই যদি না পেলে তা হলে টাকা কোন ভুতের বাপের শ্রাদ্ধে লাগাবে?"

"পাঁচশো টাকায় যে গন্ধমাদন হয়ে যেত মশাই।"

"গন্ধমাদন তো কিছুই নয়। টাকার বান ডাকিয়ে দেব। চলো।" পাঁচু গোপনে চোখের কোলটা মুছে নিয়ে বলল, "যে আজ্ঞে।"

জনার্দন উড়ান-যন্ত্রে মধ্যে ঢুকে বেশ একটু ঘুমিয়ে নিল। তবে ভুতের ঘুম মানুষের ঘুমের মতো তো নয়। চারদিকে যা-যা ঘটছে, তা সব তার মগজে একেবারে ভিডিও রেকর্ডিং-এর মতো উঠে যেতে লাগল। গাড়ল ভুবনবাবু চেঁচিয়ে লোক জড়ো করছেন, সেই ফাঁকে জাঁহাবাজ দুলাল সেন আর ফচকে পাঁচু হাওয়া হল। সে ফস করে বাক্স থেকে বেরিয়ে দুলালবাবু আর পাঁচু মোদকের গতিবিধিও লক্ষ করে নিল। খুব নিশ্চিন্তে, দুলকিচালে দু'জনে অন্ধকারের মধ্যে হেঁটে পোড়ো বাড়ির দিকেই যাচ্ছে। ভুতের সমাজ এদের ভয়েই আজকাল সিঁটিয়ে আছে। এরা ভুত ধরার ব্যবসা করতে চায়। যা এলেম দু'জনের দেখা গেল, তাতে কাজটা অসম্ভব বলেও মনে হল না জনার্দনের।

জনার্দন ফের ফিরে এসে যন্ত্রের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

জাঁহাবাজ দুলাল আর ফচকে পাঁচু যদিও লোকটাকে বোকা বানানোর তাল করছে, কিন্তু এই সুযোগে ওদেরই বোকা বানানো যাক। ভুবনবাবুকে সে উড়িয়ে আসবে।

ওদিকে ভুবনবাবুর চেঁচামেচিতে রামলাল, নন্দলাল, শ্যামলাল সবাই ছুটে এসেছেন। তাঁর নাতি-নাতনিরাও এসে গেছে।

ভুবনবাবু বিশ্বজয়ীর হাসি হেসে বললেন, 'ইউরেকা!"

রামলাল এগিয়ে এসে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু বানালেন নাকি?"

"বানালুম মানে! পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বললে কম বলা হয়। ওদিকে শুনলুম, নিউটন আর আইনস্টাইনেরও টনক নড়ে গেছে। স্বয়ং ভগবান অবশ্য খুব খুশি।"

কেউ ব্যাপারটা ধরতে না পেরে পরস্পর মুখ-তাকাতাকি করছিল।

ভুবনবাবু সহাস্যে বললেন, "কাজটা যে-ই শেষ করেছি অমনি দৈববাণী।"

রামলাল প্রতিধ্বনি করলেন, 'দৈববাণী? বলেন কী?"

"আর বলো কেন, একেবারে খাঁটি দৈববাণী। বললে, একবার নয়, চার-পাঁচবার নাকি আমি নোবেল পাব।"

রামলাল মাথা চুলকে বললেন, "ঠিক আছে। আপনি বরং খেয়েদেয়ে একটু ঘুমোন, অনেক খাটুনি গেছে তো।"

ভুবন রায় ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "এত বড় একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করে ফেললুম, অথচ সেটাকে গুরুত্ব না দিয়ে তুমি আমার খাওয়া আর ঘুম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন বলো তো!"

রামলাল সভয়ে বললেন, "আজ্ঞে, বলছিলুম, খুব ধকল গেছে তো।"

ভুবন রায় হিমশীতল গলায় বললেন, "তার মানে তোমার ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না! এই তো?"

রামলাল জিব কেটে বললেন, "কী যে বলেন! আপনার আরও সব অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের কথা কে না জানে!"

"দৈববাণীর কথাটাও তোমার বিশ্বাস হয়নি মনে হচ্ছে।"

রামলাল সবেগে মাথা নেড়ে বললেন, "দৈববাণীকে বিশ্বাস না করার কিছুই নেই। দৈববাণী হতেই পারে। হয়ও।"

"তুমি শুনেছ কখনও?"

"আজ্ঞে না। তবে কিনা আমি যুগান্তকারী কোনও আবিষ্কারও তো করিনি!"

ভুবন রায় চারদিকে তাকিয়ে সকলের মুখ দেখলেন। মুখে যা দেখলেন তাতে খুশি হলেন না। তাঁর মনে হল, এরা কেউ তাঁর কথায় ঠিকমতো বিশ্বাস করতে পারছে না। খুঁতখুঁত করছে।

ভুবন রায়, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বড়-বড় বিজ্ঞানীদের অনেক মেহনত করে লোককে বিজ্ঞান বিশ্বাস করাতে হয়েছিল। আমার কপালেও সেই কষ্টই আছে। বহোত আচ্ছা, বাদুড়ের নখ, প্যাঁচার অ্যাটাক সব উপেক্ষা করে এই রাতেই আমি আকাশে উড়ে তোমাদের দেখাচ্ছি।"

এই বলে কেউ বাধা দেওয়ার আগেই ভুবন রায় দৌড়ে তাঁর ল্যাবরেটরিতে ঢুকে হাতে দেশলাইয়ের বাক্সের মতো যন্ত্রটা নিয়ে ফের দৌড়ে বেরিয়ে এলেন। তারপর বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "দেখবে? তা হলে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য দেখার জন্য প্রস্তুত হও। চার-পাঁচটা নোবেল আমার কেন পাওয়া উচিত তা তোমাদের নিরেট মাথায় এবার ঢুকবে।"

যন্ত্রটা নিয়ে কী একটু কারিকুরি করলেন ভুবনবাবু কে জানে। সবাই সভয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ বাস্তবিকই সকলের চোখ গোল-গোল হয়ে উঠতে লাগল।

যন্ত্রটার মধ্যে খুব একটা কারিকুরি করার মতো কিছু ছিল না। ভুবনবাবু খানিকটা পারদ, খানিকটা হাইড্রোজেন গ্যাস, খানিকটা আরও সব আগড়ম-বাগড়ম মিশিয়ে যা-খুশি একটা কিছু করে যাচ্ছিলেন। তিনি শুনেছেন বিজ্ঞানের বেশিরভাগ আবিষ্কারই হয়েছে হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে। এরকম কোনও

অঘটন ঘটাতেই তাঁর চেষ্টা ছিল। দৈববাণীর ভরসা পেয়ে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, তাঁর অঘটন-ঘটন-পটিয়ান মাথা সত্যিকারের উড়ানযন্ত্র তৈরি করে ফেলেছে।

কিন্তু কী করে যন্ত্রটা ক্রিয়াশীল করতে হবে তা তাঁর জানা ছিল না। তিনি যন্ত্রটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-না-করতেই জনার্দন যন্ত্র থেকে বেরিয়ে এসে ভুবনবাবুকে সাপটে ধরে আকাশে উঠে যেতে লাগল। বেশ ধীরে-ধীরে দুলকি চালেই সে উঠছিল। কিন্তু ভুবনবাবু ঘাবড়ে গিয়ে "বাবা গো, মা গো" বলে চেঁচিয়ে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন। উত্তেজনার মাথায় রামলালকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি উড়তে চেয়েছিলেন বটে কিন্তু যে-ই পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল অমনি তাঁর সাহসের বেলুন গেল চুপসে।

এদিকে তাঁর পরিবারের লোকজন, ছেলেপুলে, নাতি-নাতনি, সব বাক্যহারা হয়ে গোল গোল চোখ করে চেয়ে আছে। এ যে সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড! দেখতে-দেখতে ভুবনবাবু দশ হাত, বিশ হাত ওপরে উঠে গেলেন। এবং তারপরও উঠতেই লাগলেন। অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলে ভুবনবাবুর গতিবিধির ওপর নজর রাখা হচ্ছিল।

ভুবনবাবু ওপর থেকে রামলালের উদ্দেশে বিকট হাঁক মেরে বললেন, "ওহে, অমন উজবুকের মতো চেয়ে দেখছ কী? শিগগির আমাকে নামানোর ব্যবস্থা করো। এই বুড়ো বয়সে পড়ে গেলে যে মাজা ভাঙবে, সে মাজা আর জোড়া লাগবে না।"

রামলাল বললেন, "যে আজ্ঞে। তবে কীভাবে নামানো যায় সেটাই ভাবছি। আপনার যন্ত্র তো খুবই সাকসেসফুল দেখতে পাচ্ছি। তা ওটায় নামবার গ্যাজেট নেই?"

ভুবনবাবু খিঁচিয়ে উঠে বললেন, "যন্ত্রে কী আছে না আছে তা কি ছাই আমিই জানি? তুমি বরং একখানা মই জোগাড় করে নিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি করে, আমার বড্ড ভয় করছে।"

শুধু রামলাল নন, ভুবনবাবুর বিপদ দেখে সকলেই মইয়ের জন্য ছোটাছুটি শুরু করে দিল। বাঁশের একটা মই বাড়ির নানা কাজে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। সেইটে যখন নিয়ে এসে দাঁড় করানো হল, তখন ভুবনবাবু মই-এর নাগালের অনেকটা ওপরে ঝুলে আছেন। মই বেয়ে নামা অসম্ভব।

ভুবনবাবু খেঁচিয়ে উঠে বললেন, "আর লম্বা মই পেলে না? কেন যে তোমরা ছোট-ছোট মই তৈরি করো তাও বুঝি না। লম্বা-লম্বা মই না বানালে মানুষের উন্নতিই বা হবে কী করে? ওহে নন্দলাল, যাও না একটু দমকলে খবর দাও। ওদের কাছে ওম্বা মই থাকে বলে শুনেছি।"

"যে আজ্ঞে!" বলে নন্দলাল ছুটলেন।

কিন্তু ভুবনবাবু ধীরে-ধীরে এত ওপরে উঠে যাচ্ছিলেন যে, দুনিয়ার কোনও মই তাঁর নাগাল পাবে বলে মনে হচ্ছিল না। শ্যামলাল টর্চ জ্বেলে দিলেন। কিন্তু টর্চের আলোও আর ভুবনবাবুর কাছে পৌঁছচ্ছিল না।

ভুবনবাবু ওপর থেকে খুব চেঁচামেচি করতে লাগলেন, "এই নাক মলছি, কান মলছি, আর এরকম বিদঘুটে আবিষ্কার করব না। আমি বিজ্ঞান একেবারেই ছেড়ে দিচ্ছি। রামোঃ, কোন পাগলে বিজ্ঞান জিনিসটা আবিষ্কার করেছে কে জানে বাবা। এর মতো খারাপ জিনিস হয় না। ও হে রামলাল, তোমারও আর বিজ্ঞানচর্চা করার দরকার নেই। কাল থেকে তুমি বরং সংস্কৃত শিখতে লেগে যাও। ল্যাবরেটরিটা তুলে দিয়ে শিব মন্দির করে ফেলব এবার। ওহে রামলাল, শিবমন্দির করাটাই কি ভাল হবে? নাকি কালী প্রতিষ্ঠা করবে? নাঃ এখানে দেখছি বড্ড ঠাণ্ডা।...."

ভুবনবাবু বারকয়েক হাঁচলেন।

এদিকে ভুবনবাবুর গগনবিহারের খবর পেয়ে পাড়া-প্রতিবেশী এসে জড়ো হতে লাগল। তারপর শহর ভেঙে পড়ল। হ্যাজাক, টর্চ, গাড়ির হেডলাইট ইত্যাদি জ্বেলে ভুবনবাবুর উড্ডীন অবস্থা সবাই দেখার চেষ্টা করতে লাগল।

বনবিহারীবাবুর বয়স নব্বইয়ের কোঠায়। তিনি আকাশের দিকে চেয়ে গদগদ স্বরে বললেন, "আহা, ভুবনবাবু সশরীরে স্বর্গে যাচ্ছেন। এমন কপাল কি আর আমাদের হবে! কত বড় পুণ্যাত্মা ছিলেন। আহা!"

শহরের সবচেয়ে বোকা হলেন হরিপদ রায়। তিনি অনেকক্ষণ ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করে বললেন, "পেটে খুব গ্যাস হয়েছিল নিশ্চয়ই।"

করালীর মা বরণকুলো নিয়ে এসে বসে-বসে চোখের জল ফেলছিলেন, আর তাঁর তিন নাতনি তিনটে শাঁখে ক্রমান্বয়ে ফুঁ দিয়ে যাচ্ছিল। করালীর মা বলছিলেন, "আমার অনেকদিন থেকেই মনে হচ্ছিল আমাদের ভুবনখুড়োই কল্কি-অবতার। মুখে কখনও কথাটা উচ্চারণ করিনি বটে, পাছে পাঁচ-কান হয়, এখন দেখলে তো, কল্কি অবতার আসলে কে।"

জনার্দন ভুবনবাবুকে অনেকটা উঁচুতে তুলে ফেলেছিল। কিন্তু বুঝতে পারল, এতে মজাটা মাটি হচ্ছে। তা ছাড়া ভুবনবাবু ভয় খেয়ে কেমন যে গোঁ গোঁ করতে লেগেছেন। সুতরাং জনার্দন ঝড়াক করে ত্রিশ-চল্লিশ ফুট নীচে নামিয়ে এনে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখল।

ভুবনবাবুকে টর্চের ফোকাসের মধ্যে পেয়ে সবাই খুব চেঁচাতে লাগল।

"এই যে ভুবনবাবু, নমস্কার...." "অভিনন্দন ভুবনবাবু...." "ও ভুবনদাদু, আমাকে একটু ওড়াবে?...." "পেন্নাম হই ভুবনকর্তা, এ যা দেখালেন একেবারে জম্পেশ ব্যাপার, একটু শিখিয়ে দিতে হবে কর্তা, দুটো পয়সা আসবে তা হলে

গরিবের ঘরে.....'' ''আচ্ছা ভুবনদাদু, ওখানে খাবার পাওয়া যায়......'' ''ভুবনদাদু কি পাখি হয়ে গেল বাবা?''

ভুবনবাবু একটু নীচে নেমেছেন বলে ধাতস্থও হয়েছেন। ওপর থেকে হাঁক মারলেন, ''রামলাল, নন্দলাল, শ্যামলাল, তোমরা করছটা কী? পাঁচজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তোমরাও মজা দেখছ? যাদের বাপের এত বড় বিপদ তারা দাঁড়িয়ে কী করে মজা দেখতে পারে তা তো আমার মাথায় আসে না।''

রামলাল ব্যথাহত গলায় বললেন, ''বাবা, আপনি কী বলছেন! আমি তো আপনার এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছি। বাস্তবিকই আপনার চার-পাঁচবার নোবেল পাওয়া উচিত।''

ভুবনবাবু অত্যন্ত তিক্ত গলায় বললেন, ''নোবেল! বিজ্ঞানে নোবেল! ও আমি ছোঁবও না। এ-যাত্রা যদি বেঁচে যাই তাহলে আমি পদ্য লিখতে শুরু করব। রবি ঠাকুরের মতো পদ্য লিখেই নোবেল পাব। বিজ্ঞান-টিজ্ঞান আর নয়।''

ভিড়ের মধ্যে আরও দুটি লোক গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে কাণ্ডটা দেখছিল। একজন দুলাল সেন, অন্যজন পাঁচু মোদক।

দুলালবাবু চাপা গলায় বললেন, ''ও পাঁচু, লোকটা যে আমাদের বোকা বানিয়ে দিল. হে! সত্যিই কি ওটা ওড়ার যন্ত্র নাকি!''

পাঁচু ড্যাবড্যাব করে ভুবনবাবুর দিকে চেয়েছিল। বলল, ''বাপের জন্মে এমন কাণ্ড দেখিনি। আমার ব্যাপারটা তেমন সুবিধের ঠেকছে না।''

''দুলালবাবু র‍্যাপারে মুখটা ভাল করে ঢেকে নিয়ে একটু অন্ধকারের দিকে সরে গিয়ে হঠাৎ হাঁক মারলেন, ''ভুবনবাবু, শুনতে পাচ্ছেন?''

দুলালবাবুর বজ্রকণ্ঠ শুনে সবাই চুপ মেরে গেল।

ভুবনবাবু একটু চমকে উঠে বললেন, ''এ যে দৈববাণীর গলা মনে হচ্ছে!''

''আজ্ঞে, ঠিকই ধরেছেন। দেখলেন তো, কেমন উড়লেন!''

ভুবনবাবু কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, ''তা খুব দেখছি বাপ দৈববাণী! আর দেখতে ইচ্ছে নেই। তা এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের পথ বাতলাতে পারো?''

''খুব পারি। আপনাকে যে বারণ করলুম রাতবিরেতে ওড়বার দরকার নেই, তা কথাটা তো শুনলেন না। তার ওপর চার হাজার টাকা বকেয়া পড়ে আছে, সেটা উশুল না হলে যন্ত্রটাই বা নামে কী করে? যার-তার কাছে তো আর বাকি পড়ে নেই, স্বয়ং ভগবানের কাছে বাকি-বকেয়া রাখাটা কি ঠিক হচ্ছে?''

''ঘাট হয়েছে দৈববাণী, মাটিতে পা রাখতে দাও, তক্ষুণি টাকাটা ফেলে দেব।''

''আজ্ঞে কথাটা মনে রাখবেন।''

''হাড়ে হাড়ে মনে রাখব। কিন্তু নামাবে কী করে?''

"ঢিল ছুঁড়ে।"

"ও বাবা! বলো কী?"

"ভয় পাবেন না, ঢিল বেঁধে দড়ির একটা প্রান্ত ছুঁড়ে দেব, আপনি টপ করে ধরে কোমরে দড়িটা ধরে বেঁধে ফেলবেন। আমরা সবাই মিলে দড়ি ধরে টেনে নামিয়ে আনব।"

ভুতো তার ঘরে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল। চেঁচামেচি শুনে হঠাৎ বেরিয়ে এসে কাণ্ডটা দেখে অবাক হল। ভুবনবাবু যে কেন এবং কীভাবে আকাশে ঝুলছেন তা একমাত্র সে-ই জানে।

সে একটু রাগের সঙ্গেই চেঁচিয়ে বলল, "জনার্দনদা, দাদুকে নামিয়ে দাও বলছি, নইলে লম্বোদরকে বলে দেব।"

এ-কথায় ভয় খেয়ে জনার্দন ফুটদশেক নেমে এসে একটু উঁচু থেকে আলগোছে ভুবন রায়কে ছেড়ে দিল।

ভুবন রায় মাটিতে পড়েই চেঁচিয়ে উঠলেন, "বাবা রে!"

না, বেশি চোটটোট লাগেনি। হাঁটুটা একটু ঝিনঝিন করল আর মাথাটা একটু টাল খেল। তবু ভুবনবাবু রামলালকে বললেন, "দ্যাখো দ্যাখো, হাড়টাড় ভাঙল-টাঙল কি না।"

রামলাল দেখেটেখে বললেন, "আজ্ঞে না, সব ঠিক আছে।"

বহু অটোগ্রাফের খাতা এগিয়ে এল ভুবন রায়ের দিকে। অনেক টেপরেকর্ডার। ভুবন রায় ভ্রূক্ষেপও করলেন না। বললেন, "আমার আর এসব দিকে মন নেই। আগে একটু ঠাণ্ডা হই। তারপর দেখা যাবে।"

হাতের যন্ত্রটা রামলালের দিকে এগিয়ে দিয়ে ভুবন রায় বললেন, "এটা এক্ষুনি নষ্ট করে ফ্যালো। এসব জিনিস অত্যন্ত বিপজ্জনক। হামানদিস্তায় ফেলে গুঁড়ো করো, তারপর অ্যাসিড ঢালো, তারপর পেট্রল ঢেলে আগুন দাও, তারপর মাটি সাত হাত গর্ত করে পুঁতে ফ্যালো। তার আগে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব না।"

রামলাল যন্ত্রটা নিয়ে বললেন, "যে আজ্ঞে। তবে এমন একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার এভাবে নষ্ট করলে যদি লোকে আপনাকে খারাপ ভাবে?"

ভুবন রায় মাথা নেড়ে বললেন, "যে যাই ভাবুক, ও-জিনিস নষ্ট না করলে আমি রাতে ঘুমোতে পারব না।"

ভুবন রায় তাঁর ঘরে এসে যখন ঘরের পোশাক পরে বাথরুমে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন তখন জানলা দিয়ে একটা গলা-খাঁকারির শব্দ এল, "আজ্ঞে দৈববাণী বলছিলুম।"

ভুবন রায় বিরক্ত হয়ে বললেন, "ও, তোমার সেই টাকাটা বুঝি?"

"যে আজ্ঞে। টাকাটা জানলার কাছে টেবিলের ওপর রাখলেই হবে।"

ভুবনবাবু বাক্স খুলে টাকা বের করে চার হাজার গুনে টেবিলে রেখে বললেন, "শোনো বাপু, ভগবানকে গিয়ে বোলো আর নোবেলের দরকার নেই। যথেষ্ট হয়েছে।"

"যে আজ্ঞে। তবে কিনা নোবেল আপনার বাঁধা। বিজ্ঞানে হল না তো কী! পদ্যে হবে।"

"হবে!" ভুবনবাবু ভারি অবাক হলেন।

"পদ্যেই হবে। লিখে দেখুন।"

ভুবনবাবুর আর বাথরুমে যাওয়া হল না। জানালার কাছে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর জানালার দিকে চেয়ে ভারি খুশিয়াল গলায় বললেন, "কী করে বুঝলে যে পদ্য আমার হাতে হবে?"

"ও বুঝতে দেরি হয় না মশাই। যার ভিতরে ভগবান এলেম দিয়েছেন তিনি যাতে হাত দেবেন তাতেই সোনা ফলবে। পদ্য লিখতে চান তাও হবে, যাত্রার পালা লিখতে চান তাতেও নোবেল এসে যাবে, চিন্তাশক্তির জন্য কোমর বেঁধে যদি লেগে পড়েন তাতেও নোবেল থেকে রেহাই পাবেন না। তা টাকাটা তোলা আছে তো মশাই?"

"আছে। কিন্তু মুশকিল হল কী জানো হে দৈববাণী, আমি জীবনে পদ্যটদ্য বড় একটা লিখিনি।"

"তাতে কী? আপনার ভেতরে কী আছে তা কি ছাই আপনি জানেন? কলম ধরলেই দেখবেন হুড়হুড় করে সব বেরিয়ে পড়বে। এই যে আপনি বিজ্ঞানের 'ব'-ও জানতেন না, তবু দেখলেন তো কেমন চট করে ওড়বার যন্ত্র বানিয়ে ফেললেন!"

ভুবনবাবু প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, "না না, আর এই সব্বোনেশে যন্ত্রটার কথা মুখেও এনো না হে দৈববাণী। যন্ত্রটার কথা আমি বেবাক ভুলে যেতে চাই। তুমিও ভুলে যাও।"

"তা না হয় চেষ্টা করব মশাই, কিন্তু ভোলাও কি সহজ কাজ, ভগবান আপনার মধ্যে বিজ্ঞানটা যে বড্ড বেশি করে দিয়েছেন, তাঁর খুব ইচ্ছে ছিল বিজ্ঞানটা আপনি চালিয়ে যান।"

ভুবনবাবু আবার মাথা নেড়ে আতঙ্কিত গলায় বললেন, "না না, কক্ষনো না, বিজ্ঞানে আমার সাঙ্ঘাতিক অরুচি এসে গেছে। ওর ধারে কাছেও আমি আর মাড়াচ্ছি না।"

"ভগবান কি ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখবেন? আপনার ক্ষমতাতে তো আপনি আলু দিয়ে অ্যাটম বোমা, মোচা দিয়ে রকেট, চাই এক নস্যির ডিবে দিয়ে নিউক্লিয়ার

সাবমেরিন বানিয়ে ফেলতে পারেন। এতখানি প্রতিভা নষ্ট করবেন মশাই? ভগবান যে ভারি দুঃখ পাবেন।"

ভুবনবাবু একটু চাপা গলায় বললেন, "ভগবানকে কথাটা বলার এখন দরকারটাই বা কী দৈববাণী? সব কথা কি তাকে বলা ভাল?"

"আরও মুশকিল কী জানেন, লোকে তাঁকে অন্তর্যমী বলে বটে, আসলে তিনি অত খোঁজখবর রাখেন না, এই আমরা তাঁর চেলা চামুণ্ডারাই তাঁকে গিয়ে যা-সব খবরটবর দিই আর কি। কিন্তু তা হলে আপনার মতো একজন গণ্যমান্য লোকের খবর তো আর চেপে রাখা যায় না। আমি গিয়ে হাজির হলেই প্রথমেই তিনি আপনার খবরই জানতে চাইবেন যে।"

"নাঃ, বড় মুশকিল হল দেখছি।"

"আজ্ঞে, মুশকিল একটু আছে। তিনি যদি জানতে পারেন যে, আপনি বিজ্ঞান ছেড়ে দিচ্ছেন তা হলে হয়তো তিনি কলকাঠি নেড়ে ফের আপনাকে বিজ্ঞানের দিকেই ঠেলে দিকটা খুলে দেবেন।"

"অ্যাঁ! ওরে বাবা! কিন্তু আমার যে ভয়ঙ্কর বিজ্ঞানভীতি হয়েছে হে দৈববাণী! ফের বিজ্ঞান নিয়ে পড়লে আমি যে মারা পড়ব। কোনও উপায় হয় না?"

"তা কি আর হয় না মশাই। হয়। তবে কিনা খরচাপাতিও তো বড় কম হবে না। প্রণামীটা একটু মোটা করে ফেললে ভগবান হয়তো খুশি হয়ে বিজ্ঞানটা মকুব করে পদ্যের দিকটা খুলে দেবেন। গুছিয়ে কথাটা বলতে হবে, এই যা।"

"সে তো খুবই ন্যায্য কথা হে। তা প্রণামীটা কত হলে হয় বলো তো!"

"তা ধরুন গিয়ে লাখ পাঁচেক।"

"ও বাবা, সে যে অনেক টাকা।"

"কাজটাও তো শক্ত। না হয় হাজার পাঁচেক কমই দেবেন।"

"তাতেও অনেক রয়ে গেল।"

"তা আপনি একটা দর রাখুন।"

"ধরো, যদি হাজার-পাঁচেক দিই?"

"না মশাই, সেটা বড় খারাপ দেখাবে। আসলে ওসব হাজার ফাজার ভগবানের চোখেই পড়ে না।"

"ধরো আরও হাজার পাঁচেক যদি দিই!"

"আর একটু উঠুন।"

"ওঠার কথা আর বোলো না হে দৈববাণী। উঠতে আজকাল যে-আমি বড় ভয় পাই। একটু আগেই তো দেখলে ওঠার কী সাঙ্ঘাতিক ঝক্কি।"

"টাকাটা বড় কথা নয় ভুবনবাবু। আর ভগবানেরই-বা টাকাপয়সা কোন কাজে

লাগবে? আসল কথাটা হল নজরটা ছোট করতে নেই। কে কত দিল সেটা দেখেই তার বিচার হয় কি না। তা ছাড়া আপনার কেসটাও গোলমেলে। বিজ্ঞান কেটে পদ্য করতে হবে। ধরা পড়লে দৈববাণীরই গর্দান যাবে, আপনার আর কী?"

ভুবনবাবু একটু বিরস মুখে বললেন, "পনেরো পর্যন্ত যেতে পারি। তার বেশি পেরে উঠছি না।"

"পনেরো!"

"পনেরো দিয়েই চালিয়ে দাও ভায়া। নোবেল পেলে বাদবাকি শোধ করে দেব।"

"খুব ঝামেলায় ফেললেন মশাই। তা আপনি ভগবানেরও পেয়ারের লোক, আপনার কথাটা আর ফেলি কী করে? তবে ওই পনেরো হাজারই টেবিলের ওপর রেখে একটু আড়ালে যান।"

"বাঁচালে!" ভুবনবাবু তাড়াতাড়ি আলমারি খুলে টাকা বের করে যথাস্থানে রেখে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন।

দুলালবাবু টাকাটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে অন্ধকারে পাঁচুসমেত হাওয়া হলেন।

পাঁচুর মেজাজটা ভাল যাচ্ছে না। বলল, "টাকা তো দু'হাতে লুটছেন, কিন্তু আপনার কপালে লক্ষ্মী বড় অস্থির। ভাল করে বসতে পারছেন না।"

"তোমার বড় লোভ পাঁচু। ওইজন্যই তোমার উন্নতি হচ্ছে না।"

"আজ্ঞে তা যা বলেছেন। তবে কিনা গরিবের কথা বাসী হলে মিষ্টি হয়। এই যে টাকাকে টাকা মনে করছেন না, দু-পাঁচ হাজার টাকা ফেলে ছড়িয়ে দিচ্ছেন এতে মা-লক্ষ্মী চটে যান। পরে দেখবেন হা-টাকা হো-টাকা করে মরতে হবে।"

"আহা, হবে হবে। টাকাও হবে, নামও হবে, ফুর্তিও হবে। শুধু টাকায় কোনও মজা নেই।"

"আজ রাতের মতো ক্ষ্যামা দিন কর্তা। দুটো চোখের পাতা এক হল না আজ। আমি বুড়োমানুষ, আপনার মতো তেজী লোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর পেরে উঠছিনে।"

"তাও হবে। বিশ্রাম তো সকলেরই দরকার। তবে গা আর একটু ঘামিয়ে তবে বিশ্রাম করলে আরাম পাবে। পনেরো হাজার টাকারও একটু ব্যবস্থা করা দরকার।"

পাঁচু আঁতকে উঠে বলে, "ব্যবস্থা! সে আবার কী? টাকাটা আমাদের আজ রাতের শেষ রোজগার। ওটা আর জলে ফেলবেন না।"

দুলালবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না না জলে ফেলব কেন? কোথায় ফেলব সেটাই ভাবছি।"

সকালবেলা ঘুম ভেঙে চোখ মেলতেই ভুবনবাবুর মনে একটা শব্দ যেন ডুগডুগি বাজাতে লাগল, "কবিতা! কবিতা! কবিতা!" ভুবনবাবু সটান উঠে

বসলেন। অনুভব করলেন তাঁর মাথা থেকে কে যেন রাতভর ঝেঁটিয়ে বিজ্ঞানের আবর্জনা সব বিদেয় করে দিয়েছে। বিজ্ঞানের আর তলানিও তাঁর মাথার মধ্যে পড়ে নেই।

ভুবনবাবু হাসি-হাসি মুখ করে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। তারপর জানলা দিয়ে বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে লাগলেন। সূর্য উঠি-উঠি করছে। গাছে-গাছে পাখি ডাকছে। বেশ কুয়াশা হয়েছে আজ। টুপটাপ শিশির ঝরে পড়ছে গাছ থেকে। ভুবনবাবুর মনে হল, পৃথিবীটা যেন কবিতায়-কবিতায় ছয়লাপ হয়ে আছে। আকাশে যেন অজস্র কবিতা ঘুড়ির মতো উড়ে-উড়ে লাট খাচ্ছে।

কবিতা যেন গাছে-গাছে বানরের মতো ঝুল খাচ্ছে। পাখিদের গলা থেকেও যেন কবিতারই কিচিরমিচির বেরিয়ে আসছে। তিনি শিশিরের শব্দের মধ্যেও কবিতার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন। কে যেন লিখেছিলেন, "কবিতা তোমায় আজকে দিলাম ছুটি!" না, ভুবনবাবুর মন আজ উলটো কথাই বলতে চাইছে, "কবিতা, আমার মুঠিতে তোমার ঝুঁটি।" কিংবা ঝুঁটির বদলে টুঁটিও চলতে পারে। কবিতাকে ছুটি দেবেন কি, কবিতা থেকে কি কারও ছুটি আছে?

ভুবনবাবু হাত-মুখ ধুয়েটুয়ে তৈরি হয়ে রামলালকে ডেকে পাঠালেন।

রামলাল কাঁচুমাচু মুখে এসে দাঁড়ালেন, "আজ্ঞে, আমাকে ডেকেছেন?"

ভুবনবাবু অতিশয় উদার গলায় বললেন, "ওহে রামলাল, তোমার কবিতা-টবিতা আসে?"

"আজ্ঞে না।"

ভুবনবাবু বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "বিজ্ঞান শিখে একেবারে গোল্লায় গেছ। কবিতা হল গিয়ে পৃথিবীর একেবারে যাকে বলে সব। কবিতা যদি বুঝতে না পারো তা হলে জীবনটারই অর্থ তোমার বোঝা হল না।"

"যে আজ্ঞে।"

"আমি বলি কি, আজ থেকেই তুমি কবিতার একটা হেস্তনেস্ত করতে লেগে যাও। এখনই বাজারে গিয়ে সবচেয়ে মোটা বাঁধানো খাতা গোটা দশেক আমার জন্য আর গোটা দশেক তোমার জন্য কিনে আনো। নন্দ আর শ্যামকেও জিজ্ঞেস করে দ্যাখো। চায় তো ওদের জন্যও খানকয়েক খাতা এনে দিও, আর কয়েক বোতল কালিও লাগবে। বইয়ের দোকানে গিয়ে যে ক'খানা কবিতার বই পাবে নিয়ে আসবে। আর ছন্দটন্দ শেখার বই পাওয়া যায় না?"

"খুঁজে দেখতে হবে।"

"দেখো। না পাওয়া গেলে কলকাতায় চিঠি লিখে ওসব বইও আনিয়ে নাও। আর ভাল দেখে কয়েকটা ডিকশনারি।"

“যে আজ্ঞে।”

“আর শোনো।”

“যে আজ্ঞে।”

“রবীন্দ্রনাথ যে পোশাক পরতেন সেটা লক্ষ্য করেছ?”

“রবীন্দ্রনাথ একটা জোব্বা পরতেন।”

“হ্যাঁ। ওরকম জোব্বাও গোটাকয়েক তৈরি করাতে হবে। ভাল দেখে রেশমি কাপড় কিনে আমার আর তোমাদের তিন ভাইয়ের মাপে অন্তত চারটে করে জোব্বা আজই ইরফান দর্জিকে তৈরি করতে দিয়ে এসো।”

“যে আজ্ঞে।”

রামলালকে বিদায় দিয়ে ভুবনবাবু একটু বাগানে এলেন। অনেক গোলাপ ফুল ফুটে আছে। তিনি একটি রক্তগোলাপ তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকলেন। ফুল, চাঁদ, পাখির ডাক, প্রকৃতি এসব না হলে কবিতার মেজাজ আসে না।

ভুবনবাবু বাগানে পায়চারি করতে করতে ফের টের পেলেন তাঁর চারদিকটায় জীবাণুর মতো কবিতা গিজগিজ করছে। কবিতা দিয়েই যেন ভগবান দুনিয়াটাকে বানিয়েছেন। তাঁর হাত কবিতা লেখবার জন্য নিশপিশ করতে লাগল।

সমস্যা হল, জীবনে একমাত্র পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আর তিনি কবিতা-টবিতা কখনও বিশেষ পড়েননি। কবিতা জিনিসটা যে নিতান্তই বাহুল্য জিনিস, তা তিনি এককালে বেশ জোর গলাতেই প্রচার করতেন।

আনমনে হাঁটতে হাঁটতে তিনি নন্দলালবাবুর ঘরের সামনে এসে পড়েছেন। ভেজানো দরজায় টোকা দিয়ে বললেন, “ওহে নন্দলাল, ঘরে আছ নাকি?”

নন্দলাল ঘরেই ছিলেন। প্রাতঃকালে এই সময়টায় তিনি প্রাণায়াম করেন। ভুবনবাবুর গলা পেয়ে তটস্থ হয়ে বললেন, “যে আজ্ঞে।”

ভুবনবাবু ঘরে ঢুকে নন্দলালকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, “ও কী! ব্যায়াম করছ নাকি? ছিঃ ছিঃ, ব্যায়াম করা যে খুব খারাপ অভ্যাস হে?” ওতে মনটা শরীরের দিকে চলে যায়। মাথায় সূক্ষ্ম ভাবনাচিন্তা আসতে চায় না, ব্যায়াম করলে কবিতা লিখবে কী করে?”

নন্দবাবু কিছু বুঝতে পারলেন না। তবে মৃদু গলায় বললেন, “কবিতা! আমি তো কবিতা-টবিতা লিখি না। কবিতা খুব খারাপ জিনিস। কবিতা লিখলে ধর্মভাব নষ্ট হয়ে যায়।”

ভুবনবাবু গম্ভীর হয়ে অত্যন্ত থমথমে গলায় বললেন, “তোমার মুখ থেকে এরকম কথা শুনব বলে আশা করিনি। শুনে মর্মাহত হলাম। কবিতা সম্পর্কে তোমার মনোভাব অত্যন্ত নিন্দনীয়। জানো, কবিতা দিয়েই ভগবান দুনিয়াটাকে

বানিয়েছেন? যদি দেখার চোখ থাকত তা হলে দেখতে পেতে আকাশে-বাতাসে কবিতারই অনুরণন হচ্ছে। আমি তো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।"

নন্দলালবাবু ভারি বোকাপানা মুখ করে চেয়ে রইলেন। ভুবনবাবুর মুখে কবিতার প্রশংসা শোনার মতো অবাক কাণ্ড আর কী আছে?

ভুবনবাবু নিমীলিত নয়নে চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে বললেন, "শুধু শোনা কেন, দেখতেও পাওয়া যায়। আজ সকালে কী দেখলুম জানো? দেখলুম, আকাশে কবিতার ঘুড়ি উড়ছে হাজার-হাজার। গাছের ডালে ডালে বানরের মতো ঝুল খাচ্ছে কবিতা। জীবাণুর মতো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে কবিতা।"

নন্দলালবাবু 'খ্যাঙ' করে একটা শব্দ করলেন।

"কিছু বললে নন্দলাল?"

"আজ্ঞে না।"

"একটা শব্দ শুনলুম যেন! যাকগে। যা বলছিলুম, কবিতা বোঝবার, কবিতা দেখবার চোখ চাই। ওসব ব্যায়াম-ট্যায়াম করো বলেই তোমার কবিতার অনুভূতিটা তেমন হচ্ছে না। আমি রামলালকে খাতা আনতে পাঠিয়েছি। আজ থেকেই কবিতা মকসো করতে বসে যাও। এমন কিছু শক্ত ব্যাপারও নয়। একটু-একটু করে ভাববে আর লিখবে।"

নন্দবাবুর মুখে আর শব্দ নেই। চোখের পলক পড়ছে না। খানিকক্ষণ বজ্রহাতের মতো দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, "যে আজ্ঞে।"

এদিকে রাতের ঘটনার খবর চারদিকে ছড়িয়ে যাওয়ায় ভোর হতে না হতেই দলে দলে লোক এসে বাড়িতে ভিড় করে ফেলল। তাদের মধ্যে খবরের কাগজের লোকও আছে।

ভুবনবাবু ভারি বিরক্ত হয়ে চাকরকে ডেকে বলেছিলেন, "ওরে, ওদের বলে দে, আমার শরীর খুব খারাপ, দেখা হবে না।"

একজন রিপোর্টার কয়লাওয়ালা সেজে ঢুকে পড়েছে, সে এসে জানলায় উঁকি দিয়ে বলল, "অভিনন্দন ভুবনবাবু, আমাদের কাগজের জন্য ছোট্ট একটা ইন্টারভিউ না দিলেই নয়।"

ভুবনবাবু ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললেন, "হবে না, আমার শরীর খুব খারাপ।"

"ইন্টারভিউ নিতে না পারলে আমার চাকরি থাকবে না।"

"চাকরি ছেড়ে কবিতা লেখো। কবিতার মতো জিনিস হয় না।"

"বলেন কি, আপনি কি কবিতারও ভক্ত? বিজ্ঞান আর কবিতাকে কীভাবে মেলাচ্ছেন সার?"

"মেলাচ্ছি না হে। বিজ্ঞান ছেড়ে কবিতা ধরেছি, কবিতা ছাড়া দেশের উন্নতি

নেই।"

লোকটা খসখস করে নোটবইতে ভুবনবাবুর এসব কথা লিখে নিতে-নিতে বলল, "বিজ্ঞান কেন ছাড়লেন তা যদি দু-এক কথায় বলেন!"

"বিজ্ঞান একটা যাচ্ছেতাই জিনিস। যার কাণ্ডজ্ঞান আছে সে কখনও বিজ্ঞানচর্চা করবেই না। বিজ্ঞানই দুনিয়াটাকে রসাতলে দিচ্ছে।"

"কিন্তু আপনি যে অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার করেছেন তার জন্য ইতিমধ্যেই চারদিকে হইচই পড়ে গেছে। লোকে বলছে, আপনি আগামী পৃথিবীর চেহারাই পালটে দেবেন।"

"শোনো হে বাপু, ঈশ্বর আমাকে মেলা প্রতিভা দিয়েছেন। আমি যদি ফুটবল খেলতুম, তা হলেও মারদাঙ্গা বা পালু হতে পারতুন—"

রিপোর্টার একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "মারদাঙ্গা আর পালু কে বলুন তো?"

ভুবনবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "কেন, ওই যে দু'জন বিশ্ববিখ্যাত খেলুড়ে--খুব নাকি ভাল খেলে!"

"ওঃ! মারাদোনা আর পেলের কথা বলছেন কি?"

"তাই হবে। কথা হল, যার প্রতিভা আছে সে বিজ্ঞানেও যেমন, কবিতাতেও তেমন, ফুটবল-ক্রিকেটেও কেউকেটা। বুঝলে।"

"আজ্ঞে তা তো বটেই।"

"প্রতিভা বড্ড বেশি হয়ে যাওয়ায় খানিকটা চলকে ওই বিজ্ঞানে গিয়ে পড়েছিল। তবে যা হওয়ার হয়েছে। বিজ্ঞানের ছায়াও আমি আর মাড়াচ্ছি না।"

রিপোর্টার মাথাটাথা চুলকে বলল, "সার, একটা কথা বলব? কিছু মনে করবেন না তো! আমি রিপোর্টার মানুষ, যখন-তখন যেখানে-সেখানে ছুটতে হয়। তাই বলছিলাম, বিজ্ঞান যখন ছেড়েই দিচ্ছেন তখন ওই যন্ত্রটা যদি আমাকে দান করেন।"

ভুবনবাবু চমকে উঠে বললেন, ওই সব্বনেশে জিনিস তুমি চাইছ? তুমিও তো দেখছি সব্বনেশে লোক! ওই যন্ত্র আমি রামলালকে গুঁড়ো করতে দিয়েছি। গুঁড়ো করে অ্যাসিডে ছড়িয়ে সাত হাত মাটির তলায় পুঁতে ফেলা হবে।

"ইস, বড্ড লস হয়ে গেল সার। দেখি যদি এখনও গুঁড়ো করা না হয়ে থাকে—" বলে রিপোর্টার দৌড় লাগাল।

রামলাল অবশ্য যন্ত্রটাকে গুঁড়ো করেননি। তিনি ল্যাবরেটরিতে বসে খুব মন দিয়ে যন্ত্রটাকে নানাভাবে পরীক্ষা করছিলেন। বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট কিছু ধারণা আছে। কিন্তু কোনও ধারণা দিয়েই তিনি যন্ত্রটার রহস্য ধরতে পারছিলেন না। বলতে কি, যন্ত্রটার মধ্যে তেমন জটিল কলকব্জা কিছুই নেই। এক নজরে ছেলেমানুষি কাটুমকুটুম বলেই মনে হয়। অথচ তাঁর বাবা ভুবনবাবু এই যন্ত্রে ভর

করেই আকাশে উঠে গিয়েছিলেন কী করে সেটা সম্ভব হল তা রামবাবু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না।

সকালবেলা তিনি খবর পাঠিয়ে কলেজের আর কয়েকজন বিজ্ঞানের অধ্যাপককে ডাকিয়ে এনেছেন। তাঁরা অবশ্য ভুবন রায়ের গগনবিহারের খবর জানতেন। দু-একজন নিজের চোখেই ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরাও ভারি ভাবিত এবং অপ্রস্তুত বোধ করছেন।

ফিজিক্সের গুণময়বাবু বললেন, "বিজ্ঞানের যে আমরা এখনও কিছুই জানি না এই যন্ত্রটা তা-ই প্রমাণ করছে।"

অঙ্কের শৈলেনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "আমার মনে হচ্ছে, এটা বিজ্ঞান-টিজ্ঞান নয়। এ হল যোগ। ভুবনবাবু যোগবলে শূন্যে উঠেছিলেন। আমার বাবার এক মেসো প্রায়ই এরকম উঠে যেতেন।"

কেমিস্ট্রির প্রসাদবাবু যন্ত্রটা দেখেশুনে বললেন, "আমাদের উচিত ব্যাপারটা সায়েন্স কংগ্রেসে জানানো।"

রামলাল বললেন, "আপনারা আর একটু বিষয়টি নিয়ে ভাবুন। আমার বাবা বিজ্ঞানের কিছুই জানেন না। বুড়োবয়সে তাঁকে কিছু ছেলেমানুষিতে পেয়েছে। তবে অনেক সময়ে নিতান্ত অবিজ্ঞানীর হাতেও হঠাৎ করে কিছু একটা আবিষ্কার ঘটতে পারে। কিন্তু এ-যন্ত্রটা লক্ষ্য করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন, এর মধ্যে তেমন কিছু নেই। সকাল থেকে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও আমি বহুবার এই যন্ত্রটার সাহায্যে ওড়বার চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি। বাবা তা হলে কীভাবে উঠলেন?"

শৈলেনবাবু ফের বললেন, "যোগ।"

বিজ্ঞানীরা অনেকক্ষণ ভাবলেন এবং যন্ত্রটাকে নানাভাবে পরীক্ষা করলেন। অবশেষে প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর স্বীকার করলেন যে, সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম বা বিজ্ঞানের ধর্ম অনুযায়ী যন্ত্রটাকে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না।

রামলাল একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "এই যন্ত্রটা আবিষ্কারের ফলে অবশ্য একটা উপকার হয়েছে। বাবা বিজ্ঞান ছেড়েছেন এবং আমিও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। কিন্তু বাবার মাথায় নতুন যে আইডিয়া এসেছে সেটা আরও সাঙ্ঘাতিক।"

সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন, "কী সেটা?"

"উনি এখন কবিতা লেখার দিকে ঝুঁকেছেন। বাজারে খাতা কিনতে লোক পাঠানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, উনি চান আমিও বিজ্ঞান ছেড়ে কবিতা লিখতে শুরু করি।"

ফিজিক্স গম্ভীর হয়ে বললেন, "কবিতা! সে তো খুব খারাপ জিনিস।"

অঙ্ক বললেন, "অতি বিচ্ছিরি, কিছুই বোঝা যায় না।"

কেমিষ্ট্রি বললেন, "কবিতা দেখলেই আমার মাথা ঘোরে।"

রামলাল বিরস বদনে বললেন, "তা হলে আমার অবস্থাটা কীরকম তা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন।"

"হনুমানের মতো," শৈলেনবাবু বললেন।

রামলাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁর দুর্দশায় সমবেদনা জানিয়ে সহকর্মীরা বিদায় হওয়ার পর রামলাল একা বসে ফের চিন্তা করতে লাগলেন। ভুবনবাবু বিজ্ঞানের বাতিক খুবই অস্বস্তিকর ছিল বটে, কিন্তু কবিতা ঘাড়ে চাপলে কি আর রামলাল বাঁচবেন! আবার তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

এমন সময় কে যেন বলে উঠল, "তা কবিতাও তেমন খারাপ জিনিস নয়! কবিতা দিয়েও কত কী হয়!"

রামলাল চমকে উঠে বললেন, "কে?"

দাড়িগোঁফওয়ালা কালো চশমা চোখে একটা লোক আর-একজন দাড়িগোঁফওয়ালা চশমা চোখে লোককে নিয়ে ঘরে ঢুকে ভারি অমায়িক হেসে বলল, "এই আমরাই কথাটা বলছিলুম।"

"আপনারা কারা?"

"আমরা হলুম 'সাপ্তাহিক নবযুগ' পত্রিকার প্রতিনিধি। কবিতা খুঁজতে বেরিয়েছি। ভাল কবিতা দেখলেই কিনে ফেলি আমাদের বিখ্যাত পত্রিকার জন্য। তা শুনলুম এখানে নাকি খুব কবিতার চর্চা হচ্ছে।"

রামলাল দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "এ-বাড়িতে কস্মিনকালেও কবিতার চর্চা হয়নি। তবে হবে। কিন্তু সে যে কী জিনিস হবে, তা ঈশ্বর জানেন।"

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "জিনিস আমরা চিনি। শুনুন মশাই, আমাদের নগদ কারবার। কবিতা পছন্দ হলেই আমরা এক-এক কবিতা একশো টাকায় কিনে নেব। একেবারে নগদ টাকা ফেলে।"

"বলেন কী! প্রতি কবিতায় একশো টাকা?"

"তেমন—তেমন কবিতা হলে দু'গুণ টাকা। অর্থাৎ দুশো।"

রামলাল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, "তা হলে আপনারা আমার বাবার সঙ্গে দেখা করুন।"

"আরে, দেখা করতেই তো আসা। চলুন। শুভস্য শীঘ্রম।"

রামলাল বিস্ময়ে ঘনঘন মাথা নাড়তে-নাড়তে দু'জনকে ভুবন রায়ের সামনে এনে হাজির করলেন।

সকালে জলখাবারটি খেয়ে ভুবনবাবু কাগজ-কলম নিয়ে বাগানে টেবিল-চেয়ার পেতে বসেছেন। নিমের ছায়ায় চিকড়ি-মিকড়ি রোদে শীতের সকালে বসে

তিনি কবিতা লেখার জন্য অনেকক্ষণ ধরে কসরত করার পর একটা মাত্র লাইন লিখতে পেরেছেন। কলার কাঁদির মতো কবিতা ঝুলিছে গাছে-গাছে। পোষা বেড়ালের মতো কবিতা ফিরিছে পাছে-পাছে।

প্রথম কবিতাটা কবিতা বিষয়ে লেখা ভাল। কিন্তু কবিতাকে বিষয় করে লেখা যে বেশ শক্ত, তা এখন হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছেন ভুবনবাবু। দামি পার্কার কলমে পেছনটা কামড়ে-কামড়ে প্রায় ক্ষতবিক্ষত করে ফেললেন। মাথার চুলও বার বার টানাটানি করায় কয়েক গাছি ছিঁড়ে গেল। উঠে পায়চারি করে নিলেন বারকয়েক। বিজ্ঞানে নতুন কিছু আবিষ্কার করেই যেমন আর্কিমিডিসির মতো 'ইউরেকা' বলে চেঁচাতে-চেঁচাতে বেরিয়ে আসতেন, কবিতায় তেমনই আদি কবি বাল্মীকির মতো এক লাইন লিখেই তিনি বার কয়েক বলে ফেলেছেন "কিমিদং কিমিদং!"

ভুবনবাবু যখন দ্বিতীয় পঙক্তির সন্ধানে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘাড় ব্যথা করে ফেলেছেন সেই সময়ে রামলাল এসে সামনে দাঁড়িয়ে বিনীত স্বরে ডাকলেন, "বাবা।"

ভুবনবাবু খাড়া হয়ে বসে বললেন, "খাতাটাতা সব এনেছ তো! কালির বোতল! ডিকশনারি! কবিতার বই?"

"আজ্ঞে সেসব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আপনি কবিতা লিখছেন শুনে এই এঁরা সব কলকাতা থেকে এসে পড়েছেন।"

ভুবনবাবু এবার দাড়ি আর চশমাওলা লোক দুটোর দিকে তাকালেন। শশব্যস্তে বলে উঠলেন, "বিদেয় করে দাও, বিদেয় করে দাও। আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত।"

"আজ্ঞে এঁদের বিদেয় করাটা যুক্তিযুক্ত হবে না। এঁরা সাপ্তাহিক নবযুগ পত্রিকার লোক, কবিতা কিনতে বেরিয়েছেন। এক-একটা কবিতা একশো থেকে দু'শো টাকা।"

ভুবনবাবু নড়েচড়ে বসে বললেন, "বটে! তা নেহাত খারাপ ব্যাপার তো নয়। বসতে দাও ওঁদের।"

রামলাল তাড়াতাড়ি চেয়ার-টেবিল আনিয়ে দু'জনকে ভুবনবাবুর মুখোমুখি বসালেন। দাড়ি ও চশমাওলা দু'জন গম্ভীর মুখে বসলেন। তারপর দু'জনের একজন বললেন, "আমরা কবিতার খোঁজে বেরিয়েছি। ভাল কবিতা পেলে মোটা টাকায় কিনে নেব।"

ভুবনবাবু বিগলিত মুখে বললেন, "নবযুগ তো বিখ্যাত কাগজ।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। দেড়-দু'লাখ সার্কুলেশন। একটা কবিতা কোনওক্রমে ছাপতে পারলেই রাতারাতি বিখ্যাত।"

"ও বাবা, তা আমিও কবিতা লিখি বটে, কিন্তু....."

"কিন্তু কী?"

"ইয়ে মানে এখনও ব্যাপারটা ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারিনি আর কি।"

লোকটা খুব মিষ্টি করে বলল, "ওরকম হওয়াই তো স্বাভাবিক। কবিতা কি সোজা জিনিস। অনেক ধৈর্য অনেক অধ্যবসায়ে হয়। তাও প্রতিভা না থাকলে শত চেষ্টাতেও হয় না।"

"আজ্ঞে তা তো বটেই।"

"আপনি কি এক-আধটা কবিতা শোনাতে পারেন আমাদের?"

"বিলক্ষণ! কবিতা শোনাব এ তো আনন্দের কঁথা। তবে আপনারা অনেক দূর থেকে আসছেন, একটু বিশ্রাম-টিশ্রাম করলে হয় না? ধরুন, একটু জলখাবারেও বন্দোবস্ত করা উচিত। তা উঠেছেন কোথায়?"

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "কোথাও উঠিনি। সবে গাড়ি থেকে নেবে ঘুরে-টুরে দেখছি আর কি। হোটেল-টোটেল খুঁজে নিতে হবে।"

ভুবনবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, "ছিঃ ছিঃ, আমি থাকতে হোটেলে উঠবেন, তাই কি হয়? ওরে কে আছিস....."

ভুবনবাবু হাঁকডাকে বাড়িতে একটা হুলুস্থুল পড়ে গেল। এক তলার সবচেয়ে ভাল ঘরখানা ঝাড়পোঁছ করে কাজের লোকেরা ঘরটাকে ঝকঝকে করে তুলতে লেগে গেল। রান্নাঘরে গাওয়া ঘিয়ের লুচি আর আলুর দমের ব্যবস্থা হতে লাগল। গরম চা এসে গেল।

নবযুগের লোক দু'টো বেশ নিশ্চিন্ত মনে চা খেতে-খেতে ঠ্যাঙ নাচাতে লাগল। মুখপাত্র লোকটি চা শেষ করে ভুবনবাবুর দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে উঠল, "আপনার হবে।"

ভুবনবাবু হাসি হাসি মুখ করে বললেন, "কী হবে?"

"কবিতা।"

"বলছেন! সত্যিই বলছেন! কী করে বুঝলেন?"

"এই কম্ম করতে করতে চুল পাকিয়ে ফেললাম। কবিতা না শুনেও বলে দিতে পারি কোন লোকটার ভিতরে কবিতার মালমশলা আছে।"

ভুবনবাবু ভারি তৃপ্ত হয়ে বললেন, "সেটা আমিও টের পাচ্ছি। আমার চারদিকটা যেন কবিতায় একেবারে ঠাসা। কবিতার যেন একেবারে মড়ক.....ইয়ে....না.....মড়ক কথাটা ঠিক জুতসই হল না—"

লোকটা হাত তুলে ভুবনবাবুকে বাড়া দিয়ে বলল, "কিছু ভুল বলেননি। মহামারী থেকেই মড়ক লাগে। আপনি চারদিকে জীবাণুর মতো কবিতার ভিড় দেখতে পাচ্ছেন তো!"

ভুবনবাবু বললেন, "আজ্ঞে, ঠিক তাই।"

"তবে মড়কের আর বাকি কী?"

"তা বটে।"

"দুটো লাইন তো লিখে ফেলেছেন দেখছি। আমি এক ফাঁকে লাইন দুটো পড়েও নিয়েছি।"

ভুবনবাবু সাগ্রহে বললেন, "কেমন হয়েছে বলুন তো!"

লোকটা ভারি আনমনা হয়ে অনেক দূরের দিকে চেয়ে থেকে আপনমনে ভরাট গলায় আবৃত্তি করল, "কলার কাঁদির মতো কবিতা ঝুলিছে গাছে-গাছে। পোষা বেড়ালের মতো কবিতা ফিরিছে পাছে-পাছে। আহা! কী অপূর্ব!"

"বলছেন! সত্যিই অপূর্ব!"

লোকটা গম্ভীরভাবে পকেট থেকে দুটো একশো টাকার নোট বের করে টেবিলের ওপর রেখে বলল, "আগাম।"

"আগাম, বলেন কী!" ভুবনবাবুর যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না।

লোকটা বলল, "নতুন কবিদের রেট একশো টাকা। কিন্তু আপনার এই কবিতাটার মাত্র দু'লাইন দেখেই বুঝতে পেরেছি আপনার ভিতরে কবিতার সমুদ্র রয়েছে। সেই সমুদ্র গর্জন করছে, ফুঁসছে, বিরাট তরঙ্গ তুলে তেড়ে বেরিয়ে এসে সাহিত্যের জগৎকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। আপনি মশাই একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড না করেই ছাড়বেন না।"

ভুবনবাবু আনন্দে লাফিয়ে ওঠবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। বসা অবস্থায় লাফিয়ে ওঠা যায় না তো। কিছুক্ষণ আবেগটাকে দমন করে নিজেকে সামলালেন। তারপর গদগদ স্বরে বললেন, "দুপুরে আজ কী খাবেন বলুন তো?"

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "আমাদের খাওয়া-দাওয়ার বায়নাক্কা নেই। নুনভাত ডালভাত হলেই হল। কালিয়া কোপ্তা খাওয়াতে চান তো তাও সই, আবার পোলাও মাংস খাওয়াতে চান তো তো তাও সই। তবে আমার এই সহকর্মীটির রোজ একটু ক্ষীর চাই। আর আমি নতুন গুড়ের পায়েসটা বেশ পছন্দ করি।"

"হবে। সব হবে। এখন চলুন একটু জলযোগ করে নেবেন।"

দু'জনে উঠল। খাওয়ার ঘরে বসে দু'জনে বেশ তৃপ্তি করে খেয়ে-টেয়ে বলল, "না, কবি হলেও আপনার নজরটা বেশ উঁচু। এমনিতে বেশির ভাগ কবিই হাড়হাভাতে। সেইজন্যই কিছু হয় না। আপনার হবে।"

ভুবনবাবু আনন্দে মাথা নাড়তে-নাড়তে দু'খানা একশো টাকার নোট জয়পতাকার মতো ঊর্ধ্বে তুলে ধরে ভিতর-বাড়িতে গেলেন মান্যগণ্য লোক দুটির আপ্যায়নের জোরদার বন্দোবস্ত করতে। মাত্র দু'লাইন লিখতে-না-লিখতেই দু-দুশো টাকা এসে গেল। তা হলে যখন রাশি-রাশি লিখবেন তখন তো টাকার বৃষ্টি হবে! শুরুতেই

এরকম সাফল্য তো খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে।

ভুতো ক'দিন যাবৎ ভারি চিন্তার মধ্যে আছে। চিন্তা হল তার নিজেকে নিয়েই। তার বয়স নিতান্ত কম হলেও এর মধ্যেই তার বেশ কিছু অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে। সে বুঝতে পারছে না, যা-সব ঘটছে তা সত্যি ঘটনা কি না। পরিরা তাকে একবার একটা অদ্ভুত জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল, আবার সেদিন জনার্দন নিয়ে গেল ভূতের মিটিং-এ। এসবের মানে কী? আর ওই হেলমেটটারই বা রহস্য কী?

দুপুরবেলা আজ বেজায় ভোজের আয়োজন হয়েছে। দুটো দাড়ি-গোঁফওয়ালা লোক এসে বুড়োকর্তার কবিতা কিনে নিচ্ছে, দুশো টাকা আগাম দিয়েছে। তাদের খাতিরে আজ বিয়েবাড়ির ভোজ। লোক দুটোকে খুব সুবিধের ঠেকল না ভুতোর। দাড়ি-গোঁফওয়ালা লোক দেখলেই তার একটু সন্দেহ হয়। তার ওপর এ-লোকদুটোর ভাবগতিকও সন্দেহজনক। কিন্তু কিছু করারও নেই। এরা বুড়োকর্তার পেয়ারের লোক। একটা ভাল ব্যাপার হল, এদের খাতিরে খাওয়াটা আজ হল পেল্লায় রকমের। কিন্তু মনটা উড়ু-উড়ু বলে জিভে তেমন স্বাদ পেল না ভুতো। দাড়ি-গোঁফওয়ালা লোক দুটো অবশ্য সাঙ্ঘাতিক খেল। এত খাওয়া কাউকে কখনও খেতে দেখেনি সে। তবে আঁচানোর সময় দাড়ি-গোঁফওয়ালাদের একজন হঠাৎ 'হাঁ-হাঁ' করে ওঠায় ভুতো দেখল লোকটার গোঁফ একদিকে খুলে ঝুলে পড়েছে। ভুতো গাড়ু থেকে তার হাতে জল ঢেলে দিচ্ছিল। দৃশ্যটা দেখে ভারি অবাক হল সে। তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে গোঁফটা খপ করে ধরে একটানে ছাড়িয়ে আনল সে। দুষ্টুমি করে নয়, সে ঝুলন্ত গোঁফ দেখে এত অবাক হয়েছিল যে, টান মারার লোভ সামলাতে পারেনি।

এই বেয়াদপিতে লোকটা এক হাতে মুখ চাপা দিয়ে অন্য হাতে একটা পেল্লায় থাপ্পড় উঁচিয়ে বলল, "পাজি ছোঁড়া! দে গোঁফ!"

ভুতো আর দাঁড়ায়নি। দাওয়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে ছুটতে শুরু করেছে। পিছনে-পিছনে গোঁফ-হারানো লোকটাও।

'গোঁফ দে! গোঁফ দে! নইলে খুন করে ফেলব বলছি কিন্তু!"

ভুতো গোঁফ মুঠো করে ধরে হরিণের বেগে দৌড়চ্ছে।

ছুটতে-ছুটতে জঙ্গলে ঢুকে পড়তেই কে যেন কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল, "কী হয়েছে বলো তো! অমন ছুটছো কেন?"

গলাটা জনার্দনের। ভুতো দৌড়তে-দৌড়তে বলল, "পিছনে যে লোকটা আসছে ওটা একটা ঠকবাজ। ওকে ধরো।"

"আর ছুটো না। ওই বেলগাছটার নীচে দাঁড়াও। আমাদের ওপর হুকুম আছে,

তোমার দেখাশোনা করার। আমি লোকটাকে টিট করছি।"

গোঁফ নিয়ে পাঁচু মোদকের সমস্যাটা পাঁচজনে বুঝবে না। এইসব ছদ্মবেশ-টদ্মবেশ তার লাইনে নয়। সে সাদামাঠা চুরিটুরি করতেই ভালবাসে। এসব বাবুগিরি কি তার পোষায়? কিন্তু দুলালবাবুর পাল্লায় পড়ে যা নয়, তা-ই করতে হচ্ছে। দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে এই সঙ সাজাবার কী যে দরকার ছিল, তা তার মাথায় ঢুকছে না। তার ওপর এই দাড়ি-গোঁফে গাল-গলা ভারি কুটকুট করে। ছারপোকাও থাকতে পারে ভিতরে। তার চেয়েও বড় বিপদ আঁচানোর সময় জল লেগে আঠা আলগা হওয়ায় গোঁফ খুলে গেছে আর বদ ছোঁড়াটা গোঁফ নিয়ে পালিয়েছে। গোঁফ ছাড়া ও-বাড়িতে আর ঢোকাও যাবে না।

কিন্তু বয়স তো কম হল না। দৌড়ঝাঁপ কি তার পোষায়?

ভুতোকে ধরার আশা যখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছে পাঁচু, তখনই হঠাৎ ঝড়াক করে কে যেন তাকে শূন্যে তুলে নিল।

পাঁচুর এরকম অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। প্রথমটায় সে ভাবল মরে গিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। কিন্তু নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখল, মরেছে বলে মনে হল না, তা ছাড়া নীচে তার দেহটাও সে পড়ে থাকতে দেখল না। তা হলে হচ্ছেটা কী?

কিছুক্ষণ বাতাসে ভেসে থেকে হ্যা-হ্যা করে খানিকক্ষণ হাঁপিয়ে নিল পাঁচু। তারপর চারদিকটা ভাল করে তাকিয়ে দেখল। ওই মিত্তিরদের পোড়ো ভিটে আর ভৌত-ক্লাব দেখা যাচ্ছে। নীচে জঙ্গল। ওপাশে গঞ্জ। দিনের আলোয় সব ফুটফুটে পরিষ্কার।

পাঁচু ঘাড় ঘুরিয়ে একটু দূরে ভুবনবাবুদের দোতলা বাড়িটাও দেখতে পেল। তা হলে এটা নিশ্চিত যে, সে মরেনি। তবে এই অশৈলী কাণ্ডটা হচ্ছে কেন? ভুবনবাবুও কাল রাত্তিরে আকাশে উঠে গিয়েছিলেন। কাণ্ডটা যে কী, তা বুঝতে পারছে না পাঁচু। তবে সে কিছুক্ষণ হাত-পা ছোঁড়াছুড়ি করল। কাজ হল না। আকাশে ভেসে ভেসে খানিকটা দূরে এসেও পড়ল সে। সামনেই একটা মস্ত অশ্বত্থ গাছ।

উড়তে-উড়তে গাছটার কাছ বরাবর আসতেই ঝুপ করে কে যেন পাঁচুকে গাছটার মগডালের ওপর ফেলে দিন। বয়স হলেও পাঁচুর হাত-পা ভারি সচল। তার যা পেশা তাতে শরীরটা ঠিক রাখতেই হয়। তাই পড়েও পাঁচু হাত-পা ছরকুটে পপাত ধরণীতলে হল না। সামনে যা পেল তাই আঁকড়ে ধরে পড়াটা আটকাল।

কিন্তু যেখানে পড়েছে সেটা ভারি উঁচুতে একটা তেকাঠির মতো জায়গা। এখান থেকে নামা ভারি শক্ত। পাঁচু প্রথমটায় নামবার চেষ্টাও করল না। চুপচাপ বসে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিল। তারপর অবস্থাটা দেখল। অবস্থাটা মোটেই ভাল নয়। তার ওপর টানাহ্যাঁচড়ায় তার নকল দাড়িও খসে কোথায় পড়ে গেছে। ভারি দুরবস্থা।

এখন আবার নতুন দাড়ি-গোঁফ না লাগিয়ে ভুবনবাবুর বাড়িতে ফিরেও যাওয়া যাবে না। অথচ আজ রাতে যে বাড়িতে আরও পেল্লায় ভোজ রয়েছে। কিন্তু সে-কথা পরে। খুব সাবধানে পাঁচু গাছ থেকে নামবার চেষ্টা করতে লাগল।

জনার্দন আজ আর দেখাই দিচ্ছে না। আড়াল থেকে বলল, 'তোমার যে পিছু নিয়েছিল সে লোকটাকে চেনো?"

'না, জনার্দনদা। কে বলো তো!"

"সাঙ্ঘাতিক লোক। ভূত ধরার ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল প্রায়। ও হল পাঁচু মোদক!"

"নামটা চেনা-চেনা ঠেকছে।"

"খুব নামডাকওয়ালা লোক। সবাই চেনে। বিখ্যাত চোর।"

"চোর! বলো কী! কর্তাবাবার যে সর্বনাশ করে ছাড়বে! ও-বাড়িতে এর একজন স্যাঙাত আছে।"

"সে আরও সাঙ্ঘাতিক লোক। তার নাম দুলাল সেন।"

"দুলাল সেন! বলো কী! সে তো গুম হয়ে গেছে। ল্যাবরেটরিতে যে সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হল সেদিন তারপর থেকে আর দুলালবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"দুলালবাবু সম্পর্কে আমরা খোঁজখবর নিয়েছি। তোমাদের ওসব ভুতুড়ে কাণ্ডের ফলে দুলালবাবু এখন অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। তাঁর গায়ে এখন ভীষণ জোর, মাথায় নানা দুষ্টুবুদ্ধি।"

"যাঃ, দুলালবাবু তো ভীষণ ভিতু, গায়ে একটুও জোর নেই।"

"সেই দুলালবাবুর কথা ভুলে যাও। এই দুলাল সেন হল কালাপাহাড়।"

"বটে!"

"খুবই বটে!"

নন্দলালবাবু দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরে বসে বিমর্ষ মুখে আকাশ-পাতাল ভাবছিলেন। ভুবনবাবু তাঁকে কবিতা লেখার আদেশ দিয়েছেন। বাবার হুকুম অমান্য করার সাধ্য এ-বাড়ির কারও নেই, কিন্তু কথা হল, কবিতার সঙ্গে নন্দলালবাবুর কোনও সম্পর্কই নেই। ভুত-প্রেত, সাধন-ভাজন, হোমিওপ্যাথি-

কবিরাজি ইত্যাদি হলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু কবিতার লাইনে যে তিনি কিছুই জানেন না। কবিতা লিখতে হবে ভাবলেই তাঁর হাত-পা শরীরের মধ্যে ঢুকে যেতে চাইছে, ম্যালেরিয়ার মতো একটা কাঁপুনিও উঠছে আর মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে কী যেন নেমে যাচ্ছে। কবিতার চেয়ে বিজ্ঞান ঢের ভাল ছিল।

আরও ভয়ের কথা, ভুবনবাবুর কবিতা লিখতে শুরু করার আগেই সেই কবিতা কেনার জন্য কলকাতা থেকে দুই মূর্তিমান এসে হাজির হয়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, দু'লাইন কবিতা শুনে তারা দুশো টাকা আগাম দিয়েছে ভুবনবাবুকে। ফলে ভুবনবাবু রীতিমত খেপে উঠেছেন। খাওয়ার পর নন্দলাল সবে ঘরে এসে বিশ্রাম করার উদ্যোগ করছিলেন, এমন সময় ভুবনবাবু এসে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে পড়লেন।

"কাণ্ডখানা দেখেছ!"

"আজ্ঞে না, বাবা।"

"দু'লাইন লিখতে-না-লিখতে দু-দুশো টাকা!"

"যে আজ্ঞে, এ তো খুব ভাল কথা!"

"ভাল কথা! শুধু ভাল কথা বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকলেই হবে? ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে চাইছে না কেন বলো তো! দু'লাইন লিখেই যদি দুশো টাকা হাতে আসে তা হলে হাজার-হাজার লাইন লিখলে কত আসতে থাকবে তার হিসেবটা মাথায় খেলছে না?"

নন্দলালবাবু মাথা চুলকে বললেন, /আজ্ঞে তা বটে।"

ভুবনবাবু অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে-করতে বললেন, "ধরো, দিনে যদি তুমি এক হাজার লাইনও লিখে ফেলতে পারো তা হলে কত দাঁড়াচ্ছে?"

নন্দলালবাবু সতর্কভাবে একটু কেসে নিয়ে বললেন, "আজ্ঞে, আমি কিন্তু শুনেছিলাম যে, ওঁরা দু'লাইনের জন্য দুশো টাকা হিসেবে দিচ্ছেন না। ওঁরা কবিতা পিছু দুশো টাকা দেবেন। তা সে কবিতা হাজার লাইনেরও হতে পারে।"

ভুবনবাবুও এবার মাথা চুলকোলেন। তারপর বিরস মুখে বললেন, "তাই তো! তা তাই বা মন্দ কী? ধরো, যদি আমরা ছোট-ছোট কবিতাই লিখি, পাঁচ-সাত লাইনের, আর দিনে যদি ওরকম গোটা কুড়ি-পঁচিশ লিখে ফেলা যায় তা হলে কত হচ্ছে?"

"আজ্ঞে, খারাপ নয়। কুড়িটা কবিতায় চার হাজার আর পঁচিশটা হলে পুরো পাঁচ!"

"আর তিনজনে মিলে যদি লিখি, বাড়ির মেয়েরাও যদি কাজকর্মের ফাঁকে-ফাঁকে কয়েকটা করে লিখে ফেলতে পারে, বাচ্চারাও যদি একটু-আধটু শুরু করে দেয় তা হলে তো প্রতিদিনই আমাদের কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা করে রোজগার দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।"

"আজ্ঞে, অত কবিতা ছাপবার জায়গা হবে কি?"

"খুব হবে, খুব হবে। ওঁরা তো কবিতার জন্য মুখিয়ে বসে আছেন। ফেলো কড়ি, মাখো তেল।"

বিপন্ন মুখে নন্দলাল বলে ফেললেন, "কিন্তু আপনার মধ্যে যে প্রতিভা আছে তা কি আর আমাদের মধ্যে পাওয়া যাবে?"

ভুবনবাবু মৃদু হেসে বললেন, "সে অবশ্য ঠিক কথা। উনিও বলছিলেন বটে, আমার মধ্যে নাকি কবিতার সমুদ্র রয়েছে। তা তোমাদের মধ্যে সমুদ্র না থাক, পুকুর-টুকুর তো থাকতে পারে। আর বসে-বসে বাড়ির অন্ন ধ্বংস করার চেয়ে একটা কাজের মতো কাজ করা অনেক ভাল। আজ থেকেই লেগে পড়ো। কাল সকালের মধ্যে অন্তত পাঁচখানা কবিতা আমার হাতে জমা দেবে।"

"পাঁচখানা!" নন্দলালবাবুর চোখ কপালে উঠল।

"আপাতত পাঁচখানা। এর পর মাত্রা বাড়াতে হবে। দিনে কুড়ি-পঁচিশটা করে লিখে ফেলতে হবে। কবিতাই হবে আমাদের ফ্যামিলি বিজনেস।"

নন্দলাল আতঙ্কিত গলায় বললেন, "বিজনেস।"

হাতে হাত ঘষতে-ঘষতে ভুবনবাবু আহ্লাদের গলায় বললেন, "কিছু ভেবো না। কবিতা লেখাটা প্রথমে আমারও শক্ত মনে হয়েছিল। কিন্তু হাত দিয়েই বুঝলুম, একেবারে সোজা কাজ। যা লিখি, তা-ই কবিতা হয়ে যাচ্ছে।"

"আপনার কথা আলাদা।"

"তোমার মধ্যেও যে কালিদাস লুকিয়ে নেই তা কী করে বুঝলে? হয়তো লুকিয়ে আছে। লুকিয়ে থেকে হয়তো টুকি দিয়ে যাচ্ছে। তুমি শুনতে পাচ্ছ না। সেই কালিদাসকে খুঁজে বের করো। তারপর সব ফরসা, জলবত্তরলং।"

"কালিদাস যদি না থাকে?"

"কালিদাস না থাকলে অন্য কেউ আছে। ঘাবড়াচ্ছ কেন? ব্যাটকে আগে খুঁজে বের করো, তারপর সে কে তা বোঝা যাবে।"

"যে আজ্ঞে।" বলে নন্দলাল চুপ করে গেলেন।

ভুবনবাবু চারদিকে চেয়ে ঘরখানা দেখে নাক সিঁটকে বললেন, "এটা ঠিক কবির ঘর বলে মনে হচ্ছে না। বড্ড ন্যাড়া-ন্যাড়া। ফুলদানিতে কিছু ফুল রাখলেও তো পারো। ওতে খানিকটা ভাব আসে। আর একখানা ইজিচেয়ার। একখানা গ্রামোফোন রাখলেও বেশ হয়। গান শুনলেও ভাব আসে। কিছু কবিতার বই বালিশের পাশে নিয়েই শোবে। খাতা-কলম সব সময়ে রেডি রাখবে।"

"যে আজ্ঞে।"

"তা হলে ওই কথাই রইল। আজ থেকেই আদা-জল খেয়ে লেগে যাও। আলসেমিকে প্রশ্রয় দেবে না। টাইম ইজ মানি।"

ভুবনবাবু ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে চলে গেলেন। তাঁর দম ফেলার সময় নেই।

নন্দবাবু অতিশয় বেজার মুখে শুয়ে-শুয়ে নিজের ভাগ্যকে যখন ধিক্কার দিচ্ছিলেন তখন হঠাৎ দরজার বাইরে থেকে ভারি অমায়িক গলায় কে যেন বলে উঠল, "আসতে পারি?"

নন্দবাবু উঠে বসলেন, "আসুন।"

যে লোকটি ঘরে ঢুকল তার মাথাটি ন্যাড়া, মস্ত গোঁফ, গলায় কণ্ঠি, কপালে তিলক। তবে পরনের জামাকাপড় একটু বিপর্যস্ত।

নন্দবাবু বললেন, "কাকে চান?"

"আজ্ঞে, আপনিই তো নন্দবাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনার নাম শুনেই এলাম। বলছিলাম কি, কবিতা লেখা অতি যাচ্ছেতাই কাজ।"

"সে তো বটেই।"

"কবিতা লেখা বেশ শক্তও বটে।"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আপনার তো কবিতা না লিখলেই নয়!"

"আপনি জানলেন কী করে?"

"সবাই বলাবলি করছে কিনা। তবে উপায় একটা আছে।"

নন্দলালবাবু টান হয়ে বসে বললেন, "কী উপায়?"

"আমি কবিতার সাপ্লায়ার।"

"তার মানে?"

"যত কবিতা চাই আমি আপনাকে দেব। ঘাবড়াবেন না।"

"বটে!" নন্দবাবু যেন মরুভূমিতে মরূদ্যান দেখলেন।

"রেটও কম। কবিতা-পিছু একশো টাকা করে। আগাম পেলে বিকেলের মধ্যেই পাঁচখানা কবিতা হাতে পৌঁছে দেব।"

ন্যাড়া মাথা, গোঁফওয়ালা, কণ্ঠি ও তিলকধারী লোকটিকে মোটেই কবি বলে মনে হয় না। অথচ বলছে বিকেলের মধ্যেই পাঁচ-পাঁচখানা কবিতা দিয়ে দেবে। যদি তাই হয় তা হলে এও তো কবিতা লিখেই বড়লোক হয়ে যেতে পারে।

নন্দবাবু একটু সন্দেহের গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কবিতা লেখা যখন আপনার কাছে এতই সহজ কাজ, তখন নিজের নামে ছাপান না কেন? তাতে টাকাও বেশি, নামটাও ছড়ায়।"

লোকটা ভারি লাজুক হাসি হেসে বলল, "কী যে বলেন! আমার নাম শুনলে ওঁরা আর আমার কবিতা ছোঁবেনও না।"

"কেন আপনার নামটা কি খারাপ?"

লোকটা জিভ কেটে বলল, "আজ্ঞে না। বাপ-পিতেমোর দেওয়া নাম, তার আবার খারাপ-ভাল কী? কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন হলেও ক্ষতি নেই। আসলে আমার একটু বদনাম আছে কি না।"

'কী রকম বদনাম?"

একটু মাথা চুলকে নিয়ে লোকটা লাজুক হাসি হেসে বলল, "ঠিক বদনামও বলা যায় না মশাই। আসলে আমি কবিতা লিখলে অন্য সব কবির কবিতা কেউ আর পড়তে চায় না। পাঠকদের গোছা-গোছা চিঠি আসে, যদি এক সংখ্যায় আমি না লিখি। তাই সব কবি এককাট্টা হয়ে যুক্তি করে সম্পাদকদের ধরে পড়ল, ওর কবিতা ছাপা যদি বন্ধ না করেন তবে কুরুক্ষেত্তর হয়ে যাবে। সম্পাদকরা ভয় পেয়ে গেলেন। তারপর থেকেই— বুঝলেন কি না— সম্পাদকরা আর আমার নাম অবধি শুনতে চান না।"

"আপনার নামটা কী?"

"সেটা না-ই বা শুনলেন। পৈতৃক নামটা আমি একরকম ভুলেই গেছি। ব্যবহার করি না কিনা।"

"তবু একটা নাম তো মানুষের দরকার।"

"আজ্ঞে, আমাকে হারাধন বলেই ডাকবেন।"

"বেশ তো। তো হারাধনবাবু, আপনার রেটটা কিন্তু বড্ড বেশি। কবিতা-পিছু একশো টাকা করে দিলে আমার থাকবে কী বলুন!"

লোকটা ফের লাজুক ভঙ্গিতে ঘাড় চুলকে বলল, "দুলালবাবু যে রেট কমালে ভারি রাগ করেন।"

নন্দবাবু অবাক হয়ে বললেন, "দুলালবাবুটা আবার কে?"

লোকটা ভারি অপ্রস্তুত হয়ে জিভ কেটে বলল, "নামটা ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, ওটা ধরবেন না।"

"কিন্তু দুলালবাবু নামটা যে চেনা-চেনা ঠেকছে।"

হারাধন মাথা চুলকোতে-চুলকোতে ভারি কাঁচুমাচু মুখে বলল, "আজ্ঞে ও-নামে মেলা লোক আছে। এই দুলালবাবু হলেন যে দুলাল পালমশাই। কবিতা মহাজন।"

"তার মানে?"

"আজ্ঞে, তাঁর কাছেই কবিতা সব মজুত থাকে কিনা। তিনি হলেন কবিতার একেবারে পাইকার।"

নন্দবাবু যদিও ভারি সরল-সোজা মানুষ, তবু এ-কথাটা তাঁর প্রত্যয় হল না। কেমন যেন একটু ধন্দ লাগল তাঁর, সন্দেহ হতে লাগল। এবং হঠাৎ লোকটার মুখখানাও তাঁর চেনা-চেনা ঠেকতে লাগল। এ হারাধন-টারাধন নয়। অন্য লোক। আর লোক বিশেষ সুবিধেরও নয়।

নন্দলাল একগাল হেসে বললেন, "তাই বলো। দুলাল পালমশাইকে আমিও খুব চিনি। ওই তো কাঠগুদামের পশ্চিমধারে দোতলা বাড়ি, সঙ্গে একটা মস্ত ঘেরা জায়গাও আছে। কতবার তাঁর বাড়িতে গেছি।

লাল হেলমেটটা যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই পড়ে আছে। একটু উঁচু ঢিবির ওপরে। জায়গাটা খুব সুনসান, নির্জন। চারদিকে ভয়ঙ্কর আগাছা দিয়ে ঘেরা। এখানকার বাঘা বিছুটির খুব বদনাম, তার ওপর বাবলার ঝোপঝাড়ও বেশ ঘন। এদিকপানে তাই কেউ আসে না।

ভুতো একটু দূর থেকে একটা গাছের ডালে উঠে হেলমেটটা দেখতে পেল। কিন্তু সেটা উদ্ধার করা যায় কীভাবে তা তার মাথায় এল না। উদ্ধার করার কাজটা বেশ কঠিন মনে হচ্ছে। তার ওর ওটা হচ্ছে ভূতের সর্দারের সিংহাসন। উদ্ধার করতে গেলে কোন্ বিপত্তি ঘটে কে জানে। উদ্ধার না করলেও নয়। পরিদের দেশ থেকে ওইরকমই হুকুম পেয়েছে সে।

যে গাছটায় উঠেছে ভুতো সেটা একটা পুরনো শিশুগাছ। বেশ ঝুপসি। মেলা পাখির বাসা আছে। আর বাবুইয়ের বাসার মতো কীসব যেন ঝুলছেও ডাল থেকে। অথচ ঠিক বাবুইয়ের বাসাও নয়।

ভুতোর মাথার ওপরেই একটা ঝুলে আছে। ভুতো হাত পাড়িয়ে সেটা একটু ছুঁয়ে দেখল। কিছু বুঝতে পারল না। ধরে একটু টানাটানিও করল সে।

আচমকাই জিনিসটা ডাল থেকে খসে পট করে নীচে পড়ে গেল। আর তারপরই ধোঁয়ার মতো একটা বস্তুকে দেখা গেল নীচে। পাক খেয়ে ওপরে উঠে আসছে।

কিছু বোঝবার আগেই মাথায় খটাং করে একটা গাট্টা লাগল। ভুতো "বাবা রে" বলে এক হাতে মাথাটা চেপে ধরল। কিন্তু পর-পর আরও গোটাকয় রাম-গাঁট্টা এসে জমল মাথায়।

গাঁট্টার চোটে হাত ফসকে নীচে পড়ে যাওয়ার জোগাড় হল ভুতোর। সে তাড়াতাড়ি নামবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু গাঁট্টা সমানেই চলছে। কে যে গাঁট্টা মারছে তা দেখা যাচ্ছে না।

গাঁট্টার চোটে অস্থির ভুতো চেঁচিয়ে উঠল, "কে রে তুই, পাজি হতচ্ছাড়া?"

কানের ওপর আর একটা গাঁট্টা এসে পড়ল, সেই সঙ্গে শোনা গেল একটা হেঁড়ে গলা, "আমি কে সেটা জানতে চাস? কেন, টের পাচ্ছিস না?"

ভুতো চেঁচিয়ে বলল, "ওঃ ভুতুড়ে গাঁট্টা মেরে খুব কেরদানি দেখানো হচ্ছে? সাহস থাকলে সামনে আয় না। আমিও গাঁট্টা মারতে জানি।"

কথা শুনে কে যেন খ্যাকখ্যাক করে হেসে উঠল, "বটে! তুইও গাঁট্টা মারবি? জানিস, আমার মতো গাঁট্টার ওস্তাদ ভূ-ভারতে নেই! মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আদর করে আমার কী নাম দিয়েছিল জানিস? গেঁটে বাঁটুল।"

ভুতো বলল, "ওঃ", তুমি তো তা হলে পুরনো ভূত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তো আর আজকের লোক নন।"

"তা তো বটেই। তোর ঠাকুরদার ঠাকুরদার ঠাকুরদারও অনেক বড়। গাঁট্টা মেরে লোককে টিট করতুম বলে মহারাজ আমাকে তাঁর সভায় চাকরি দিয়েছিলেন।"

"বটে?"

'বটেই রে। তবে কিনা লোকে ভারতচন্দ্র আর গোপালভাঁড়ের কথাই জানে,

আমাকে কেউ চেনে না।"

গাঁট্টা থেমেছে। ভুতো মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতেও বলল, "তুমি গোপালভাঁড় আর ভারতচন্দ্রকে দেখেছ?"

"দেখব না মানে? রোজ দু'বেলা দেখা হত। কত গল্প হত, হাসিঠাট্টা হত।"

"তোমার গাঁট্টার বেশ জোর আছে বলতেই হবে। তবে কী জানো বাঁটুলদা, তুমি যে এখানে আছ, তা তো আমি জানতুম না।"

হেঁড়ে গলাটা এবার একটু নরম হল, "খুব লেগেছে নাকি তোর? তা কী করব বল। কয়েকশো বছর ধরে গুটি পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছি। আরও হাজারখানেক বছরের আগে জাগবার ইচ্ছেই ছিল না। কাঁচা ঘুমটা ভাঙালি বলে চট করে মেজাজটা চড়ে গেল।"

"আমি ভেবেছিলুম বাবুইয়ের বাসা।"

বাঁটুল আর একটু নরম হয়ে বলল, "ঠিক আছে, গাঁট্টার যখন প্রশংসা করেছিস, তখন তোর কিছু উপকারও করব। বল, কী করলে তুই খুশি হোস!"

ভুতো হাতে চাঁদ পেল। একটা নিশ্চিন্দির শ্বাস ফেলে বলল, "ওই যে ওখানে একটা লালমতো হেলমেট পড়ে আছে দেখতে পাচ্ছ?"

"খুব পাচ্ছি।"

"ওইটে আমার চাই।"

"এই কথা! দাঁড়া এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল। তারপরই দেখা গেল লাল হেলমেটটা বাতাসে ভাসতে-ভাসতে ভুতোর একেবারে হাতের নাগালে এসে গেছে।

ভুতো ইতিমধ্যেই মাটিতে নেমে দাঁড়িয়েছে। হেলমেটটা আঁকড়ে ধরে বলল, "বাঁটুলদা, বড্ড উপকার করলে আমার।"

বাঁটুল একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "হ্যাঁ রে ছোঁড়া, ওই হেলমেটটা তুই চাইলি কেন বল তো! জিনিসটা তো ভীষণ বিচ্ছিরি। ওটা কেউ মাথায় পরে নিলে যে আমার গাঁট্টাতে কোনও কাজই হবে না। পেল্লায় শক্ত।"

"এসব তোমার আমলে ছিল না কিনা।"

বাঁটুল গম্ভীর হয়ে বলল, "থাকলে খুব খারাপ হত। আমাকে আর গাঁট্টার কারবার করে খেতে হত না।"

"তুমি গাঁট্টা মেরে খেতে?"

"তা খেতুম না? কৃষ্ণচন্দ্রের চাকরিতে ঢোকার আগে তো যত চোর-জোচ্চোর ডাকাতকে গাঁট্টা দিয়ে টিট করেছি। গাঁয়ে খুব খাতির হত তখন। বিনে পয়সায়

কলাটা-মুলোটা জুটত। তা তোদের আমলে কি সবাই ওই টুপি পরে থাকে নাকি?"

"না, না, তোমার ভয় নেই।"

"তোরও ভয় নেই। আমি তোকে আর গাঁট্টা মারব না। ওটা পরে আসার দরকার নেই। যাই, আমি ঘুমোই গে।"

বাঁটুল ঘুমোতে যাওয়ার পর ভুতো হেলমেট বগলে নিয়ে বাড়ির পথ ধরল। মনে হাজার চিন্তা।

বাড়ি এসে হেলমেটটা লুকিয়ে রাখল ঘরে। তারপর চারপাশ উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে এল। দুলালবাবু পেল্লায় ভোজের পর নরম বিছানায় লেপ গায়ে ঘুমোচ্ছেন। তাঁর শাগরেদ পাঁচু মোদককে দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাওয়ার কথাও নয়। গাছের মগডাল থেকে নামতে সময় লাগবে।

ভুতো ঘরের দরজা বন্ধ করে তার কৌটো বের করল।

"শুনতে পাচ্ছ?"

কৌটোর ভেতর দিয়ে বহু দূরের এক জগৎ থেকে পরিদের গলা ভেসে এল।

"কী চাও ভুতো?"

"আমি হেলমেটটা উদ্ধার করেছি।"

"বেশ ভাল কাজ।"

"এটা দিয়ে এখন আমি কী করব?"

"এখন তোমাদের ওখানে কী দুপুর?"

"হ্যাঁ। তবে শেষ দুপুর।"

"তা হলে এখন নয়। রাত যখন গভীর হবে তখন হেলমেটের ভেতরে নীল বোতামটা টিপে দাও। তারপর ওটা পরে নিও মাথায়।"

"তা হলে কী হবে?"

"হেলমেটটা সামান্য জিনিস ভেবো না। ওটা হল অতি-মস্তিষ্ক। তোমার জানা নেই এমন অনেক কিছু তোমাকে জানিয়ে দেবে।"

"ভূতের সর্দার এটাকে সিংহাসন বানিয়েছিল। তারা যদি এসে হেলমেট কেড়ে নিতে চায়?"

"তা হলে হেলমেটের ভেতরকার সাদা বোতামটা টিপে রাখো।"

"তা হলে কী হবে?"

"হেলমেটের রং আর গন্ধ বদলে যাবে। ভূতেরা দেখলেও চিনতে পারবে না।"

"আমাদের বাড়িতে দুটো লোক খারাপ মতলব নিয়ে ঢুকেছে। তাদের কী করব?"

"হেলমেটই তোমাকে বুদ্ধি জোগাবে। তবে ওটা বেশি ব্যবহার করো না।"

"কেন?"

“সুপার ব্রেন যত বেশি ব্যবহার করবে, তত তোমার নিজের মস্তিষ্ক নিস্তেজ হয়ে যাবে।”

“ও বাবা।”

“একবার-দু’বার ব্যবহার করলে ক্ষতি নেই। কিন্তু বেশি। নয়। মানুষেরা কত বেশি যন্ত্র ব্যবহার করে।”

“একবার-দু’বার ব্যবহারের পর কী করব এটা নিয়ে?”

“যেখান থেকে এনেছ আবার সেখানে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। ওটা ভূতের সিংহাসন হয়েই থাকুক।”

“এটা কে পৃথিবীতে ফেলে গেল?”

“সেটা জেনে তোমার লাভ নেই। যে ফেলে গেছে, তার কোনও উদ্দেশ্য আছে। এরকম অনেক জিনিসই পৃথিবীতে তারা ফেলে রেখেছে নানা জায়গায়।”

“ওগুলো দিয়ে কী হবে?”

“ওগুলো যদি কেউ কাজে লাগাতে পারে তো তার অনেক কাজ হবে। যে কাজে লাগাতে পারবে না তার হবে না। ওটাই তো মজা। তোমাদের নন্দবাবুও তো এই হেলমেটটা পেয়েছিলেন। কাজে লাগাতে পারেননি। ভূতের ভয়ে এটা ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলেন।”

“তাই নাকি? কিন্তু এরকম আর কী-কী জিনিস কোথায় আছে?”

“বলে লাভ নেই। ধরো, আমেরিকার এক জঙ্গলে একটা গর্তের মধ্যে আছে একটা বল। হিমালয়ে আছে একটা পেনসিল। প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় আছে একটা বোতল। চিনে এক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পোঁতা আছে একটা প্রদীপ। আরও কত কী?”

“এসব দিয়ে কী কাজ হয়?”

“বলটা আসলে শব্দধারক যন্ত্র। মহাকাশে যেখানে যতরকম শব্দ হচ্ছে সব ধরতে পারে। পেনসিলটা আসলে একটা অফুরন্ত ব্যাটারি। নিউ ইয়র্কের মতো বড় একটা শহরকে চিরকাল বিদ্যুৎ জোগাতে পারে। বোতলটা হল মহাকাশ-ঢিল। ওটা তুমি ইচ্ছে করলে সৌরলোকের যে-কোনও গ্রহে পাঠাতে পারো। ওটা সেখানে গিয়ে আবার তোমার কাছে ফিরে আসবে মাত্র কয়েক মিনিটে। প্রদীপটার কথা তুমি গল্পে পড়েছ। ওটা ঘষলেই চলে আসবে একটা মস্ত রোবট— তোমার সব হুকুম তামিল করবে।”

একটু থেমে ভুতো বলল, “আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ?”

“ঠিক তাই।”

“ইস্। প্রদীপটা যদি পেতুম।”

“পেয়ে লাভ নেই। যারা পেয়েছে তাদের জীবনের আনন্দই নষ্ট হয়ে গেছে।

এইসব দেখে আমরা মজা পাই। সেইজন্যই তোমাকে সুপার ব্রেন বেশি ব্যবহার করতে বারণ করছি। ওটা বেশি ব্যবহার করলে তুমি আর নিজের মাথা খাটাতে চাইবে না। সেটা কিন্তু ভীষণ খারাপ। তোমর নিজের মস্তিষ্কও যে প্রচণ্ড শক্তিশালী, সেটা তুমি বুঝতেও পারবে না কোনওদিন।"

"এবার বুঝেছি।"

"যদি বুঝে থাকো তা হলে আমাদের কথা মেনে চলো। তোমাকে আমরা খুব ভালবাসি।"

"দুলালবাবু আর পাঁচু মোদকের কাণ্ডকারখানার কথা কি আপনি জানেন?"

"না তো! তারা কারা?"

"একজন মাস্টারমশাই, আর একজন চোর?"

"তারা কী করেছে?"

"অনেক কাণ্ড। মাস্টারমশাই ভারি ভাল ভানুষ, নিরীহ, রোগা। কিন্তু হঠাৎ রাতারাতি তিনি একদম পালটে গেছেন। গায়ে ভীষণ জোর, চুরি করে বেড়াচ্ছেন। লোককে ঠকাচ্ছেন..."

"ওটা কেমিক্যাল রি-অ্যাকশন। হেলমেট ওর সমাধান বলে দেবে।"

"আচ্ছা।"

কৌটোর স্বর বিদায় নিল।

ভুতো হেলমেটটা তুলে নিয়ে ভেতরটা দেখল। সত্যিই ভেতরে অনেক রকমের বোতাম রয়েছে। সাদা বোতামটা টিপতেই ঝাঁ করে হেলমেটটা একদম নীল হয়ে গেল। এরকম অদ্ভুত কাণ্ড সে আর দ্যাখেনি।

সারাটা দুপুর কাগজ-কলম নিয়ে বিস্তর ধস্তাধস্তির পর ভুবনবাবু দেড়খানা কবিতা মাত্র নামাতে পারলেন। আর তাতেই তাঁর এই শীতের দুপুরেও ঘাম হতে লাগল। মাথাটাও বেশ বনবন করে ঘুরছে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে খানিক ধাতস্থ হয়ে রামলালকে ডেকে পাঠালেন।

রামলাল এলে বললেন, "ওহে রামলাল, তোমার প্রেডাকশন কেমন হচ্ছে?"

রামলাল মাথা চুলকোতে লাগলেন। ভুবনবাবুকে যথেষ্টই ভয় খান রামলাল। কিন্তু সেই ভয়ের চোটেও তাঁর মাথা থেকে কবিতা বেরোচ্ছে না, আমতা-আমতা করে বললেন, "আজ্ঞে, এখনও তেমন জুত করে উঠতে পারিনি। তবে চেষ্টা করছি।"

ভুবনবাবু একটু বিরস মুখে বললেন, "প্রথমটায় হয়তো একটু অসুবিধে হবে। তা সেটা ইয়ে, আমারও হচ্ছে। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে তো হবে না। লোকটাকে

আমি সাতদিন আমাদের বাড়িতে থাকতে বলেছি।"

রামলাল চোখ বড় করে আতঙ্কের গলায় বললেন, "সাতদিন!"

ভুবনবাবু বললেন "থাকতে কি চায়! কেবল বলে, মশাই, আমরা কবি খুঁজতে বেরিয়েছি, সঙ্গে মেলা টাকা। এক জায়গায় থাকার হুকুম নেই। আমি অতি কষ্টে রাজি করিয়েছি। এই সাতদিনে যদি শতখানেক কবিতাও ওঁর হাতে তুলে দেওয়া যায়, তা হলে খুব কম হবে না। দু'শো টাকা দরে প্রায় বিশ হাজার টাকা।"

"তা বটে।"

"কিন্তু প্রেডাকশনটা তো বাড়াতে হচ্ছে। এই রেটে চললে সাতদিনে একশো কবিতা সাপ্লাই দেওয়া যাবে না। তোমার মাথায় কবিতা খেলছে না কেন বলো তো?"

"আজ্ঞে, মাথাটা কোনও দিকেই ভাল খেলে না।"

ভুবনবাবু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "আত্মবিশ্বাসের অভাবই অনেক মানুষের পতনের কারণ। নিজের ওপর আস্থা চাই। নইলে ভারি মুশকিল। লোকটার কাছে আমার মান-ইজ্জত থাকবে না। যাও, আর সময় নষ্ট না করে বসে পড়োগে। আর হ্যাঁ, একটা কথা।"

"যে আজ্ঞে, বলুন।"

"কলমের সঙ্গে কী মেশানো যায় বলো তো।"

"কলম? আজ্ঞে, এ তো সোজা মলম।"

"মলম! কিন্তু মলম আসছে কোত্থেকে? বাণী বিদ্যাদায়িনীর পদস্পর্শে পবিত্র কলম, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে জাগিয়েছে ... না হে, মলম এখানে লাগানোই যাবে না। আর কিছু মনে আসছে না?"

রামলাল সবেগে মাথা চুলকোতে লাগলেন, "কলম! কলম! ইয়ে, খড়মটা অনেক কাছাকাছি আসছে।"

"খড়ম! খড়মই বা লাগাই কী করে? অন্য কিছু ভাবো তো!"

"খড়ম যদি সুবিধের না হয়, তা হলে বড্ড মুশকিল হবে।"

"মুশকিল মনে করলেই মুশকিল। আত্মবিশ্বাসের অভাবটাকে অত প্রশ্রয় দাও কেন? সব-সময়ে বুক চিতিয়ে ভাববে, সব হবে। যাও, বাংলা ডিকশনারিটা খুলে কলমের সঙ্গে একটা জুতসই মেলানো শব্দ বের করো। কবিতাটা ওই একটা শব্দে আটকে আছে। আমি যাই, দেখি গে, ভদ্রলোকদের চা-টায়ের বন্দোবস্ত হয়েছে কি না। মানী লোক এঁরা, অযত্ন হওয়াটা ঠিক হবে না।"

"যে আজ্ঞে" বলে রামলাল ব্যাজার মুখে অভিধান খুলে বসলেন।

ভুবনবাবু ঘর থেকে বেরোতেই একটা ন্যাড়া মাথা গোঁফওয়ালা লোককে দেখে অবাক হলেন। লোকটা বিগলিত মুখে দাঁড়িয়ে।

"কী চাই?"

"প্রতি মিল দু'টাকা করে যদি দেন তো কলম-টলম সব মিলিয়ে দেব। ও-নিয়ে আর ভাবতে হবে না।"

"আপনি কে?"

"আজ্ঞে, আমি এ-কারবারই করি। মিল বেচি, ছন্দ বেচি, কবিতাও বেচি। তবে গোটা কবিতার দাম কিছু বেশি পড়বে। চতুর্দশপদী, হাইকু, দীর্ঘ কবিতা, ছড়া কাহিনী কাব্য, মহাকাব্য— সব আছে। ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল।"

ভুবনবাবু বুকটা একটু চিতিয়ে বললেন, "এ যে মায়ের কাছে মাসির গল্প হয়ে যাচ্ছে মশাই। আমাকে আর কবিতা শেখাতে হবে না। আমার মধ্যে কবিতার সমুদ্র রয়েছে। তবে ইয়ে, ওই মাঝে-মাঝে মিলটিল নিয়ে একটু ভাবতে হয় আর কি। তা মিল কত করে বললেন?"

দু'টাকা। খুবই শস্তা। জলের দর। বছরের এই সময়টায়, অর্থাৎ বসন্তকালে আমরা একটা সেল দিই তো। নইলে তিন টাকার একটি পয়সা কম হত না।"

"বটে! তা কলমের সঙ্গে কী মেলানো যায় বলুন তো?"

"ও-নিয়ে ভাববেন না। আমরা হিমালয়ের সঙ্গে মেলাচ্ছি, তুচ্ছ কলম আর এমন কী! টাকাটা ফেলুন আগে।"

ভুবনবাবু বিরক্ত মুখে দু'টো টাকা লোকটার হাতে দিয়ে বললেন, "এবার বলুন।"

লোকটা ভারি বিগলিত হয়ে বলল, "বছরের চুক্তি করে নিলে কিন্তু আরও শস্তা হয়ে যাবে। এই ধরুন দেড়-টাকার মতো। আর মিলও পাবেন জব্বর।"

ভুবনবাবু হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "কিন্তু কলমের সঙ্গে মেলানো শব্দটার কী হলো?"

লোকটা বিগলিত মুখেই বলল, "আজ্ঞে, বলম বলম বাহু বলম।"

"তার মানে?"

"কলমের সঙ্গে মেলালেই বুঝবেন কী জিনিস। কবিতার লাইনে ফেলে দেখুন।"

ভুবনবাবু আপনমনে কিছুক্ষণ বাহু বলম, বাহু বলম, করলেন। তারপর লোকটাকে একেবারে জাপটে ধরে 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে বলে উঠলেন, "তাই তো হে, তোমার তো দারুণ মাথা! মিলে গেছে, একেবারে মিলে গেছে।"

লোকটা ভুবনবাবুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "আমাদের সাবেক কারবার, আজেবাজে জিনিস দিই না কিনা। তা বাবু, শুনতে পাচ্ছি, এখানে নাকি কবিতা

কেনার লোক ঘুরঘুর করছে! সত্যি, নাকি?"

ভুবনবাবু লোকটার দিকে সন্দিহান চোখে চেয়ে বললেন, "সে খবরে তোমার কী দরকার?"

"আজ্ঞে, আমার প্রায় চার বস্তা কবিতা পড়ে আছে। বাজারটা মন্দা ছিল বলে এতদিন ছাড়িনি। তা ভাল দর পেলে ভাবছি ছেড়ে দেব।"

ভুবনবাবু লোকটার কাঁধে হাত রেখে ভারি নরম গলায় বললেন, "আহা, কবিতা কেনার জন্য তো আমিই আছি। একটু সুবিধে করে যদি দাও তো ওই চার বস্তাই কিনে নেব'খন।"

লোকটা ভারি খুশি হয়ে বলল, "আজ্ঞে, আমারও খুচরো বিক্রি পোষাবে না। চার বস্তা নিলে ওই পাইকারি দরেই পাবেন। কিছু আগাম পেলে একেবারে ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে এনে ফেলব।"

"হবে'খন। তোমাকে বাপু আর কবিতার দালাল খুঁজতে হবে না। কাল সকালের দিকে চলে এসো।"

"আজ্ঞে আগামটা?"

"এই পঞ্চাশটা টাকা রাখো। বাকিটা একেবারে নগদা-নগদি।"

"দরটা জানলেন না? গোনা-বাছা না করলে পাঁচশো টাকা প্রতি বস্তা। আর যদি গোনা-বাছা করেন তা হলে কিন্তু দর ছ'শো হয়ে যাবে।"

"ওরে বাবা, গোনা-বাছার কথাই ওঠে না। তুমি কি আর আমাকে ঠকাবে? আমি মানুষকে বিশ্বাস করতে ভালবাসি।"

লোকটা পায়ের ধুলো নিয়ে বিদেয় হল।

ভুবনবাবু হাসি-হাসি মুখে গিয়ে কবিতার পাইকারের ঘরে উঁকি দিলেন, "উঠেছেন নাকি আজ্ঞে?"

লোকটা একটা হাই তুলে পাশ ফিরে বলল, "উঠেছি। তবে যা খাইয়েছেন তাতে আরও ঘুমনো যেত।"

"এবার একটু যদি চা ইচ্ছে করেন।"

"চা! আমার আবার খালি পেটে চা চলে না।"

"খালি পেটে! বলেন কী? খালি পেটে চা-খাওয়ানোও যে পাপ! এক্ষুনি ব্যবস্থা হচ্ছে। তা লুচি-টুচি চলবে তো! নাকি কড়াইশুঁটির কচুরি? সঙ্গে খানকয়েক চপ-টপ যদি হয়? আর ধরুন একটু ভাল রাবড়িও আনানো আছে।"

"তা চলতে পারে। কিন্তু কবিতার কতদূর কী করলেন বলুন তো? কবিতার জন্যই তো আসা। খাওয়াটা তো বড় কথা নয়।"

"যে আজ্ঞে। কবিতার কথাই বলছি। আগে খাবারের কথাটা বলে দিয়ে আসি? বাড়ির মেয়েরা ময়দা মেখে বসে আছে।"

"যান যান, ওসব সেরে চট করে চলে আসুন।"

ভুবনবাবু শাঁ করে বেরিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ বাদেই ধাঁ করে ফিরে এলেন। বললেন, "হ্যাঁ, কবিতারও বেশ এগোচ্ছে। মনে হচ্ছে কাল সকালের মধ্যে হাজারখানেক কবিতা আপনার হাতে তুলে দিতে পারব।"

লোকটা অবিশ্বাসের চোখে বলল, "বলেন কী মশাই! একদিনে এক হাজার?"

"তার বেশিও হতে পারে।"

লোকটা মৃদু-মৃদু মাথা নেড়ে বলল, "আপনাকে পুরুষই বলতে হয়। রবীন্দ্রনাথও পারতেন না এরকম। তা সে যাই হোক। কবিতা ফেললেই একেবারে নগদ টাকায় কিনে নিয়ে যাব। ভাববেন না।"

ভুবনবাবু হাত কচলাতে-কচলাতে বললেন, "যে আজ্ঞে।"

লোকটা আর-একটা হাই তুলে বলল, "আপনাদের এ-জায়গার বাতাসে কবিতার জীবাণু আছে মশাই। মনে হয় এখানে খুঁজলে আরও কবি বেরোবে।"

ভুবনবাবু বিবর্ণ মুখে বললেন, "আজ্ঞে না, এখানে কবি বলতে তো শুধু আমি আর আমার ছেলেরা। আর তো কেউ..."

লোকটা ঘন-ঘন মাথা নেড়ে বলল, "উহুঁ উহুঁ। মানতে পারছি না মশাই। একটু আগে আমার শিয়রের জানালায় একটা লোক এসে দাঁড়াল। তার মাথাটা ন্যাড়া, বেশ জমপেশ গোঁফ আছে। বলব কী মশাই, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গোটা চারেক কবিতা আউড়ে গেল। দিব্যি কবিতা। যেমন ছন্দ, তেমনি মিল।"

ভুবনবাবু প্রায় ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললেন, "ওঃ, ও তো আমারই লোক কি না।"

"তার মানে?"

"আজ্ঞে, ও আমার সব কবিতা মুখস্থ করে পাঁচজনকে শুনিয়ে বেড়ায়।"

"বটে! তাই বলুন। আমি তো কবিতা শুনে ভারি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। কিনব বলে তাড়াতাড়ি উঠে মানিব্যাগ খুঁজছিলাম, সেই ফাঁকে কোথায় কেটে পড়ল।"

"আজ্ঞে, ওসব নিয়ে ভাববেন না। কাল সকালে ওসব কবিতা আমি আপনার হাতে পৌঁছে দেব।"

"তা হলে তো চমৎকার। হাজারখানেক পেলে আমাদের পত্রিকার মালিকও খুশি হবেন, আর আমাকেও বেশি ছোটাছুটি করতে হবে না। বাঁচালেন মশাই।"

ভুবনবাবু চারদিকে চেয়ে বললেন, "আপনার সঙ্গীটিকে তো দেখছি না।"

"ও একটু পাগলা লোক। কোথাও গেছে-টেছে। এসে পড়বে।"

"কিন্তু ওঁর খাবারদাবার।"

"নিয়ে আসুন । এলে খাবে, নইলে আমিই ওর ভাগেরটা খেয়ে নেব।"

"যে আজ্ঞে।"

ভুবনবাবু ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বেরোলেন। বেরিয়েই দেখলেন, ন্যাড়ামাথা লোকটা বারান্দায় এক কোণে ঘাপটি মেরে বসে আছে।

ভুবনবাবু সোজা গিয়ে লোকটাকে ঘ্যাঁচ করে ধরলেন, "আজ এক্ষুনি গিয়ে চার বস্তা কবিতা নিয়ে এসো।"

"আজ্ঞে মশাই, তার হ্যাপা আছে।"

"কত টাকা চাই?"

"দু'হাজার পেলে চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

"দিচ্ছি।" বলে ভুবনবাবু মহাব্যস্ত, তখন অন্যদিকে ল্যাবরেটরির ঘরে তিনজন গভীর পরামর্শে মগ্ন। তিনজন হল ভুতো, রামলাল আর নন্দলাল।

ভুতো পুরো কাহিনীটা বলে একটু দম নিচ্ছিল।

রামলাল ভাবিত মুখে বললেন, "তা হলে এই হল ব্যাপার।"

নন্দলালের মুখও ব্যাজার। তিনি বললেন, "সবই তো বুঝতে পারছি। কিন্তু বাবাকে ঠেকানোই সে সমস্যা। ওঁর মাথায় একবার যেটা ঢুকবে সেটাকে তো আর বের করা যাবে না।"

রামলাল একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "দুলালবাবু এই রূপান্তর তা হলে একটা সায়েন্টিফিক অ্যাকসিডেন্ট? কিন্তু ভুতো, তোর ভূতের গল্প আমার তেমন বিশ্বাস হচ্ছে না। তোর পরির গল্পও না।"

ভুতো খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, "বিশ্বাস না করতে চাইলে আর কী করব বলো। তবে কর্তাবাবু যে আকাশে উঠে গেলেন, সেটা কী করে হল তা বলবে তো!"

নন্দবাবু ভূত-ভক্ত লোক। দাদার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, "তুমি দু'পাতা বিজ্ঞান পড়ে ধরাকে সরা বলে ভাবছ কেন? আর বিজ্ঞান পড়ে তোমার ক'টা ডানাই বা গজাল? বাবা তো বিজ্ঞান-টিজ্ঞান বিশেষ জানেন না, কিন্তু তোমাকে টেক্কা দিয়ে রোজ নানারকম আবিষ্কার করে ফেলতেন কী করে বলো। ভুতুড়ে কাণ্ড নয়?"

রামলাল মাথা চুলকোলেন। তারপর বললেন, "সব ব্যাপার এখনও ঠিকমতো ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু খুঁজলে ব্যাখ্যা পাওয়া যাবেই। তবে বাবার

আবিষ্কারের কথা যা বলছিস, তা কিন্তু ঠিক নয়। বাবা এ-যাবৎ কিছুই আবিষ্কার করেননি। তবে তাঁর সঙ্গে তো তর্ক করা যায় না, আমি ভয়ে-ভয়ে সব মেনে নিয়েছি। সে যাকগে, এখন কী করা যায় সেটাও হল চিন্তার বিষয়।''

ভুতো তার হেলমেটটা টেবিলের তলা থেকে এনে বলল, ''তোমাদের কিছুই করতে হবে না। দু'জনে যেমন বসে আছো, তেমনই চুপটি করে বসে থাকো। যা করার আমি করছি।''

রামলাল আর নন্দলাল সভয়ে চেয়ে দেখলেন, ভুতো হেলমেটটার মধ্যে কী একটু কারিকুরি করে সেটা মাথায় পরে নিল, ধীরে-ধীরে ভুতোর মুখশ্রী পালটে যেতে লাগল। গম্ভীর মুখ, ধ্যানমগ্ন চোখ। ফিসফিস করে মাঝে-মাঝে অদ্ভুত সব ফরমুলা আউড়ে যাচ্ছে।

ভাগ্য ভাল যে, ভুবনবাবুর আদেশমতো ল্যাবরেটরির জিনিসপত্র এখনও সব সরিয়ে ফেলা হয়নি। দু-একদিনে তা সম্ভবও নয়।

ভুতো নানারকম কেমিক্যাল মেশাতে লাগল টেস্টটিউবে। তারপর বার্নার জ্বেলে তা গরম করতে লাগল। একটা কটু গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারদিকে।

খানিকক্ষণ বাদে ভুতো নন্দলালের দিকে চেয়ে বলল, ''দুলালবাবুকে একবার এই ঘরে আনতে হবে। এক্ষুনি। আর তোমরা ল্যাবরেটরির বাইরে থাকবে।''

নন্দলাল আর রামলাল দু'জনেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

কিন্তু মুশকিল হল, দুলালবাবুর মতো ষণ্ডা-গুণ্ডা লোককে ইচ্ছের বিরুদ্ধে ধরে ল্যাবরেটরিতে আনা যায় কীভাবে? ভুবনবাবুও হয়তো ব্যাপারটা পছন্দ করবেন না।

দুই ভাই তাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন।

এদিকে দুলালবাবু খালি পেটে চা খাবেন না বলে কচুরি, আলুর দম এবং আনুষঙ্গিক বিশাল ভোজ নিয়ে বসে গেছেন। সামনে বিগলিত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন ভুবনবাবু।

দুই ভাই কাঁচুমাচু ঘরে ঢুকতেই ভুবনবাবু একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, ''কী চাই?''

নন্দলাল মাথা চুলকে হঠাৎ বলে ফেললেন, ''বাড়িতে পুলিশ এসেছে।''

''পুলিশ!''

''যে আজ্ঞে। তারা ওঁকে খুঁজছে।''

ভুবনবাবু যেমন হাঁ, দুলালবাবুও তেমনই হাঁ।

ভুবনবাবু বললেন, ''ওঁকে খুঁজবে কেন? উনি কী করেছেন?''

নন্দবাবুর সঙ্গে এবার রামলালও যোগ দিয়ে বললেন, "ওদের মতলব বিশেষ ভাল ঠেকছে না। বলছে, সাপ্তাহিক নবযুগ থেকে যে-লোকটা কবিতা কিনতে এসেছে, সে একজন ক্রিমিনাল।"

ভুবনবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, "আর তোমরা সে-কথা বিশ্বাস করলে?"

দু'ভাই একসঙ্গেই মাথা নাড়লেন। রামলাল বললেন, "আমরা পুলিশের কথায় মোটেই বিশ্বাস করিনি। বরং বলেছি, উনি এ-বাড়িতে নেই। তবে আমাদের কথায় তারা কান দিচ্ছে না। বাড়িতে ঢুকে নিজেরা দেখতে চাইছে।"

"চলো, আমি গিয়েই দেখছি।" বলে ভুবনবাবু আস্তিন গোটাতে লাগলেন। তবে তাঁর গায়ে ফুলহাতা জামা নেই, একটা ফতুয়া রয়েছে। তাই আস্তিন না পেয়ে তিনি কাল্পনিক আস্তিনই গোটালেন।

রামলাল আর নন্দলাল সমস্বরে বলে উঠলেন, "আমরা থাকতে আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন?"

"তোমরা কী করতে চাও?"

রামলাল সবিনয়ে বললেন, "উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। পুলিশ বাড়িটাই শুধু খুঁজবে। ল্যাবরেটরিটা একটু তফাতে, ওটাতে যাবে না। সুতরাং আধঘণ্টার মতো ল্যাবরেটরিতে গা-ঢাকা দিয়ে থাকলে কোনও চিন্তা নেই।"

"ল্যাবরেটরিতে যে যাবে না তা কী করে বুঝলে?"

রামলাল কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "ওরা নিজের মুখেই বলল কিনা। শুধু ঘরগুলো দেখে যাবে। তাছাড়া ইদানীং ল্যাবেরেটরিতে নানা ভুতুড়ে কাণ্ড হওয়ায় ওটাকে সবাই ভয় খায়।"

দুলালবাবু নিবিষ্ট মনে খেতে-খেতে কথাগুলো শুনছিলেন। তত পাত্তা দিচ্ছিলেন না। খাবার শেষ করে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বললেন, "অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন ভুবনবাবু? পুলিশ-টুলিশ আমার কিছু করতে পারবে না। এই তো সেদিন বাজারে মধ্যে সোনার দোকান লুঠ করতে ঢুকেছিলুম। পাঁচুর আহাম্মকিতে কাজ প্রায় কেঁচে গিয়েছিল আর কি। তারপর দারোগা এসে হাজির। এমন প্যাঁচ কষলুম যে, দারোগাবাবাজি চিতপটাং! হেঃ হেঃ, ওসব আমার কাছে নস্যি।"

ভুবনবাবু চোখ গোল থেকে গোলতর হয়ে উঠছিল। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। অস্ফুট গলায় বললেন, "বলেন কী!"

দুলালবাবু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "এ আর এমন কী আরও যেসব কাণ্ড করেছি তা শুনলে মূর্ছা যাবেন। তবে যা-ই বলুন, এস চুরি-জোচ্চুরির লাইনটা

ভারি ইন্টারেস্টিং। আর লোকজনও ভারি বোকা।''

রামলাল আর নন্দলাল পরস্পরের দিকে চেয়ে নিলেন। তারপর রামলাল গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, ''তা হলে যে একবার উঠতে হচ্ছে দুলালবাবু।''

দুলালবাবু চা শেষ করে উঠে বললেন, ''ভুবনবাবু, আমি সারা শহর ঘুরে দেখলুম, আপনার মাথাতেই বুদ্ধিটা সবচেয়ে কম।''

''অ্যাঁ! বলেন কী?''

''আজ্ঞে, ঠিকই বলছি। আচ্ছা, গুডবাই। ভয় নেই। পুলিশ আমাকে ধরতে পারবে না।

এই বলে দুলালবাবু ঘর থেকে বেরোতে যেতেই নন্দলাল আর রামলাল দু'দিক থেকে তাঁর দু'পায়ে ল্যাং মারলেন। ভুবনবাবু ঘরের কোণ থেকে তাঁর লাঠিটা নিয়ে এসে দমাস করে এক ঘা কষিয়ে দিলেন দুলালবাবুর পিঠে।

দুলালবাবু যে তাতে বিশেষ কাহিল হয়েছেন তা মনে হল না। পড়ে গিয়ে এবং লাঠির ঘা খেয়েও টপ করে উঠে দাঁড়িয়ে তিন রদ্দায় তিনজনকে ছিটকে দিয়ে ঘরের বাইরে এসে পড়লেন। মুখে দিব্যি হাসি-হাসি ভাব।

দুলালবাবুকে বেরোতে দেখেই পাঁচু টপ করে উঠে পড়ল। কাণ্ডখানা সেও আড়াল থেকে দেখেছে। এ-বাড়িতে তাদের আর জারিজুরি খাটবে না। তারা ধরা পড়ে গেছে। তবে দুলালবাবুর যা এলেম দেখছে পাঁচু, এ-বাড়ি হাতছাড়া

হলেও ক্ষতি নেই। কত বাড়ি শহরে, আছে আরও কত আহাম্মক।

পথে এসে সে দুলালবাবুর সঙ্গ ধরে ফেলে একগাল হেসে বলল, "আগেই বলেছি কিনা আপনাকে কোনও ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নেই। কবিতা নিয়ে আপনি কী কাণ্ডই না করলেন। গেল দাঁওটা ফসকে।"

দুলালবাবু মাথাটা একটু চুলকে নিয়ে বললেন, "একেবারে যে বুঝি না তা নয় হে, তবে কিনা আমি এ-লাইনে নতুন তো, সবে দাঁত উঠেছে, এখন যা দেখি তাই কামড়াতে ইচ্ছে যায়। তবে ভুবনবাবু লোকটা একেবারেই আহাম্মক। অথচ এ-লোকটাকে সবাই ভারি খাতির করে, ভয়ও খায়। কেন বলো তো!"

"তা জানি না। আমি আবার সবাইকেই ভয় খাই কিনা, আলাদা করে কারও কথা বলতে পারব না।"

"তা এখন কী করা যায় বলো তো পাঁচু। বসে-বসে সময় কাটানো তো আমার ধাত নয়। আমার কাজ চাই, যে কাজে বিপদ আছে, অ্যাডভেঞ্চার আছে, নতুনত্ব আছে।"

পাঁচু দুলালবাবুর কাঁধে হাত রেখে বলল, "সে কথাই তো ভাবছি, চলুন ডেরায় ফিরে দু'জনে মিলে একটু ভেবেচিন্তে শলাপরামর্শ করে ঠিক করি। হুটহাট নানা কাণ্ড বাধিয়ে কাজ পণ্ড হচ্ছে।"

দুলালবাবু একটু গুম মেরে গেলেন। দু'জনে বাকি পথটা আর বিশেষ কথাবার্তা হল না। ভৌত-ক্লাবের পাশ কাটিয়ে তাঁরা যখন পোড়াবাড়িটার ভিতরে ঢুকলেন, তখন সন্ধে হয়ে আসছে। চারদিকে কুয়াশায় মাখা ভুতুড়ে একটা আলো। যে-কোনও মানুষের গা ছমছম করবে। তবে দুলালবাবু বা পাঁচুর সে-বালাই নেই।

ঘরে ঢুকে পাঁচু তার লণ্ঠন জ্বালল। বলল, "সন্ধেবেলাটা কাজ কারবারে পক্ষে বেজায় খারাপ। এই সময়টায় একটু জিরিয়ে নিন। রাত নিশুত হলে বেরনো যাবে।"

এই বলে পাঁচু তার বিছানায় শুয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

দুলালবাবুর অবশ্য ঘুম এল না। তিনি সহজে ক্লান্ত হন না। তার ওপর শরীরটা যেন কিছু করার জন্য সর্বদাই টগবগ করছে।

দরজায় ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল। তা ওরকম হয়। দরজা বলতে একটা মাত্র পাল্লা, তাও একটা কবজা ভাঙা বলে কাত হয়ে ঝুলে থাকে। সারাদিনই বাতাসে নড়ে আর ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে।

দুলালবাবু পাঁচুর দেখাদেখি জিরনোর চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলেন, শরীরটা যেন জিরোতে চাইছে না। কাজ করতে চাইছে। পাঁচুর বয়স হয়েছে, তাকে সব সময়ে সঙ্গে টানাটা ঠিক নয়। বেচারার ভারি কষ্ট হয় বোধ হয়। দুলালবাবু ঠিক করলেন, আজ একাই বেরিয়ে পড়বেন। আর এক্ষুনিই।

ভেবেই তড়াক করে উঠে বসলেন তিনি। তারপরই ভারি অবাক হয়ে চেয়ে দেখলেন, তাঁর সামনেই একটা ছেলে দাঁড়িয়ে। ছেলেটার মাথায় একটা সাদা হেলমেট।

দুলালবাবু হাতে হাত ঘষে ভারি আমুদে গলায় বললেন, "কাজ শিখতে চাও? তা শেখাব। চুরি-জোচ্চুরি ডাকাতি যা চাও সব শেখাতে পারি।"

ছেলেটা দু'পা কাছে এগিয়ে এসে বলল, "আমি একটা ফর্মুলার অর্থ করতে পারছি না। করে দেবেন?"

দুলালবাবু হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন, "ফর্মুলা? সে আবার কী জিনিস?"

"আপনি একসময়ে ফর্মুলায় পণ্ডিত ছিলেন।"

দুলালবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "ছিলুম নাকি? তা হবে। ওসব আমি এখন ভুলে মেরে দিয়েছি। এখন চুরি-ডাকাতি করে বেড়াই আর তাতে ভারি আনন্দ। লোকগুলোও ভীষণ বোকা।"

"আপনি একটু চেষ্টা করলে ফর্মুলাটার মানে কিন্তু বলতেপারবেন। দেখুন না একটা চেষ্টা করে।"

দুলালবাবু ঘন-ঘন মাথা নেড়ে বললেন, "না, না। ওসব আমি জানি না।"

ছেলেটা করুণ মুখ করে বলল, "কিন্তু সবাই যে বলে এ-ফর্মুলার অর্থ একমাত্র দুলাল-সার ছাড়া কেউ করতে পারবে না।"

"বলে নাকি? ভারি মজার ব্যাপার তো!"

"আপনার মনে নেই সার, সেই যে ইস্কুলে পড়ানোর সময়..."

'ইস্কুল! ও বাবা! ওসব কথা উচ্চারণও কোরো না। ইস্কুল খুব খারাপ জিনিস।"

"খারাপ কেন সার?"

'ইস্কুলে সব ভাল-ভাল কথা শেখায়। সেগুলো আসলে খুব বাজে জিনিস, তাতে কোনও মজা নেই। আসল মজা হল চুরি করা, বানিয়ে-বানিয়ে মিথ্যে কথা বলে মানুষকে বোকা বানানো, মারপিট করা। বুঝলে? ইস্কুল-টিস্কুলে কক্ষনো যাবে না।"

ছেলেটা ভারি উৎসাহ পেল যেন। একগাল হেসে বলল, "আর মাস্টারমশাইরা খুব মারেও সার। গাঁট্টা খাওয়ার ভয়ে এই দেখুন না আমি মাথায় শক্ত টুপি পরে আছি।"

"খুব বুদ্ধির কাজ করছে।" তা হবে নাকি আমার শাগরেদ? দু-চার দিনেই সব শিখিয়ে দেব। ওই পাঁচু মোদকটাকে নিয়ে কাজ হচ্ছে না। বড্ড কুঁড়ে, আর একটু পরিশ্রমেই ভারি হেদিয়ে পড়ে।"

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, "আপনার শাগরেদ হওয়া তো ভাগ্যের কথা

সার।”

“তা হলে চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।”

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে সঙ্গে-সঙ্গে বলল, “চলুন সার। যেতে-যেতে ফর্মুলাটা কি একবার শুনে নেবেন?

“ফর্মুলা! হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি একটা ফর্মুলার কথা বলছিলে বটে। কিন্তু ওসব শক্ত আর গুরুগম্ভীর ব্যাপারে মাথা ঘামানোর দরকার কী আমাদের? চুরি-ডাকাতিতে ঢের মজা।”

“সে তো জানিই। কিন্তু ফর্মুলার ব্যাপারটা আমার মাথা থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। না গেলে অন্য কাজে মন দেব কী করে?”

দুলালবাবু মাথা নেড়ে বললেন, “তা অবশ্য ঠিক কথা। তা বলো শুনি।”

ছেলেটা গড়গড় করে একটা প্রায় দেড় ফুট লম্বা ফর্মুলা মুখস্থ বলে গেল।

দুলালবাবু মাথা নেড়ে বললেন, “উহুঁ অত তাড়াতাড়ি নয়। ভেঙে-ভেঙে বলো। এ তো মনে হচ্ছে অনেক উলটোপালটা জিনিস মেশানো হয়েছে। এ তো ঠিক ফর্মুলা নয়, পাগলামি। তবু আস্তে-আস্তে বলো।”

ছেলেটা এবার আস্তে-আস্তে বলতে লাগল।

দুলালবাবু মাথা নেড়ে-নেড়ে খানিকক্ষণ বিড়বিড় করে বললেন, “সোডিয়াম আয়োডাইড...উহুঁ মিলছে না...যা বললে আর-একবার বলো তো!”

ছেলেটা ফের বলল।

দুলালবাবু একটা কাগজ আর কলম খুঁজতে লাগলেন ঘরময় বললেন, “দাঁড়াও লিখে নিই। তা না হলে বোঝা যাবে না। কিন্তু পাঁচুর ঘরে কি আর কাগজ-কলম পাওয়ার জো আছে। ব্যাটা বোধ হয় লেখাপড়াই জানে না।”

ছেলেটা সঙ্গে-সঙ্গে পকেট থেকে একটা একসারসাইজ বুক আর পেনসিল বের করে দিয়ে বলল, “এই যে সার, এটাতে লিখুন।”

দুলালবাবু খাতাটা সাগ্রহে নিয়ে ফর্মুলাটা লিখে ফেললেন। তারপর বিস্মিতভাবে সেটার দিকে চেয়ে বললেন, “এটার তো কোনও মানেই পাচ্ছি না। এ ফর্মুলা তোমাকে কে দিয়েছে?”

“তিনি মস্ত বড় বিজ্ঞানী।”

দুলালবাবু মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, “আমাদের সময়ে তো এই ফর্মুলা ছিল না। যাই হোক, হয় এটা একটা পাগলামি, না হয় তো খুব উঁচুদরের সায়েন্স।”

“উঁচুদরের বিজ্ঞানই সার। খুব উঁচুদরের।”

“ব্যাপারটা প্র্যাকটিক্যাল না করলে বোঝাও যাবে না। কিন্তু তার অসুবিধে আছে। এখাতে তত ভাল ল্যাবরেটরি নেই।”

“কেন সার, ভুবনবাবুর ল্যাবরেটরি তো ফাঁকা পড়ে আছে। গেলেই হয়।”

"কিন্তু ভুবনবাবু আমাকে ঢুকতে দেবেন না।"

ভুবনবাবু, রামলাল ও নন্দলাল খানিকক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে রইলেন। পরস্পরের দিকে চেয়ে তাঁরা বাক্যহারা।

খানিকক্ষণ বাদে ভুবনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ওরে রামলাল, কবিতা-টবিতা অতি যাচ্ছেতাই জিনিস। তাই না?"

"যে আজ্ঞে। কথাটা আমিও আপনাকে বলব-বলব করছিলাম।"

ভুবনবাবু খুবই ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, "কবিতা নিয়ে যে এতসব জোচ্চুরি হয়, তাই বা কে জানত! যাকগে, তোমাদের আর কবিতা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।"

রামলাল ও নন্দলাল এ-কথা শুনে খুবই উজ্জ্বল হলেন। ঘামদিয়ে তাঁদের যেন জ্বর ছেড়ে গেল।

রামলাল হাসিমুখে বললেন, "যে আজ্ঞে।"

নন্দলাল বললেন, "আপনারও আর কবিতা লেখার দরকার আছে বলে মনে হয় না।"

ভুবনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "লিখলে অবশ্য বাংলা সাহিত্যের একটা উপকারই হত। কিন্তু দেখছি তা আর হওয়ার নয়। তা ইয়ে, রামলাল, তুমি কি ল্যাবরেটরিটা তুলে দিয়েছ নাকি?"

"আজ্ঞে, এখনও দিইনি। তবে দেব-দেব করছিলাম।"

"আমি বলি কি, কবিতার ভূত ঘাড় থেকে নামানোর জন্য কয়েকদিন এখন কষে বিজ্ঞান-চর্চা করলে কেমন হয়? বিজ্ঞান খুব প্র্যাকটিকাল জিনিস, মাথা থেকে ভাবের ভূত একেবারে ঝেড়ে নামিয়ে দেয়।"

"যে আজ্ঞে।"

"তুমি কী বলো হে নন্দলাল?"

নন্দলালবাবু মাথা চুলকে বললেন, "বিজ্ঞানে আমার তেমন শ্রদ্ধা নেই।"

ভুবনবাবু আঁতকে উঠে বললেন, "বলো কী হে! শ্রদ্ধা নেই! এটা যে বিজ্ঞানেরই যুগ তা জানো?"

"আজ্ঞে জানি। তবে বিজ্ঞান তো ভগবান মানে না, ভুত বিশ্বাস করে না।

সেইজন্যেই বিজ্ঞানের ওপর আমার আস্থা নেই।"

ভুবনবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, "তা হলে তো তোমার আরও বেশি বিজ্ঞান-চর্চা করা উচিত। তুমি ভগবান মানো, ভূতে বিশ্বাস করো, ভাল কথা। সেগুলোকে বিজ্ঞান দিয়েই যদি প্রমাণ করতে পারো, তা হলে সকলেরই উপকার হয়। ধরো, এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করলে যা দিয়ে ভগবানের সঙ্গে কথা বলা যায়, তা হলে কেমন হয়? ধরো যদি ভূতকে ঘরে টেস্টটিউবে বন্ধ করে পাঁচজনকে দেখিয়ে দিলে, তা হলে তো একটা নামও হয়।"

"যে আজ্ঞে। তবে কিনা কাজটা ভারি শক্ত।"

"আহা, শক্ত মনে করলেই শক্ত। কাজে নেমে পড়লে আর শক্তটা কী? আমি যে ভৌত-চশমা বের করেছি, সেটাও পরীক্ষা করে দেখতে পারো। চমৎকার জিনিস। চোখে দিলেই দেখবে চারিদিক ভূতে একেবারে থিকথিক করছে।"

"যে আজ্ঞে।"

"তা হলে চলো সবাই মিলে আজ বিজ্ঞানের একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলি। আমার মাথার মধ্যে এখনও কবিতার পোকা নড়াচড়া করছে। লক্ষণ ভাল ঠেকছে না। এখন বিজ্ঞান নিয়ে না পড়লে পোকাটাকে জব্দ করা যাবে না।"

কাঁচুমাচু মুখে দুই ভাই অগত্যা ভুবনবাবুর পিছুপিছু ল্যাবরেটরির দিকে রওনা হলেন।

কিন্তু ল্যাবরেটরির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ভুবনবাবু দরজা ঠেলে বললেন, "কে আবার ঢুকল এর মধ্যে?"

রামলাল তাড়াতাড়ি বললেন, "আজ্ঞে ভুতো।"

"ভুতো! তার ঘাড়ে আবার বিজ্ঞান ভর করল কবে? ভুতো! অ্যাই ভুতো!"

কিন্তু ভিতর থেকে কেউ সাড়া দিল না। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ভুবনবাবু বাক্যহারা হয়ে গেলেন। যা দেখলেন, তা প্রত্যয় হয় না।

অনেকক্ষণ বাদে ফিসফিস করে বললেন, "সর্বনাশ!"

রামলাল আর নন্দলাল শ্রদ্ধাভরে একটু পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রামলাল উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, কিসের সর্বনাশ দেখলেন আজ্ঞে?"

"সেই গুণ্ডা লোকটা যে এখানেও ঢুকে পড়েছে!"

"কোন গুণ্ডা?"

"দুলালবাবু, সঙ্গে ভুতোকেও দেখা যাচ্ছে। দু'জনে কী করছে বলো তো?"

রামলাল উঁকি মেরে দেখে বললেন, "তাই তো! একটা কিছু এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে বলে মনে হয়।"

"তা হলে কী হবে? দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দাও। এসব আমার একদম ভাল ঠেকছে না।"

কিন্তু ধাক্কা আর দিতে হল না। হঠাৎ ভিতর থেকে একটা আলোর ঝলকানি

আর সেইসঙ্গে বিস্ফোরণের শব্দ এল। ঘরের ভিতরটা নীলবর্ণ ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গেল। একটা কটু গন্ধ বেরোতে লাগল ঘর থেকে।

ভুবনবাবু বিবর্ণ মুখে বললেন, "এ কী?"

রামলাল চিন্তিতভাবে বললেন, "একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে।

নন্দলাল দশ হাত পিছিয়ে গিয়েছিলেন। একটু কম্পিত গলায় বললেন, "আমি আগেই বলেছিলুম কিনা যে, বিজ্ঞান খুব খারাপ জিনিস!"

তিনজন খানিকক্ষণ কিংকতর্ব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রসলেন। ধীরে-ধীরে ভিতরকার ধোঁয়াটে ভাবটা কেটে ঘরটা আবার পরিষ্কার হয়ে এল।

দরজা খুলে হেলমেট-পরা ভুতো বেরিয়ে এসে উত্তেজিত গলায় বলল, "দুলালবাবু অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তবে ভয় নেই।"

ভুবনবাবু ভারি রেগে গিয়ে বললেন, "ভয় নেই মানে? বিজ্ঞান কি ছেলেখেলা নাকি? এ খুব বিপজ্জনক জিনিস। কী থেকে কী হয় তা আমার মতো পাকা সায়েন্টিস্টও সবসময় ঠাহর পাই না। চলো তো দেখি লোকটার কী হল।"

দুলালবাবু মেঝের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে রয়েছেন। জ্ঞান নেই, তবে নাড়ি চলছে। শ্বাসও বইছে। মুছে চোখে বেশ কিছুক্ষণ জলের ঝাপটা দেওয়া হল। পুরনো জুতো এনে শোঁকানো হল। চিমটি কাটা হল। কাতুকুতু এবং সুড়সুড়িও দেওয়া হল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পর দুলালবাবু মিটমিট করে চাইতে লাগলেন।

ভুবনবাবু একটু ভয়ের গলায় বললেন, 'ইয়ে রামলাল, দড়িটড়ি যা পাও নিয়ে এসো। লোকটা যদিও আমাদের সেই দুলালবাবু বলেই মনে হচ্ছে, তবু সাবধানের মার নেই। ভাল করে জ্ঞান ফেরার আগেই হাত-পা বেঁধে ফেলো। নইলে আবার হয়তো বিপদ ঘটাবেন।"

ভুতো মাথা নেড়ে বলল, "আমার তা মনে হয় না। দুলাল-সারের যে অসুখ হয়েছিল তা বোধ হয় সেরে গেছে।"

দুলালবাবু ভুবনবাবুকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন, তারপর হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে ভারী নিরীহ মুখে নরম গলায় বললেন, "ভালো আছেন তো?"

ভুবনবাবু একটু ভড়কে গিয়ে বললেন, "তা ভালই বলা যায়। কিন্তু আপনি কেমন আছেন?"

দুলালবাবু চারদিকে চেয়ে বললেন, "আমি বোধ হয় অসময়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। মাফ করবেন।"

সবাই বুঝতে পারছিল, সেই আগের দুলালবাবুই আবার ফিরে এসেছেন।

ভুবনবাবু একটু অভিমানের গলায় বললেন, 'ইয়ে, আপনি কিন্তু আমাকে বিশেষ রকমের অপমান করেছেন।"

"অপমান!" বলে দুলালবাবু ভারি ভিতু চোখে চেয়ে রইলেন।

ভুবনবাবু বললেন, "আপনি বলেছেন যে, আমি এই শহরের সবচেয়ে বোকা আর আহম্মক লোক।"

দুলালবাবু তাড়াতাড়ি নিজের কান দু হাতে চাপা দিয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন, "ছিঃ ছিঃ ওরকম কথা কানে শোনাও যে পাপ।"

"আমি তা হলে আহাম্মক নই?"

দুলালবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "সে-কথাও আমি বলতে পারব না। আমি সামান্য মানুষ, বড়-বড় মানুষেরা কে কেমন তার কী জানি!"

"আপনি কবিতা কেনার নাম করে আমাকে ঠকিয়েছেন। ঠিক কিনা? অনেক চুরি, মিথ্যে কথা আর ডাকাতিরও অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে আছে।"

দুলালবাবু আকাশ থেকে পড়লেন। মুখে বাক্য সরল না।

দিন-দুই বাদে এক সকালে দুলালবাবু ল্যাবরেটরির এক কোণে ছোট একটা স্টোভে সেদ্ধভাত রান্না করছিলেন, এমন সময় জানলার বাইরে একটা লোক এসে দাঁড়াল। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি, ন্যাড়া মাথায় সদ্য-গজানো খোঁচা-খোঁচা কাঁচাপাকা চুল, দু'খানা চোখ জ্বলজ্বল করছে।

লোকটা চাপা গলায় ডাকল, "দুলালবাবু!"

দুলালবাবু চমকে উঠে বললেন, "আজ্ঞে।"

লোকটা মাথা চুলকে বলল, "এসব কী হচ্ছে দুলালবাবু?"

"দুলালবাবু ভারি ভয় খেয়ে বললেন, "আজ্ঞে, সেদ্ধভাত রান্না করছি, কোনও অন্যায় করিনি তো!"

"আপনার মতো ওস্তাদ লোক সেদ্ধভাত রান্না করে শক্তির অপচয় করলে অন্যায় নয়?"

দুলালবাবু আরও ভয় খেয়ে বললেন, "আজ্ঞে, আপনাকে তো ঠিক চিনে উঠতে পারছি না।"

"চিনতে পারছেন না! বলেন কী দুলালবাবু? আমি যে আপনার শাগরেদ পাঁচু মোদক। দু'জনে মিলে কত কী করলুম, সব ভুলে মেরে দিয়েছেন নাকি?"

দুলালবাবু ভারি অবাক হয়ে বললেন, "আমি কি কিছু করেছি পাঁচুবাবু?"

পাঁচু খুব খকখক করে হেসে বলে, "কত কী করলুম, আর আপনার মনে পড়ছে না? ভূত ধরা, সোনার দোকানে ডাকাতি করা, ভুবনবাবুর বাড়িতে চুরি, ক্রিকেট খেলা কত কী!"

দুলালবাবু কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন, "চুরি! ডাকাতি! ক্রিকেট! ও বাবা, আমি যে জন্মেও ওসব কখনও করিনি, আপনি আর আমাকে ভয় দেখাবেন না আমি ভারি ভিতু লোক।"

পাঁচু হাঁ করে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, "আপনি ভিতু লোক! হাসালেন মশাই। আপনি না ভূত ধরার ব্যবসা করতে চেয়েছিলেন! আপনি দারোগাবাবুর কম হেনস্থা করে ছেড়েছেন? ভুবনবাবুর মতো ডাকসাইটে লোককে নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়েননি আপনি?"

দুলালবাবু অত্যন্ত আতঙ্কের চোখে পাঁচুর দিকে চেয়ে ছিলেন। হঠাৎ দু'হাতে কান ঢেকে বললেন, "ওসব কথা কানে শোনাও যে পাপ পাঁচুবাবু! শুনেই যে আমার ভয় করছে।"

পাঁচু হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, "সাধু সেজে লাভ নেই দুলালবাবু। আমি আপনাকে ভালই চিনেছি। তা সাধু সেজে কি নতুন কোনও প্যাঁচ কষছেন নাকি? আপনার মাথায় যা বুদ্ধি, হয়তো মিনমিনে সেজেই ঝপ করে একটা দাঁও মেরে ফেললেন। তা বলে পাঁচু মোদককে ভুলবেন না যেন!"

দুলালবাবু দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললেন, "পাঁচু মোদক বলে কাউকে আমি চিনিই না। আর আমার মাথায় বেশি বুদ্ধিও নেই। আপনি বোধ হয় অন্য কোনও লোকের সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলছেন।"

পাঁচু মাথা নেড়ে মিটমিট হেসে বলল, "কেন যে ছলনা করছেন দুলালবাবু? আমি তো আর আপনার শত্রু নই। একটা জন্ম ওস্তাদের কাছে শিখতে যা পারিনি, আপনি তা তিন দিনে শিখিয়ে দিয়েছেন। আপনার যা এলেম তার একশো ভাগের এক ভাগ পেলেও বর্তে যেতুম। একটা প্যাঁচ যে আপনি কষছেন তা খুব বুঝতে পারছি। শুধু এই গরিব শাগরেদকে দয়া করে ভুলবেন না যেন। আজ আমি যাচ্ছি দুলালবাবু, কিন্তু আমি আবার আসব।"

লোকটা চলে যাওয়ার পর দুলালবাবু ভারি দুশ্চিন্তায় পড়লেন। ভাত আজ আর তাঁর মুখে রুচল না। কয়েক গ্রাস কোনওরকমে খেয়ে আঁচিয়ে এসে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন। খুব ধীরে-ধীরে তাঁর মনে পড়তে লাগল যে, মাঝখানে কয়েকটা দিন তিনি ঠিক নিজের মধ্যে নিজে ছিলেন না। কী সব যেন অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল।

ভাবতে-ভাবতে যতই তাঁর মনে পড়তে লাগল, ততই তাঁর গায়ে কাঁটা দিতে লাগল। তাঁর মতো নিরীহ লোক যে এসব করতে পারেন তা আজ তাঁর বিশ্বাসই

হচ্ছিল না। ভয়ে তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করছে, জলতেষ্টা পাচ্ছে, ভারি দুর্বল বোধ করছেন।

উঠে দুলালবাবু কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। না, এখানে থাকা আর ঠিক হবে না। লোকটা আবার যদি আসে তবে দুলালবাবু ভারি বিপদে পড়বেন। তাই তিনি নিজের বিছানাপত্র বাক্স-প্যাঁটরা গোছাতে লাগলেন তাড়াতাড়ি।

কিন্তু বেরোতে চাইলেন কি পারা যায়। দরজা খুতেই দেখলেন, সামনেই ভুবনবাবু দাঁড়িয়ে।

"আরে দুলালবাবু! এই দুপুরবেলা কোথায় চললেন?"

"আজ্ঞে, বাড়ি যাচ্ছি। এখানে ঠিক সুবিধে হচ্ছে না।"

"কেন, অসুবিধে কী? কাল থেকে বাচ্চারা আপনার কাছে হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিখবে বলে সব ঠিক করে রেখেছি, এ-সময়ে চলে গেলে চলবে কেন? আমি না হয় আপনার বেতন ডবল করে দিচ্ছি।"

দুলালবাবু আমতা-আমতা করে বললেন, "না, না, টাকার কথা হচ্ছে না। বিজ্ঞান শেখানোর মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ আছে। তবে কিনা বড্ড উটকো লোকের উৎপাত।"

"না হয় দরোয়ান রেখে দিচ্ছি।"

দুলালবাবু ঘাড় চুলকোতে-চুলকোতে বললেন, 'ইয়ে আমি লোকটাও বিশেষ সুবিধের নই। পাঁচু মোদক নামে একটা লোক এসে বলে গেল, আমি নাকি অনেক খারাপ- খারাপ কাজ করেছি, চুরি-ডাকাতি মিথ্যে কথা কিছু বাদ নেই। সেই থেকে ভারি আত্মগ্লানি হচ্ছে। আমার আর লোকালয়ে মুখ দেখানোর উপায় নেই। ভাবছি কোনও নির্জন জায়গায় গিয়ে লুকিয়ে থেকে বাকি জীবনটা কোনওরকমে কাটিয়ে দেব।"

ভুবনবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "কথাটা আপনি খারাপ বলেননি। কয়েকদিন যাবৎ আপনার নামে নানা অভিযোগ আমরাও শুনেছি। তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, তখন আপনি তো আর আপনার মধ্যে ছিলেন না। একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে আপনার শরীর ও মগজের বিধান পালটে গিয়েছিল। ওটা আমি ধর্তব্যের মধ্যে নিচ্ছি না। আমি জানি, আপনি অতি সজ্জন লোক।"

"কিন্তু পাঁচু মোদক আমাকে শাসিয়ে গেছে সে নাকি আবার আসবে। বোধ হয় আমাকে দিয়ে আবার চুরি-ডাকাতি করানোর ইচ্ছে।"

ভুবনবাবু বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, "বটে! দাঁড়ান, দেখছি। আপনি কোথাও যাবে না কিন্তু।"

ভুবনবাবু ছড়ি হাতে গটগট করে চলে গেলেন।

পাঁচু মোদক তার গোপন ডেরায় হতাশভাবে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল, গতিক তার সুবিধের ঠেকছে না। এই বুড়ো বয়সে সে আর ধান্দাবাজি করে পেট চালাতে পারছে না। দুলালবাবুর মতো গুণী লোককে পেয়ে তার ভারি সুবিধে হয়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দুলালবাবু যেন কেমনধারা হয়ে গেছেন। চোখে-মুখে আর সেই ঝলমলে ভাবখানা নেই, চোখে কেমন মরা মাছের ভাব। হলটা কী তা সে বুঝে উঠতে পারছে না।

চোখ বুজে খুব ভাবছিল পাঁচু। কিন্তু তার মাথাটা কোনও কাজের নয়। চিন্তা-ভাবনা ভাল খেলে না। মাথাটায় দুটো ঠুসো মারল পাঁচু। একটু ঝাঁকুনি দিল। কাজ হল না।

চোখটা একটু পিটপিট করল পাঁচু। আচ্ছা, ভগবানের কাছে উপায় চাইলে হয় না? অনেক সময়ে তো ভগবান এসে হাজির হন, বলেন, "কী বর নেবে নাও।" এই বুড়ো বয়সে আর ধকল সয় না পাঁচুর। ক'টা দিন একটু আরামে কাটাতে পারলে হত।

পাঁচু চোখ বুজে বিড়বিড় করে ভগবানের কাছে খুব করে প্রার্থনা জানাতে লাগল।

খানিকক্ষণ বাদেই টের পেল, ভগবান এসেছেন। সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। তবে চোখ খুলল না পাঁচু। একগাল হেসে বলল, "এসে গেছেন? বাঃ, বেশ বেশ!"

ভগবান বেশ ভারিক্কি গলায় বললেন, "এলুম।"

পাঁচু চোখ না খুলেই মেঝের ওপর হাতড়ে-হাতড়ে ভগবানের পা দু'খানাও পেয়ে গেল। পায়ের ধুলো নিয়ে আর মাথায় ঠেকিয়ে গদগদ স্বরে বলল, "বড্ড তাড়াতাড়িই চলে এলেন। অথচ শুনেছি, কত লোকে কত কসরত করে বেড়ায় ভগবানের জন্য। তা খবর-টবর সব ভাল তো?"

"খবর সব ভাল। তা তোমার মতলবখানা কী?"

"আজ্ঞে, বড় টানাটানি চলছে। চুরি-জোচ্চুরিতে আর তেমন সুবিধে হচ্ছে না। তাই ভাবলুম, একটা দুটো বর যদি দিয়ে দেন তো বাকি জীবনটা পায়ের ওপর পা দিয়ে কাটিয়ে দিই।"

"বটে! কিন্তু চোখ বুজে আছ কেন?"

"আজ্ঞে, আমি পাপী তাপী-মানুষ, চোখ খুলতেই যদি পালিয়ে যান সেই ভয়ে।"

"আমি পালিয়ে যেতে আসিনি।"

ভারি অমায়িক হেসে পাঁচু বলল, "আজ্ঞে তা হলে কি চোখ খুলেই ফেলব। ভিরমি যাব না তো?"

"যেতেও পারো।" বলে ভগবান যেন মেঝের ওপর লাঠি ঠুকলেন।

চোখ খুলে ফেলল পাঁচু এবং ভারি অবাক হয়ে বলল, "এ কী?"

"এখন তা হলে ভগবানকে ডাকাডাকি হচ্ছে। তা এই ধর্মভাবটা আরও বছর ত্রিশেক আগে হলেই তো ভাল হত হে। তা শুনলুম, তুমি নাকি আমাদের দুলালবাবুকে চুরি-জোচ্চুরিতে নামাতে চাইছ! ঘাড়ে ক'টা মাথা তোমার, অ্যাঁ?"

পাঁচু মাথা চুলকে বলল, "আজ্ঞে, আমি যে আর কিছু জীবনে শিখিনি। আর দুলালবাবুও ভারি ওস্তাদ লোক।"

"বটে! ফের যদি আমাদের বাড়িতে ঢোকো বা দুলালবাবুকে ভাঙানোর চেষ্টা করো তা হলে কিন্তু—"

পাঁচু ভারি অভিমানী গলায় বলল, "সবাই তো আমাকে বকাঝকাই করে ভুবনবাবু। কিন্তু আমার যে উপায়টা কী হবে তা কেউ ভাবে না। বুড়ো বয়সে আমি এখন কী খাই, কী পরি, কে-ই বা আমাকে দেখে, অসুখ হলেই বা কী হবে কেউ ভেবে দেখে না। তা মারতে হয় দশ ঘা মারুন।

ভুবনবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, "তোমার ছেলেপুলে নেই?"

"কেউ নেই।"

"ইয়ে, তা হলে একটা কাজ করলে কেমন হয়? আমার ল্যাবরেটরিতে একজন আগুপিছু করার লোক দরকার। খেতে পাবে, সঙ্গে কিছু হাত-খরচাও। চুরি-জোচ্চুরির দিকে ঝোঁক দেখলে কিন্তু—"

পাঁচু তাড়াতাড়ি নিজের নাক-কান মলে বলল, "প্রাণ থাকতে আর ওসব নয়। আপনার বাড়িতে খ্যাঁটের বন্দোবস্তও বেশ ভাল। তবে আমার খোরাকটার কথা যদি মনে রাখেন—"

ভুবনবাবুর বাড়িতে এখন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করছে। দুলালবাবু বাচ্চাদের হাতে-কলমে বিজ্ঞান শেখাচ্ছেন। তাঁর কাজে পাঁচু নানারকম সাহায্য করে আর ফাঁক পেলেই খানিক ঘুমিয়ে নেয়। ভুবনবাবু রোজই আজকাল কিছু-না-কিছু আবিষ্কার করে ফেলছেন। রামলাল ভুবনবাবুর ধমক খাচ্ছেন রোজ। নন্দবাবু বিজ্ঞান ও কবিতার হাত থেকে রেহাই পেয়ে ভূতপ্রেত তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি নিয়ে ভারি ব্যস্ত আছেন। ভুতো এক ফাঁকে হেলমেটটা আবার যথাস্থানে রেখে এসেছে। ভূতেরাও আজকাল আর কোনও গণ্ডগোল করছে না।